জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক 'যুগান্তর'

এ, মুখার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স
— প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা —
২নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা

খ্যাতনামা সাংবাদিক

ডক্টর ধীরেন্দ্রনাথ সেন, এম. এ., পি-এইচ. ডি.

করকমলেষু

—জীবনযুদ্ধের একটি নাটকীয় অধ্যায়ের স্মরণে—

ভূমিকা

গোড়াতেই বালক বয়সের একটা স্মৃতির কথা লিখিতেছি। ১৯১৪-১৮ সালের বিশ্বব্যাপী মহাযুদ্ধের সময় গ্রামে দেখিতাম সংবাদ-পত্র লইয়া দস্তুরমত একটা বৈঠক বসিত। তখন দৈনিক পত্রিকার গ্রাম্য অঞ্চলে চল ছিল না। সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' কিম্বা 'বসুমতী' যাইত। সেই প্রকাণ্ড কাগজখানা পাটির মত বিছাইয়া দেওয়া হইত—উহার চারিদিকে ৫।৬ জন লোক বসিতেন এবং একজন গভীর মন দিয়া উহা পড়িয়া বাকি পাঁচজনকে শুনাইতেন এবং আবশ্যকমত বুঝাইয়া দিতেন। যুদ্ধ-সংক্রান্ত সংবাদ জানিবার এবং বুঝিবার জন্য লোকের অপরিসীম আগ্রহ লক্ষ্য করিতাম। যদিও আমি সেই সময় নিতান্ত ছেলেমানুষ ছিলাম, তথাপি বয়স্কদের বৈঠকে এক কোণে সসঙ্কোচে দাঁড়াইয়া নিতান্ত কৌতূহলের সহিত জার্ম্মাণ যুদ্ধের আলোচনা শুনিতাম। সেই দূর অতীতের স্মৃতি সন্ধান করিলে আজও মনে পড়ে—এণ্টোয়ার্প দুর্গের পতনে সেই ক্ষুদ্র বৈঠকের চাঞ্চল্য। "জার্ম্মাণরা কাঁটা তারের বেড়া ডিঙ্গাইতেছে"—এই গোছের একটা ছবিও বাহির হইয়াছিল এবং সেই ছবিটা আমার বালকচিত্তকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছিল। ১৯১৮ সালের পর একে একে ২০

বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। আমি আর সংবাদপত্রের গ্রাম্য পাঠক নহি। এক্ষণে আমার নিজের স্কন্ধেই একখানা দৈনিক পত্রিকার সম্পাদনা ও পরিচালনার ভার পড়িয়াছে। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বরে যখন এই মহাযুদ্ধ বাধিল, তখন মনে পড়িয়া গেল আমার ছোট বেলার সেই গ্রাম্য বৈঠকের কথা—এই যুদ্ধ বুঝিতে হইবে এবং বুঝাইতে হইবে। সম্পাদক হিসাবে 'যুগান্তর' ম্যরফৎ আমি সেই গ্রাম্য ভাষ্যকারের ভূমিকা গ্রহণ করিলাম। কল্পনা করিলাম আমার চারিদিকে উৎসুক পাঠকের জনতা—তাঁহাদিগকে এই মহাযুদ্ধের নীতি, প্রকৃতি এবং রণবিজ্ঞানের অসংখ্য অজ্ঞাত তথ্য বুঝাইয়া দিতে হইবে। ১৯১৪-১৮ সালের তুলনায় বর্ত্তমানে দেশ আন্তর্জ্জাতিক শিক্ষায় ও আলোচনায় অনেক দূর অগ্রসব হইয়া গিয়াছে। পাঠক সমাজের এই পরিবর্ত্তন আমি প্রতিদিন অনুভব করিলাম। নিতান্ত সরলভাবেই স্বীকার করিতে পারি যে, আজিকার দিনে পাঠককে ফাঁকি দেওয়া সহজ নহে; গোঁজা-মিল দিয়া কোন জিনিষ বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, কিম্বা কেবল উচ্ছ্বাসের দ্বাবাই পাঠকেব চিত্ত জয় করা যায় না। তাঁহাদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক জিজ্ঞাসা ও তথ্যানুসন্ধান আসিয়াছে—অন্ততঃ 'যুগান্তর' মারফৎ আমাব এই অভিজ্ঞতা হইয়াছে। দেশবাসী এবং সংবাদপত্র উভয়ের পক্ষে ইহা প্রকাণ্ড লাভ।

আধুনিক যুদ্ধ বুঝিবার ও বুঝাইবার জন্য স্বভাবতঃই আমাকে কঠোর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। ইংলণ্ড, ফ্রান্স, জার্ম্মাণী, রাশিয়া ও জাপানের বহু খ্যাতনামা রণপণ্ডিতের পুস্তক এবং স্বদেশী ও বিদেশী নানা পত্রিকায় বিশেষজ্ঞদের রচনা, তথ্য, আলোচনা ও সিদ্ধান্তের অবিরত সাহায্য লইতে হইয়াছে। এমন দিনও গিয়াছে যখন 'যুগান্তরের' একটিমাত্র যুদ্ধ-সংক্রান্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধের জন্য আমাকে ক্রমাগত

ঘণ্টার পর ঘণ্টা পরিশ্রম করিতে হইয়াছে এবং সেই প্রবন্ধের উপাদান সংগ্রহের জন্য তিন চারি দিন ধরিয়া খাটিতে হইয়াছে। কেবলমাত্র সামরিক ইতিহাসের দিক হইতে ধারাবাহিক সম্পাদকীয় আলোচনা ইতিপূর্ব্বে এই দেশে হইয়াছে বলিয়া আমি জানি না এবং বর্ত্তমান-কালেও বাঙ্গলা ও ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে একমাত্র বোম্বাইয়ের 'টাইম্‌স্ অব ইণ্ডিয়া' ছাড়া আর কোন কাগজে এই ধরণের ধারাবাহিক আলোচনা দেখি নাই।

'যুগান্তরে' প্রকাশিত ধারাবাহিক সম্পাদকীয় আলোচনার যে অংশগুলি কেবলমাত্র জাপানের সহিত সংশ্লিষ্ট সেগুলিকে ভিত্তি করিয়াই বর্ত্তমান গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। ইউরোপীয় যুদ্ধ অপেক্ষা জাপানী যুদ্ধের সহিত আমাদের ঘনিষ্ঠতর যোগ এবং ভারতবর্ষের অধিকতর বিপদ থাকায় জাপান সম্পর্কেই আগে লিখিলাম। ইচ্ছা আছে এই মহাযুদ্ধের সমস্ত পর্ব্বগুলিই একে একে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করিব। ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর জাপান যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তারপর ৬ মাসের মধ্যে অর্থাৎ ১৯৪২ সালের মে মাসের মধ্যে জাপান ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত দখল করিয়া ফেলে। কার্য্যতঃ জাপানী আক্রমণের পালা তখনই শেষ হইয়া গেছে। এই ৬ মাসের ঘটনাবলীই 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' নাম দিয়া প্রকাশিত হইল। 'ডায়েরী' নাম দেওয়ার কারণ এই যে, ডিসেম্বর হইতে মে মাস পর্য্যন্ত ঘটনাবলীর দৈনন্দিন সংবাদ যেভাবে আমাদের নিকট আসিয়াছে, সেভাবেই উহা রচিত হইয়াছে। নির্দ্দিষ্ট তারিখ এবং সেই তারিখের ঘটনাবলী সামরিক দিক হইতে কি তথ্য বহন করিয়া আনিল, অতীত ও ভবিষ্যতের সহিত ইহার কি প্রকার যোগাযোগ, কি হইতে পারিত এবং কি হওয়া উচিত, ইত্যাদি বহু দিক দিয়া ঘটনাবলীর বিচার করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য যে,

জল, স্থল ও আকাশ যুদ্ধের নানা সামরিক তথ্য হিসাবেই দৈনন্দিন ঘটনাবলীর উল্লেখযোগ্য সংবাদগুলিকে বিচার করা হইয়াছে। কোন রাজনৈতিক মতবাদের সংস্কার ও বদ্ধমূল ধারণা লইয়া রণক্ষেত্রকে বিচার করি নাই—যথাসম্ভব নিরপেক্ষ দর্শক ও ভাষ্যকার হিসাবে কেবলমাত্র সামরিক ইতিহাসের দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া এই প্রবন্ধগুলি রচনা করিয়াছি। পাঠকবর্গের বিশেষভাবে স্মরণে রাখা দরকার যে, পুস্তকটি 'ডায়েরী'র আকারে রচিত বলিয়া কেবলমাত্র সেই সময়ের ঘটনাবলীর ফলাফলের মধ্যেই ইহা সীমাবদ্ধ। সুতরাং ইহার মধ্যে দৈনন্দিন ঘটনাবলীর গবেষণা রহিয়াছে প্রচুর এবং এই গবেষণা সামরিক মতবাদের উপরেই প্রতিষ্ঠিত এবং পরবর্ত্তীকালের ঘটনার দ্বারা এই-গুলির অধিকাংশও সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। 'ডায়েরী'র আকারে লিখিত হওয়ায় পুস্তকের মধ্যে আগাগোড়া ঘটনাপ্রবাহের একটি দৈনন্দিন সুর রহিয়াছে; ইতিহাস, ভুগোল এবং সমরবিদ্যার অসংখ্য প্রশ্নের দ্বারা ঘটনাগুলিকে বিশ্লেষণ করিবার জন্য এই সুর আমি শেষ পর্যন্ত অব্যাহত রাখিয়াছি।

একটি বিষয়ের উপর আমি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়াছিলাম। দুরূহ শব্দ, বাগাড়ম্বর ও বাক্যের ছটা আমি যথাসম্ভব এড়াইয়া চলিয়াছি। মহাত্মা গান্ধী একদা বলিয়াছিলেন যে, সংবাদপত্রের ভাষা হইবে জনসাধারণের ভাষা। যুদ্ধ-সংক্রান্ত প্রবন্ধের কঠিন বিষয়গুলি আলোচনার সময়েও এই আদর্শ স্মরণে রাখিয়াছি। সহজ, স্বচ্ছ ও প্রাঞ্জল ভাষার সহিত সাহিত্যের রস সংমিশ্রণে এই প্রবন্ধগুলি রচনার চেষ্টা করিয়াছি। ত্রুটি, বিচ্যুতি কোথাও হয় নাই, এতখানি দাবী আমি করি না। তবে, উহা আমার জ্ঞানতঃ ঘটে নাই, সবিনয়ে ইহাই দাবী করিতে পারি। যথাসম্ভব নির্ভুল তথ্যের সমাবেশের দিকেই

নজর রাখিয়াছিলাম এবং সন্দেহের ক্ষেত্রগুলিকে সন্দেহের কোঠায়ই রাখিয়া দিয়াছি।

যদিও এই পুস্তকের ঘটনাবলীর মূল উপাদান 'রয়টার', 'এসোসিয়েটেড প্রেস' এবং ইংলণ্ড ও আমেরিকার বিভিন্ন সামরিক সংবাদদাতার বার্ত্তা ও বিভিন্ন সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তি হইতে সংগৃহীত হইয়াছে, তথাপি এইগুলিকে আমি অন্ধের মত গ্রহণ করি নাই। সামরিক মতবাদ ও ইতিহাসের আলোকে যথাসম্ভব এইগুলিকে পরীক্ষা করিয়া লইয়াছি। তথাপি আমি জানি এই গ্রন্থ ইতিহাসের দিক হইতে সম্পূর্ণ নহে। কারণ, যুদ্ধ যখন চলিতে থাকে, তখন সমস্ত সত্য সংবাদ ও সত্য ঘটনা কোন দেশেই প্রকাশিত হয় না— সেন্সরের নিষেধ বিধি সর্ব্বত্রই উগ্র। মোটামুটিভাবে বলা যায় যে, যুদ্ধ থামিবার অন্ততঃ ১০ বৎসর অতিক্রান্ত না হইলে আসল ইতিহাস রচনা করা যায় না। তথাপি সমসাময়িক ইতিহাসেরও গুরুত্ব এবং মূল্য আছে। কারণ আজিকার দিনে সত্য ঘটনা সম্পূর্ণ চাপিয়া রাখা যায় না এবং তেমন চেষ্টা করিতে গেলে যুদ্ধ চালনাই অসম্ভব হইয়া পড়ে। সিঙ্গাপুরের পতন বা প্যারিসের পতন, ইহা যেমন মিথ্যা নহে এবং একদিনের জন্যও এই ঘটনাগুলিকে যেমন গোপন করা যায় নাই, তেমনই কেন এই দুর্ব্বিপাক ঘটিল মোটামুটি সেই বিবরণও পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রকাশিত ও আলোচিত হইয়াছে। এজন্যই যুদ্ধ চলিবার পথেই ইংলণ্ডে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের ইতিহাসও ইতিমধ্যেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। সুতরাং 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী'তে যাহা লিখিত এবং প্রকাশিত হইয়াছে, উহার মূল উপাদানগুলি মিথ্যা নহে। পাঠকবর্গ ইহা হইতে জাপানী রণনীতি ও রণকৌশলের একটা মোটামুটি ধারণা করিতে পারিবেন।

যে সমস্ত দ্বীপ, উপদ্বীপ ও দেশ সাধারণতঃ আমাদের নিকট পরিচিত নহে, সেগুলিরও একটা সংক্ষিপ্ত এবং সরস পরিচয় দিতে আমি চেষ্টায় কোন ক্রুটি করি নাই।

'যুগান্তরে' প্রকাশিত ধারাবাহিক সামরিক প্রবন্ধগুলিকে কেন্দ্র করিয়াই এই পুস্তক রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু গ্রন্থ আকারে প্রকাশের সময় ইহার বহু পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন করিতে হইয়াছে এবং অনেক নূতন তথ্য ও বিষয় ইহার মধ্যে সংযোজিত হইয়াছে। সুতরাং এই পুস্তক নূতন রচিত গ্রন্থ হিসাবেই গ্রহণ করা যাইতে পারে। পুস্তকটি প্রকাশিত হইবার কথা ছিল গত অক্টোবর মাসে, কিন্তু ছাপাখানার বিভ্রাট এবং যুদ্ধের দরুণ কাগজ, কালি ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যাদির অসম্ভব মূল্য বৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতার জন্য এই পুস্তক বর্ত্তমান বর্ষের এপ্রিল মাসের আগে আত্মপ্রকাশ করিতে পারিল না। এভাবে বিলম্ব হওয়ায় গত ডিসেম্বর ও জানুয়ারী মাসে বাঙ্গলার বিভিন্ন অংশে জাপ বোমারুর আক্রমণ কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিয়াছি। ইংরাজীতে যাহাকে up to date বলে, পুস্তকটি এক হিসাবে তাহাই। হংকং, মালয়, সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইন, ওয়েক, গুয়াম, পার্ল হারবার, জাভা, সুমাত্রা, বোর্ণিও, দক্ষিণ ব্রহ্ম, উত্তর ব্রহ্ম ইত্যাদি সমস্ত স্থানের যুদ্ধ এবং কলিকাতা, চট্টগ্রাম, সিংহল, মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার উপকূলের বিমান আক্রমণ ইত্যাদি সমস্ত আক্রমণকাহিনীই এই পুস্তকে স্থান পাইয়াছে। মিত্রপক্ষের পাল্টা আক্রমণের সত্যকার সংগ্রাম এখনও সুরু হয় নাই বলিয়া পুস্তকটি শুধু জাপানী যুদ্ধের আক্রমণাত্মক অভিযানের মধ্যেই শেষ হইয়া গিয়াছে। জাপান যখন সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবে, তখন সেই পাল্টা অভিযানের কাহিনীও লিপিবদ্ধ করিবার আশা আছে।

ভূমিকা

'যুগান্তরে' প্রকাশিত সামরিক প্রবন্ধগুলির জন্য বাঙ্গলা ও বাঙ্গলার বাহিরের পাঠকসমাজ হইতে যে সাড়া, সহানুভূতি এবং সমর্থন আমি পাইয়াছি, উহারই উপর ভরসা রাখিয়া বর্ত্তমান পুস্তক রচনা করিলাম। এই অবসরে আমি সেই সহৃদয় পাঠকবর্গকে আমার সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ নিবেদন করিতেছি।

মানচিত্র বিশারদ শ্রীঅনিল মুখোপাধ্যায় যুদ্ধ-সংক্রান্ত নানাপ্রকার নক্সা ও মানচিত্র আঁকিয়া যথেষ্ট খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন। তাঁহার মানচিত্রের দ্বারা যুদ্ধের গতি বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইয়াছে। এই পুস্তকে তাঁহারই অঙ্কিত বহু মানচিত্র 'যুগান্তর' কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতি অনুসারে সন্নিবিষ্ট হইল। এজন্য তাঁহাকে এবং 'যুগান্তর' পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাইতেছি। আমার বহু বন্ধুবান্ধব এবং বিশেষভাবে আমার প্রীতিভাজন সহকর্ম্মী ও বন্ধু শ্রীশিবশঙ্কর মিত্রও আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহাদিগকেও আন্তরিকতার সহিত স্মরণ করিতেছি।

এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট আঁকিয়াছেন বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রশিল্পী 'কাফি খাঁ', তাঁহার সঙ্গে আমার বন্ধুত্বের সম্পর্ক এত নিবিড় যে, আমার পক্ষ হইতে তাঁহাকে নূতন করিয়া ধন্যবাদ জানানো নিষ্প্রয়োজন। তাঁহার প্রতিভা জয়যুক্ত হউক—শুধু ইহাই প্রার্থনা করিতে পারি।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

'যুগান্তর' কার্য্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা
মার্চ্চ, ১৯৪৩।

সূচীপত্র

—:*:—

মানচিত্র সূচী

—:*:—

প্রথম অধ্যায়

—— ০ ——

আক্রমণ পর্ব্ব

(১)

আক্রমণের আগে

৭ই ডিসেম্বর '৪১।

আমেরিকার রাজধানী ওয়াশিংটনের মন্ত্রিভবনে তখনও জাপ ও মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের মধ্যে আপোষের কথা চলিতেছে। টোকিও হইতে প্রেরিত বিশেষ দূত মিঃ কুরুসো ও রাজদূত এডমিরাল নোমুরা প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ কর্ডেল হালের সঙ্গে কয়েক সপ্তাহ ধরিয়া আলোচনা করিতেছেন কি ভাবে আমেরিকা ও জাপান পরস্পরের সহিত সম্মানজনক মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে। ইহার আগের দিন মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট জাপ সরকারের নিকট জানিতে চাহিয়াছিলেন যে, ফরাসী ইন্দোচীনে যে সমস্ত জাপসৈন্য প্রেরিত হইয়াছে উহার উদ্দেশ্যই বা কি এবং কারণই বা কি? টোকিও কর্তৃপক্ষ জবাব দিলেন যে, চীন কর্তৃক

ফরাসী উপনিবেশ বিপন্ন হইতে পারে, এ জন্যই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বনের দরকার। ফ্রান্সের ভিসি গভর্ণমেণ্টের সহিত জাপানের যে নূতন চুক্তি হইয়াছে তদনুসারেই এই সতর্কতার ব্যবস্থা। চুক্তির বাহিরে জাপান কিছু করে নাই। বলা বাহুল্য যে, এই জবাবে মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হন নাই এবং ঐ দিনই বে-সরকারীভাবে প্রকাশ পাইয়াছিল যে, জাপান ১ লক্ষ ২৫ হাজার সৈন্য ইন্দোচীনে পাঠাইয়াছে এবং তাহারা ইন্দোচীনের বিভিন্ন ঘাঁটিতে উপনীত হইয়াছে। তথাপি প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট হাল ছাড়িলেন না, সশস্ত্র সংঘর্ষ এড়াইবার জন্য তিনি স্বয়ং জাপ-সম্রাটের নিকট এক লিপি প্রেরণ করিলেন। উহার জবাব আসিবার আগেই ৭ই ডিসেম্বর তারিখ মার্কিণ মন্ত্রিভবন বা হোয়াইট হল হইতে ঘোষণা করা হইল যে, জাপানী নৌ ও বিমানবহর হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবার, ওয়েক্ দ্বীপ এবং ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার উপর আকস্মিক আক্রমণ চালাইয়াছে। জাপানী রাজদূত ও বিশেষ দূত তখনও হোয়াইট হলে মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের সহিত আপোষের কথা চালাইতেছিলেন ... ...

আক্রমণের প্রাক্-মুহূর্ত্তের যবনিকা উত্তোলন করা গেল। পৃথিবীব্যাপী চাঞ্চল্য ও বিস্ময় দেখা দিল। ইহার ঢেউ আমাদের রাজধানী কলিকাতায় পর্য্যন্ত প্রতিক্রিয়া আনিল। বিমান আক্রমণের আশঙ্কায় ১৯৪১ সালের বর্ষাকাল হইতেই কলিকাতার আলোক ম্রিয়মান করা হইয়াছিল, দীপাধারে কালো মুখোস পরাইয়া কলিকাতাকে জাপ বোমারুর ভীতি হইতে রক্ষা করা হইতেছিল। এত আগেই যখন সতর্কতা, তখন জাপানী আক্রমণে বিস্ময়ের সৃষ্টি হইল কেন? ইহা কি অপ্রত্যাশিত ছিল?—না। ইহা কি অজ্ঞাত ছিল?—না। কিন্তু ইহা অবিশ্বাস্য ছিল। জাপানীরা সত্য সত্যই আমেরিকা, বৃটিশ সাম্রাজ্য, চীন ও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজ বা ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের (ইংরাজীতে ইহাই A B C D Powers নামে পরিচিত হইয়াছিল) সম্মিলিত

শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিবে, কার্য্যক্ষেত্রে অনেকেই ইহা বিশ্বাস করেন নাই।

বৃটীশ ও মার্কিণ কর্তৃপক্ষীয় মহলের ধারণা ছিল যে, জাপান শুধু ভয় দেখাইতেছে। জার্ম্মাণী ও ইতালীর দলে যোগ দিয়া এবং তাহাদের সহিত রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া জাপান মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে 'war on nerves' বা স্নায়ুমণ্ডলীর উপর লড়াইয়ের কসরৎ দেখাইতেছে। চক্রশক্তির সহিত ভিতরে ভিতরে চক্রান্ত করিয়া এবং পরাজিত ফরাসী গভর্ণমেণ্টের উপর চাপ দিয়া জাপান যেভাবে ফরাসী ইন্দোচীনে আপন প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছে, বৃটেন, আমেরিকা ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির বেলায়ও তাহারা সেই একই কৌশল খাটাইতে চাহিতেছে। প্রকৃতপক্ষে জাপান যুদ্ধ করিবে না, বিনা যুদ্ধে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় তাহারা প্রবেশ করিতে চাহে, ইহাই ছিল অনেকের বিশ্বাস। যুক্তির দিক হইতে এই বিশ্বাস একেবারে ভিত্তিহীন ছিল না। সামরিক দিক দিয়া অনেকে এই যুক্তি দেখাইলেন যে, চীনের সহিত জাপানের নবপর্য্যায়ের যুদ্ধ চলিয়াছে ক্রমাগত ৪ বৎসর ধরিয়া। এই যুদ্ধে জাপান চীনের অধিকাংশ নগর ও বন্দর দখল করিয়া থাকিলেও চীনের সংগ্রাম শেষ করিতে পারে নাই। আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে জাপান প্রথম শ্রেণীর নহে, উহা ইতালীর মত দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর। যদি যান্ত্রিক সংগ্রামে জাপানের শ্রেষ্ঠতা থাকিত, তাহা হইলে চীনে এত দীর্ঘকাল ধরিয়া লড়াইয়ের প্রয়োজন হইত না। চীনের যুদ্ধে জাপানের লক্ষ লক্ষ সৈন্য নিয়োজিত। এত বড় যুদ্ধের অর্থনৈতিক প্রতিক্রিয়া ঘটিবেই। ইহা ছাড়া মাঞ্চুরিয়া বা মাঞ্চুকুতে জাপানকে বহু লক্ষ সৈন্য রাখিতে হইয়াছে, সাইবেরিয়া সীমান্তে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত তাহার প্রতিনিয়ত সঙ্ঘর্ষ চলিতেছে। রাশিয়া বৃটেনের বন্ধু ; জাপান জার্ম্মাণীর বন্ধু। সুতরাং

জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিলে সোভিয়েট রাশিয়াও অস্ত্র ধারণ করিতে বাধ্য হইবে এবং রাশিয়ার ভ্লাডিভোষ্টক্ বন্দর হইতে ৭০০ মাইল দূরবর্ত্তী টোকিওর উপর দলে দলে রুশ বোমারু বিমান হানা দিয়া হত্যাকাণ্ড ও ধ্বংসলীলা বিস্তার করিবে। ইহা ছাড়া মার্কিণ গভর্ণমেণ্ট গুয়াম্, ওয়েক্ ও ফিলিপাইন হইতে নৌবহর ও বিমান বহর পাঠাইয়া জাপান দ্বীপকে ঘিরিয়া ধরিবে। কর্ণেল নক্স তো দর্পভরে ঘোষণা করিলেন, জাপান যুদ্ধে নামিলে ১৪ দিনের মধ্যেই ভীমকায় মার্কিণ বোমারুগুলি জাপানকে ছাড়েখারে দিবে! অপর দিকে সিঙ্গাপুরের দুর্ভেদ্য নৌঘাঁটি—যাহা নৌ-জগতের এক বিস্ময়—সেই ঘাঁটি হইতে বৃটীশ নৌবহর হংকং নৌ-ঘাঁটির সহিত একত্রে চীনা-সমুদ্রে জাপানী যুদ্ধ জাহাজগুলিকে কাবু করিয়া ফেলিবে। ইহার সঙ্গে আছে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ এবং ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের সামরিক সহযোগিতা। অবশ্য জাপান জার্ম্মাণী ও ইতালীর সহিত রাজনৈতিক ও সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ইহার দ্বারা জাপানের কি লাভ হইবে? জার্ম্মাণী ও ইতালী রহিয়াছে সাত সমুদ্রের ব্যবধানে—বহু সহস্র মাইল দূরে। সুতরাং, ইহারা কেহই পরস্পরকে সামরিক মাল-মশল্লা, সৈন্য বা অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে পারিবে না। অতএব জাপানকে যদি যুদ্ধ চালাইতে হয়, তবে একাই চালাইতে হইবে। সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরিয়া ইহা সম্ভব নহে।

তারপর বিশেষজ্ঞগণ আরও দেখাইলেন যে, আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রাম চালাইবার পক্ষে যে সমস্ত কাঁচামাল একান্তরূপে অপরিহার্য্য জাপানের তাহা নাই। লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, পেট্রোল, রবার, তুলা, পশম ইত্যাদি জাপানের কোথায়? ১৯৩৫ সালে জাপানে উৎপাদিত ইস্পাত শিল্পের পরিমাণ ছিল জার্ম্মাণীর একচতুর্থাংশ, মোটর-শিল্পে জাপান দুর্ব্বল।

১৯৩৬ সালে তয়োদা (Toyoda Works) কারখানা মাত্র ৪ হাজার মোটর গাড়ী ও লরি নির্ম্মান করিতে পারিয়াছিল এবং ইহাই ছিল জাপানের গৌরব। জাপানের ট্যাঙ্ক উৎপাদনের ক্ষমতা বার্ষিক ৩ হাজারের বেশী নাই এবং বিমানযন্ত্রও বার্ষিক ৫ হইতে ৬ হাজারের বেশী তৈয়ার করিতে পারে না। ফলে, এক হাজারের বেশী এরোপ্লেন সে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠাইতে পারিবে না। আমেরিকা ও সোভিয়েট রাশিয়া (এবং বৃটীশ সাম্রাজ্য) যেমন কাঁচামালে আত্মনির্ভরশীল, জাপান তাহা নহে। এই অবস্থায় জাপানের পক্ষে ব্যাপক যান্ত্রিক সংগ্রাম চালানো কি ভাবে সম্ভব? তারপর জাপানী বাণিজ্য ও নৌপথের যোগাযোগ রক্ষার প্রশ্নও চিন্তা করা যাইতে পারে। জাপান একান্তরূপে দ্বীপবাসী, তাহার বহির্ব্বানিজ্য ও অন্তর্ব্বাণিজ্যের সহিত সারা পৃথিবীর যোগাযোগ। চীন, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, বৃটেন ও আমেরিকায় তাহার বিশাল কারবার—আমদানি ও রপ্তানি উভয় প্রকারের বাণিজ্যই তাহার চলিতেছে এবং এই বাণিজ্যই জাপানকে লক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদে ঐশ্বর্য্যশালী করিয়াছে। আমেরিকা ও বৃটেনের সহিত যুদ্ধ বাধিবার ফলে তাহার এই বিশাল বাণিজ্য ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই বন্ধ হইয়া যাইবে এবং শত শত জাপানী বাণিজ্য-জাহাজ (Mercantile Navy) ওসাকা, ইয়াকোহামা ইত্যাদি বন্দরে অলস বসিয়া থাকিবে। যুদ্ধ কবে শেষ হইবে, ঠিক নাই। সুতরাং, জাপানী জাহাজগুলি তাহার নিজস্ব বন্দরে নজরবন্দী থাকিয়া সমুদ্রের লোনা জলে পচিয়া যাইবে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বাণিজ্যিক ব্যাপারে সমুদ্র পথের যোগাযোগ রক্ষার প্রশ্নও তুলিলেন। ১৯৩৫ সালের হিসাবে দেখা গেল:—

(১) বিদেশ হইতে জাপানে যত পণ্য দ্রব্য আমদানী হয়, উহার শতকরা ১৯ ভাগ আসে চীন, মাঞ্চুরিয়া ও সাইবেরিয়া হইতে—

জাপ সমুদ্র, পীত সাগর ও পূর্ব্ব চীন-সমুদ্র পাড়ি দিয়া এইগুলি আসে।

(২) শতকরা ১৮ ভাগ আসে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন সমুদ্র পাড়ি দিয়া ভারতবর্ষ, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ইন্দোচীন ও হংকং হইতে।

(৩) শতকরা ১১.৫ আসে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের দক্ষিণে প্রশান্ত মহাসমুদ্র অতিক্রম করিয়া ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ফিলিপাইন হইতে।

(৪) শতকরা ৩৩ ভাগ আসে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা হইতে, এই দুই মহাদেশের তীর ধরিয়া এবং উত্তর প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া।

(৫) শতকরা ১৮.৫ ভাগ আসে ইউরোপ ও মিশর হইতে। এইজন্য উত্তর সাগর, অতলান্তিক মহাসাগর, ভূমধ্য সাগর, লোহিত সাগর, ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ চীন সমুদ্র অতিক্রম করিতে হয়।

অর্থাৎ একমাত্র বৃটেনের সহিত যুদ্ধ বাধিলেই জাপানের সমস্ত আমদানী বাণিজ্যের প্রায় ৪৮ ভাগ বন্ধ হইয়া যাইবে। কারণ, সিঙ্গাপুরের নৌপথ দিয়া এই বাণিজ্যের স্রোত প্রবাহিত। কেবল আমদানী নহে, রপ্তানী বাণিজ্য সম্পর্কেও এই অবস্থাই দেখা দিবে। সুতরাং বৃটেন, আমেরিকা চীন ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সহিত সংঘর্ষের অর্থ জাপানের বাণিজ্যিক জীবনের সর্ব্বনাশ। অতএব রাজনীতি ও অর্থনীতির বিচারে জাপান এতবড় যান্ত্রিক সংগ্রামে বাহির হইতে পারে না এবং বাহির হইলেও ৬মাসের বেশী তাহার অভিযান চলিবে না। একমাত্র পেট্রোলের অভাবেই জাপান মারা পড়িবে!

বিশেষজ্ঞদিগের এই সমস্ত গবেষণার মূলে নিঃসন্দেহে যুক্তির সারবত্তা ছিল। কিন্তু মানুষের জীবন যেমন কেবল পুঁথিগত বিদ্যা ও তথ্যের দ্বারা চলে না, নানা পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংঘাতে যেমন নতন পথ

ও উপায় দেখা দেয়, রাষ্ট্র-জীবনের ধারাও তেমনই নিছক 'থিওরি' বা তত্ত্ব ও তথ্যের কড়াকড়ি সীমানা ধরিয়া চলে না। অবস্থা ও সমস্থার সঙ্ঘর্ষে নূতন নূতন বুদ্ধির কৌশল ও পন্থা দেখা দেয়। মার্কিণ ও বৃটীশ প্রচারকগণ ও গবেষকদল জাপানের কেবল বিঘ্ন, বিপদ ও সমস্থার মন্দ দিক লইয়াই আলোচনা করিয়াছেন, কিন্তু এইগুলি অতিক্রমণের জন্য অন্যান্য উপায়ও যে থাকিতে পারে এবং কেবল একটি মাত্র সুপরিকল্পনা-বদ্ধ অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা জাপান যে অধিকাংশ সমস্থাই ডিঙ্গাইতে পারে, গবেষকমণ্ডলী সেই দিক ধরিয়া অগ্রসর হন নাই। শত্রুর প্রতি বিদ্বেষ অনেক সময় তাহার সত্যকার শক্তি ও বুদ্ধির দিক বিশ্লেষণে বাধা জন্মায়। শত্রুকে তুচ্ছ করার পক্ষে যত যুক্তি ও তথ্য থাকিতে পারে বিদ্বেষের উত্তেজনায় এবং নিজেদের সামরিক শক্তির উপর অন্ধ বিশ্বাসের ফলে তাহাই উগ্র হইয়া উঠে। জাপানী নৌবল সম্পর্কে ইংলণ্ড ও আমেরিকায় কিঞ্চিৎ স্পষ্ট চেতনা থাকিলেও প্রশান্ত মহাসুদ্রের বিশালতা এবং মিত্র-শক্তির নৌ ও বিমান ঘাঁটির উপর নির্ভরতা সেই শক্তিকে ততখানি মর্য্যাদা দেয় নাই। কিন্তু নৌবল সম্পর্কে যাহাই হউক, জাপানের বিমান-শক্তি, সৈন্যবাহিনী, সঙ্ঘশক্তি এবং আক্রমণপটুতা ও দুর্দ্ধর্ষতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হইয়াছিল। বিশেষভাবে জাপানী বিমান শক্তি সম্পর্কে কোন সঠিক সংবাদ, মিত্রপক্ষ সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। কেবলমাত্র এই একটি ত্রুটীর জন্যই পরবর্ত্তী কালে মিত্রপক্ষের দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় রণনীতি ব্যর্থ হইয়া যায়।

কেবল ১৯৪১ সালের জাপান সম্পর্কেই বা কেন, ১৯১৪ সালের জার্ম্মাণী বা ১৯৩৯ সালের জার্ম্মাণী সম্পর্কেও এমন মারাত্মক ভুল ধারণা করা হইয়াছিল। বিগত মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে বড় বড় বৃটিশ ধুরন্ধর গণের মধ্যে একমাত্র লর্ড কিচেনার ছাড়া প্রায় বাকী সকলেই ধরিয়া

জাইয়াছিলেন যে, জার্ম্মাণী কয়েক মাসের মধ্যেই সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইবে। এবারের মহযুদ্ধের প্রারম্ভেও চেম্বারলেন, দালাদিয়ের প্রভৃতি হিট্লারের জার্ম্মাণী সম্পর্কে অত্যন্ত ভুল বুঝিয়াছিলেন। জার্ম্মাণী যে আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রামের ও সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের এত বড় ভয়াবহ বিস্ময়ের জন্য প্রস্তুত হইয়া আছে, বৃটিশ ও ফরাসী পার্লামেণ্টের সদস্যবর্গ হইতে সুরু করিয়া মন্ত্রিসভা এমন কি সেনাপতিমণ্ডলী পর্য্যন্ত তাহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। মিত্রশক্তি যেমন জার্ম্মাণী সম্পর্কে ভুল ধারণা করিয়াছিলেন, জার্ম্মাণীও সোভিয়েট রাশিয়ার সামরিক শক্তি সম্পর্কে অনুরূপ ভুল হিসাব করিয়াছিল। ১৯৪১ সালের জুন মাসে রাশিয়াকে আক্রমণের আগে হিট্লারী সমর নেতাদেব ধারণা ছিল যে, ১০।১২ সপ্তাহের মধ্যেই সোভিয়েট রাশিয়া ঘায়েল হইয়া যাইবে এবং নাৎসী নেতারা মস্কো হইতে ভ্লাডিভোষ্টক পর্য্যন্ত মনের সুখে দীর্ঘ রেল ভ্রমণ করিতে পারিবেন! সৌভাগ্যক্রমে রণনীতিবিদ্ ও রাজনীতিবিশারদগণের এই ধরণের ভুল হয় বলিয়াই মানুষের পৃথিবী আজও টিকিয়া আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত ভালো ও মন্দ এবং কল্যাণ ও অকল্যাণের দ্বন্দ্বে বিশাল মনুষ্য সমাজ অগ্রগতির পথ খুঁজিয়া পায়। জাপানী আক্রমণের পূর্ব্বে মিত্রশক্তির যে ভুল ধারণা ও স্বপ্ন-বিলাস ছিল, কয়েকদিনের মধ্যেই তাহা সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া যায়। ইহার কারণও রণনীতির কৌশলের মধ্যে নিহিত, পরবর্ত্তী অধ্যায়গুলিতে পাঠকেরা তাহার সন্ধান পাইবেন।

প্রথম অধ্যায়

——•——

(২)

আক্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

৮ই ডিসেম্বর '৪১।

ভোর রাত্রে জাপানী গভর্ণমেণ্ট বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সরকারীভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং বৃটেন ও মার্কিণ গভর্ণমেণ্টও পাল্টা ঘোষণা জারি করিলেন। পরে জার্ম্মাণী ও ইতালীও আমেরিকার বিরুদ্ধে কাগজপত্রে অস্ত্র ধারণ করিলেন। মহাযুদ্ধ সত্য সত্যই সমগ্র পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইল। কিন্তু আগে আক্রমণ, পরে যুদ্ধ ঘোষণা ইহাই হইল নূতন নাৎসী রণনীতি। চরমপত্র দেওয়া, দাবী পেশ করা এবং আইনমাফিক সরকারী ঘোষণা এই সমস্ত লেফাপাদুরস্ত কায়দার কোন বালাই নাই। ওয়াশিংটনে যখন দুইজন জাপানী দূত টোকিও সরকারের পক্ষ হইতে মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলাপ-আলোচনা

চালাইতেছিলেন, তখন জাপান বিশ্বাসঘাতকের মত অতি অকস্মাৎ গুয়াম্ ওয়েক্, হাওয়াই ও ফিলিপাইন ইত্যাদি দ্বীপের উপর একযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইল। মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের সহিত আলোচনাকে তাহারা একটা cover বা আড়ালের মত ব্যবহার করিলেন। পদাতিক সৈন্যেরা যেমন ক্রমাগত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণের আড়াল ধরিয়া প্রতিপক্ষের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, জাপানী সমর কর্তৃপক্ষও তেমনই মার্কিণ সরকারের সহিত ক্রমাগত দিনের পর দিন আলোচনার আড়াল ধরিয়া অতি নিঃশব্দে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের সমস্ত মার্কিণ ও বৃটিশ ঘাঁটির দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। যে সমস্ত বিভিন্ন দ্বীপে ও ঘাঁটিতে জাপান একযোগে আক্রমণ চালাইয়াছে, সেগুলির দূরত্ব চিন্তা করিলেই স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে যে, জাপানের এই ব্যাপক আক্রমণ একটা সুনির্দ্দিষ্ট ও সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনা অনুসারে ঘটিয়াছে। ফিলিপাইন হইতে গুয়াম্ ১৬২৫ মাইল, গুয়াম্ হইতে ওয়েক্ ১৫০০ মাইল, ওয়েক্ হইতে মিড্ওয়ে ১২৫০ মাইল, মিডওয়ে হইতে হাওয়াই ১৩১২ মাইল, হাওয়াই হইতে সানফ্রান্সিস্কো ২১০০ মাইল। আর জাপানের ইয়োকোসুকা নৌঘাঁটি হইতে ফিলিপাইন ১৭৪১, গুয়াম্ ১৩৬০ এবং হাওয়াই ৩৩৭৪ মাইল। জাপান হইতে কতগুলি দীর্ঘবাহু বিস্তার করিলে এইভাবে বিশাল সমুদ্রে ছড়াইয়া পড়া যায়? নিঃসন্দেহে জাপানী নৌবহর ও বিমানবাহী জাহাজগুলি কয়েক দিন আগেই প্রশান্ত মহা- সমুদ্রের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ঘাঁটিগুলির দিকে অগ্রসর হইয়াছিল। এই বহুদূর বিস্তৃত আক্রমণের আয়োজনকে গোপন করিবার জন্যই জেনারেল টোজোর গভর্ণমেণ্ট ওয়াশিংটনে আলোচনা চালাইয়াছিলেন এবং মার্কিণ গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি সতর্ক সমরায়োজনের বদলে রাজনৈতিক পটভূমিকার দিকে আকৃষ্ট রাখিয়াছিলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার এই ওস্তাদি একা

জাপানেরই প্রাপ্য নহে—আগে আক্রমণ পরে যুদ্ধ ঘোষণা; চক্রশক্তির অন্যান্য বন্ধুরাও দুষ্টনীতির এই খেলা দেখাইয়াছেন। ১৯৩৫ সালে ইতালী আবিসিনিয়াকে হঠাৎ আক্রমণ করে, কিন্তু সরকারী ভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে নাই। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিট্‌লার পোলাণ্ড আক্রমণ করেন, লক্ষ লক্ষ সৈন্য পোলাণ্ডের সীমান্ত অতিক্রম করিবার পর যুদ্ধ ঘোষিত হয়। ১৯৪০ সালের ৯ই এপ্রিল, জার্ম্মাণী অতি অকস্মাৎ ডেনমার্ক ও নরওয়ের উপর নৌবহর ও বিমানবহরযোগে ঝাঁপাইয়া পড়ে, কোন প্রকার যুদ্ধ ঘোষণা করা হয় নাই। ১০ই মে, শুক্রবার শেষ রাত্রে জার্ম্মাণী হলাণ্ড, বেলজিয়াম্ ও লাক্সেমবুর্গে আক্রমণ চালায়। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন, ভোর বেলা হিট্‌লার অতি অকস্মাৎ রাশিয়ার উপর ব্যাপক আক্রমণ আরম্ভ করেন। আজও চীনের বিরুদ্ধে জাপানের যে যুদ্ধ চলিতেছে তাহা সরকারী ভাবে ঘোষিত হয় নাই। মঃ ষ্ট্যালিন একদা বলিয়াছিলেন যে, আজিকার দিনে যুদ্ধ আর ঘোষিত হয় না, শুধু আরম্ভ হয়! সর্ব্বত্র নাৎসী আক্রমণ লক্ষ্য করিলে এই নূতন কৌশল ধরা পড়িবে। অথচ ১৯১৪ সালে যখন ইউরোপীয় মহাসংগ্রাম আরম্ভ হয়, তখন চরমপত্র, দাবী পেশ ও সরকারী ঘোষণার যথেষ্ট জমক ছিল। কিন্তু সেই 'রাশভারী' যুগ অতিক্রান্ত হইয়াছে; এক্ষণে যুদ্ধ যন্ত্রের বাহন, উহার গর্ভে বিদ্যুৎগতি নিহিত। উহা অপেক্ষা করিতে জানে না, প্রতিপক্ষকে নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশ দেয় না। আকস্মিক ঘূর্ণিবাত্যার মত উহা বজ্রবিদ্যুৎ ও ঝটিকার সহিত ভাঙ্গিয়া পড়ে! কিন্তু ইহার ভবিষ্যৎ কি? নেপোলিয়ন, যিনি আধুনিক যুদ্ধের জন্মদাতা, তিনি অতর্কিত আক্রমণের বিস্ময়ের (surprise attack) উপর অত্যন্ত জোর দিতেন, এমন কি তিনি ইহাকে যুদ্ধের essential factor বা অপরিহার্য্য অঙ্গ বলিয়া মনে করিতেন। আক্রমণ নীতির এই 'Surprise' এর উপর জোর

দিতে দিতে বর্ত্তমানে সমরনেতাগণ এমন এক স্তরে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন যে, অত্যন্ত হীন বিশ্বাসঘাতকতায়ও আর লজ্জা নাই! প্রতিপক্ষকে কোন রকমেই বিন্দুমাত্র সময় দেওয়া হইবে না, তাহাকে ২৪ ঘণ্টা আগেও সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে না, গোপনে ও নিঃশব্দে ব্যাপক আক্রমণের পরিকল্পনা পাকা করিয়া হঠাৎ প্রচণ্ড অভিযান চালানো হইবে—যেন একটিমাত্র আঘাতের দ্বারাই প্রতিপক্ষ বিস্মিত, বিমূঢ় ও বিহ্বল হইয়া যায়। যদি প্রতিপক্ষকে একবার বিহ্বল করা যায়, তারপর অতি দ্রুত আঘাতের পর আঘাত হানিয়া তাহার সমস্ত পরিকল্পনায় বিশৃঙ্খলা ও বিপর্য্যয় আনা যাইবে এবং বিদ্যুৎগতিতে যুদ্ধের চরম ফল আসিবে। আকস্মিক আক্রমণের পশ্চাতে এই রণনৈতিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে এবং এই কৌশলের দ্বারাই জার্ম্মাণী পশ্চিম ও পূর্ব্ব রণাঙ্গণে প্রচুর সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। জাপান জার্ম্মাণীর মিত্র ও রণনীতির দোসর। তাহার আক্রমণের প্ল্যান ও পদ্ধতিও নাৎসী জার্ম্মাণীর ধারা অনুসরণ করিয়াছে।

কিন্তু এই আকস্মিক আক্রমণই একমাত্র বড় কথা নহে, তার চেয়ে বড় কথা আক্রমণের সন্ধিক্ষণ বাছিয়া লওয়া। উপযুক্ত মুহূর্ত্তে উপযুক্ত আঘাত হানো—রণনীতির ইহা একটা প্রকাণ্ড শিক্ষা। গত ২০ বৎসর ধরিয়া জাপানী সমরনেতারা চিন্তা করিয়া আসিয়াছেন যে, কিভাবে পূর্ব্ব এশিয়া ও দক্ষিণ এশিয়া হইতে ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিপুঞ্জকে বিতাড়িত করিয়া বৃহত্তর জাপ সাম্রাজ্য গড়িয়া তোলা যায়। এই বৃহত্তর জাপ সাম্রাজ্যকেই তাঁহারা এশিয়াটিক ফেডারেশন কিম্বা সময় সময় বৃহত্তর এশিয়ার ভ্রাতৃবন্ধনরূপে প্রচার করিয়া আসিয়াছেন।

১৯২৭ সালে জেনারেল ট্যানাকা প্রধান মন্ত্রীরূপে জাপ সম্রাটের নিকট যে স্মারকলিপি পেশ করিয়াছিলেন এবং ১৯৩৫ সালে লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারু যে পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে স্পষ্টরূপেই জাপানী সাম্রাজ্য-

বাদ ও রণনৈতিক মতবাদ প্রকাশ পাইয়াছিল। জেনারেল ট্যানাকা লিখিলেন :—

"With all the resources of China at our disposal, we shall pass forward to the conquest of India, the Archipelago, Asia Minor, Central Asia and even Europe. But the first step must be the seizure of control over Manchuria and Mongolia......one day we shall have to fight against America. If we wish in future to gain control over China we must crush the United states."

এই পরিকল্পনার প্রথম ধাপ জাপান অতিক্রম করিয়াছে। দ্বিতীয় ধাপেরও একান্ত নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারু লিখিয়াছেন :—

"Should Britain not understand the elementary components of the present problem, Japan would profit by the weakening of the British Empire, the apathy of the Dominions and the weakness and decadence of the British Navy ; she would suddenly attack that navy when it is scattered throughout the seven seas. Australia and Newzealand would be the first aims of Japanese conquest. Hongkong would be taken quickly and India would be helped by an invasion."

জাপানী সমরনেতাদের এই ধরণের মতবাদ প্রকাশ্যে প্রচার হইয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকার রাষ্ট্রনেতারা ইহা উপেক্ষা করিলেও জাপান অলস বসিয়া থাকে নাই। কখন কোথায় কি ভাবে আক্রমণ করিয়া সাম্রাজ্য

বৃদ্ধির এই পরিকল্পনা কার্য্যকরী করিতে হইবে—এই সুযোগের সন্ধানে জাপানী সমরকর্ত্তারা অপেক্ষা করিয়াছেন। সেইজন্য তাঁহারা এমন একটা মুহূর্ত্ত বাছিয়া লইয়াছেন যে-মুহূর্ত্তের আক্রমণ সর্ব্বাপেক্ষা মারাত্মক হইবে। তাঁহাদের মতে Timing is the first act of war বা উপযুক্ত মুহূর্ত্তের আক্রমণই যুদ্ধের প্রথম অধ্যায়। প্রকৃতপক্ষে ইহা বুদ্ধিমান রণনীতিজ্ঞের সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নাই। যদি কোন প্রতিপক্ষ উৎকৃষ্টতর এবং শ্রেষ্ঠতর শক্তিরও অধিকারী হইয়া থাকে, তথাপি তাহার যুদ্ধযাত্রার সময় যদি সুনির্ব্বাচিত না হয়, যদি উপযুক্ত মুহূর্ত্তে সে আক্রমণ করিতে না পারে, তবে শ্রেষ্ঠতর শক্তি সত্ত্বেও রণক্ষেত্রে তাহার চূড়ান্ত পরাজয় ঘটিতে পারে। ১৯০৪-৫ সালে রাশিয়ার সহিত জাপ-যুদ্ধের ইতিহাসে ইহার নজীর আছে। উপযুক্ত সময় নির্ব্বাচনের দিক হইতে জারের রাশিয়া নিদারুণ ভুল করিয়াছিল। যুদ্ধারম্ভের গোড়ায় তাহার যে নৌবহর প্রশান্ত মহাসমুদ্রে ছিল, জাপ-নৌবহরের তুলনায় উহা কোন ক্রমেই হীন ছিল না। তাহার আর একটি নৌবহর ছিল ইউরোপীয় সমুদ্রে। যদি এই দ্বিতীয় নৌবহরের কিছু অংশও রাশিয়া পূর্ব্বাহ্নে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে পাঠাইয়া দিত, তবে জাপানের পক্ষে জয়লাভ করা সম্ভব হইত না। কিন্তু জাপানকে দীর্ঘকাল ধরিয়া শাসাইলেও তাহারা পোর্ট আর্থারের নৌবহরকে বাল্‌টিক নৌবহরের দ্বারা অধিকতর শক্তিশালী করে নাই। পোর্ট আর্থারের নৌবহর ঘায়েল হইবার পর যখন বাল্‌টিক নৌবহর প্রাচ্যে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিল, তখন অত্যধিক বিলম্ব হইয়া গেল এবং উপযুক্ত মুহূর্ত্ত পার হইয়া গেল। ফলে, বিনাযুদ্ধেই ইহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল নিজের ঘাঁটিতে! নিঃসন্দেহে রাশিয়ার মোট সমর-শক্তি ও নৌবল জাপানের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল, তথাপি তাহাকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। কারণ, উপযুক্ত মুহূর্ত্তে উপযুক্ত শক্তির সমাবেশ

সে করে নাই। জাপানীরা জাত-যোদ্ধা, রণনীতির পটুতায় তাহারা ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে।

এবারের মহাযুদ্ধেও তাহারা এই রণনৈতিক বুদ্ধির কৌশল খাটাইয়াছে। একদিকে সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের শক্তিশালী বৃটিশ নৌঘাঁটি এবং অন্য দিকে ম্যানিলা, গুয়াম্, ওয়েক্, পার্ল হারবার ইত্যাদি মার্কিণ নৌঘাঁটি —এই দুই দিকে জাপানের নজর ছিল। টোকিওর সমরকর্ত্তারা ইউরোপীয় যুদ্ধের নীতি বিশ্লেষণ করিলেন, ১৯৩৯ সাল হইতে তাঁহারা ১৯৪১ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলেন। যখন দেখিলেন যে, বৃটেনের নৌবহর ও বাণিজ্যবহরগুলি একান্তরূপে বিব্রত এবং অতলান্তিক, ভূমধ্য-সাগর, উত্তর সাগর, ভারত মহাসাগর ইত্যাদি পৃথিবীব্যাপী নানা সমুদ্রে এই নৌবহর বিক্ষিপ্ত এবং মার্কিণ নৌবহরও বৃটেনের সাহায্যের জন্য অতলান্তিক মহাসমুদ্রে ব্যতিব্যস্ত, জাপানী কর্ত্তারা ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। তাঁহারা আরও দেখিলেন যে, জার্ম্মাণীর হাতে হল্যাণ্ড পরাজিত, সুতরাং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ বেশীদিন বাধা দিতে পারিবে না। ফ্রান্স হিট্‌লারের পদানত, সুতরাং ফরাসী ইন্দোচীন জাপান নাৎসী বন্ধুত্বের দাবীতেই দখল করিতে পারে। ইন্দোচীন হইতে জাপানী সমরশক্তি চাপ দিলেই থাইল্যাণ্ড বশ্যতা স্বীকার করিবে। আর ইউরোপ ও আফ্রিকার যুদ্ধে বৃটিশশক্তি একান্তরূপে বিব্রত, সুতরাং সিঙ্গাপুরে তাহারা শক্তিশালী নৌবহর সমাবেশ করিতে পারিবে না এবং দীর্ঘকাল দক্ষিণ এশিয়ায় বাধা দিতে পারিবে না। অন্যদিকে চীন ও রাশিয়া নিজেদের ঘর সামলাইতেই ব্যস্ত। অতএব, আঘাত হানিবার সময় আসিয়াছে। একমাত্র প্রশ্ন ছিল আমেরিকার, কিন্তু অতর্কিত আক্রমণে যদি আমেরিকার ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে মার্কিণ নৌবহর ও বিমান বহর কোন্ পথে জাপানকে বাধা দিবে? জাপানের

এজন্য প্রথম লক্ষ্য ছিল মার্কিণ ও বৃটিশ নৌবহর যাহাতে কোন ক্ষেত্রেই একত্র হইতে না পারে, সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের নৌবহর চীনা সমুদ্রে বাধা দিতে না পারে এবং বিভিন্ন ঘাঁটিগুলি যাহাতে অতি দ্রুত হাত-ছাড়া হইয়া যায়। এই রণনৈতিক সঙ্কল্প স্থির করিয়া জাপান ৭ই তারিখ ভোরবেলা হইতে ৯ই তারিখ অর্থাৎ প্রায় ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ওয়েক্, হাওয়াই, গুয়াম্, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, হংকং, মালয়, থাই-ল্যাণ্ড ইত্যাদি সর্ব্বত্র বিমান আক্রমণ ও স্থানে স্থানে নৌ-আক্রমণ আরম্ভ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তাহারা সাংহাই দখল, ওয়েক্ অধিকার ও গুয়াম্ পরিবেষ্টন করিয়া ফেলিল এবং সিঙ্গাপুরের অদূরে উপনীত বৃটিশ যুদ্ধ জাহাজ 'রিপালস্' ও 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্' ডুবাইয়া দিল। এক ঘণ্টার মধ্যেই জাপান ইঙ্গ-মার্কিণ সমরশক্তিকে বিপন্ন ও বিপর্য্যস্ত করিয়া ফেলিল। শ্রেষ্ঠতর সমরশক্তি থাকা সত্ত্বেও মিত্রপক্ষ জাপানের কাছে অন্ততঃ সাময়িকভাবে নতি স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন এবং তাঁহাদিগকে নিদারুণ আত্মরক্ষার যুদ্ধে বা **'defensive war'** এর দিকে ঠেলিয়া দিল।

'Timing is the first act of war'—রণনীতির এই মতবাদ অক্ষরে অক্ষরে সত্য, সন্দেহ নাই।

প্রথম অধ্যায়

—(:*:)—

(৩)

মানচিত্রের পটভূমিকায়

৯ই ডিসেম্বর '৪১।

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের মানচিত্র যদি পাঠকবর্গ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করেন, তাহা হইলে সহসা মনে হইবে যে, তাঁহারা যেন নিশীথ রাত্রির নভোমণ্ডল পর্য্যবেক্ষণ করিতেছেন! অসংখ্য ছোট বড় বিন্দু আকাশের অগণিত নক্ষত্রের মত পূর্ব্ব এশিয়ার তটভূমি হইতে আমেরিকার পশ্চিম তট পর্য্যন্ত ছড়াইয়া আছে। মহাসমুদ্রের বিস্তার এখানে কোথাও ৪ হাজার (টোকিও হইতে সানফ্রানসিস্কো সাড়ে ৪ হাজার মাইল) কোথাও বা ৫।৬ হাজার মাইল, কিম্বা বেশী হইবে। প্রশান্ত মহাসাগর যেন আকাশের মতই বিস্তার লাভ করিয়াছে এবং আকাশের গায়ে অগণিত নক্ষত্রের মত অসংখ্য দ্বীপ মানচিত্রের উপর

ফুটিয়া উঠিয়াছে! দ্বীপগুলি কোথাও বা মৌচাকের মত ঝাঁক বাঁধিয়াছে, কোথাও বা ছায়াপথের মত দ্বীপের সারি বসিয়াছে; আবার কোথাও বা বহু দূরবর্ত্তী গ্রহ-উপগ্রহের মত একটি আর একটির কাছ হইতে দূরে সরিয়া গিয়াছে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় শ্যাম, ইন্দোচীন, মালয় হইতে যদি অষ্ট্রেলিয়া পর্য্যন্ত তাকানো যায়, তবে, মনে হইবে কোন দুষ্ট বালক যেন কালি ছিটাইয়া দিয়া দুরূহ মানচিত্র বিদ্যার উপর প্রতিশোধ লইয়াছে! দ্বীপগুলি এত কাছাকাছি ও ঘেঁষাঘেঁষি যে, বোধহয় বিভিন্ন সঙ্কীর্ণ সমুদ্রপথের উপর দিয়া সাঁকো বাঁধিয়া দিলেই মালয় হইতে অনায়াসে অষ্ট্রেলিয়া, নিউগিনি বা অন্য যে কোন দ্বীপান্তরে যাওয়া যাইবে। মহা-সমুদ্রের বুদ্বুদের মত এই দ্বীপগুলি আজ রক্ত-সমুদ্রের আহ্বান শুনিয়াছে এবং উহাদের বুক আজ বোমায় বিদীর্ণ ও গোলায় বিধ্বস্ত হইতেছে। এই দ্বীপের সংখ্যা কত, তাহা গণিয়া লাভ নাই। কারণ, একা জাপানেরই নাকি আড়াই হাজার দ্বীপ রহিয়াছে! পাঠকবর্গ নিশ্চয়ই এমন মানচিত্র লইয়া ভৌগোলিক সঙ্কটে পড়িবেন। তথাপি বলা যাইতে পারে মালয়, সুমাত্রা ও জাভা যেন তিনটি কচি বেগুনের মত লম্বমান হইয়া পড়িয়াছে এবং বোর্ণিও দ্বীপকে যেন অগ্রভাগ কর্ত্তিত শশার মত উহার পাশেই হেলাভরে ফেলিয়া রাখা হইয়াছে! আজিকার জাপ সংগ্রামের পক্ষে ঠিক এই স্থানটিই মর্ম্মঘাতী। মালয় উপদ্বীপ যেখানে সুমাত্রা দ্বীপের মাঝামাঝি স্থানে পীঠের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে, সেখানে আমা-দের বহু-বিজ্ঞাপিত ও বহু-পরিচিত সিঙ্গাপুর এবং সিঙ্গাপুর হইতে কিঞ্চিৎ উত্তর-পূর্ব্ব কোণ ধরিয়া তির্য্যক রেখা টানিলে ফিলিপাইনে পৌছানো যাইবে। এই ফিলিপাইন ও উহার রাজধানী ম্যানিলা মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ নৌ ও বিমানঘাঁটি। কিন্তু সমুদ্র পথের সামরিক ভূগোল এখানেই শেষ হইল না। ম্যানিলা হইতে সোজা পূর্ব্ব দিকে

সরল রেখা টানিলে গুয়াম্ দ্বীপ পাওয়া যাইবে। বৃটেনের পক্ষে যেমন সিঙ্গাপুর, আমেরিকার পক্ষে তেমনই গুয়াম্। বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, জাপানের বিরুদ্ধে এই দুই রাষ্ট্রের যুদ্ধের চরম মীমাংসা এই দুই কেন্দ্রে ঘটিতে পারে। গুয়াম্ হইতে ঈষৎ ঈশান কোণের দিকে রেখা টানিলে ওয়েক্ দ্বীপ হাতে আসিবে এবং ইহাও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি। আবার এখান হইতে একেবারে পূর্ব্ব দিকে সোজা পথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের বিখ্যাত পার্ল হারবার (পোতাশ্রয়) এবং বাঙ্গালী পাঠকের উদ্ভট কল্পনায় সিক্তি হনলুলুর সাক্ষাৎ পাওয়া যাইবে। হনলুলু হইতে মাত্র আড়াই হাজার মাইলের একখানা লাফ দিতে পারিলেই আমেরিকার সানফ্রান্সিস্কো বন্দরে পৌছিয়া স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলা যাইবে! সিঙ্গাপুর হইতে ম্যানিলা হইয়া যদি সানফ্রান্সিস্কো পর্য্যন্ত দীর্ঘ রেখা টানা যায়, তাহা হইলে দোদুল্যমান সেতুর মত উহা কৌতূহলকর রূপ ধারণ করিবে এবং এই সেতুর এক একটি প্রকাণ্ড ধাপকে বর্ত্তমান ইঙ্গ-মার্কিণ-জাপ যুদ্ধের এক একটি প্রাণ-কেন্দ্র বলা যাইতে পারে। ইহার সঙ্গে অবশ্যই পূর্ব্ব এশিয়ার তটভূমিস্থিত হংকং বন্দর এবং উহারই পার্শ্ববর্ত্তী ফরমোসা দ্বীপকে স্মরণে রাখিতে হইবে। কারণ, প্রশান্ত সমুদ্রের যুদ্ধে ইহারাও নিতান্ত অশান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিবে। যুদ্ধকে সহজভাবে বুঝিতে হইলে এই জটিল মানচিত্রের সরল রূপটা চোখের সামনে রাখিতে হইবে।

জার্ম্মাণ ব্লিজক্রিগের ধারা অনুসরণ করিয়া জাপান সমুদ্রে, তটভূমিতে, দ্বীপে এবং উপদ্বীপে বিদ্যুৎগতি আক্রমণ চালাইয়াছে। এই আক্রমণ ব্যাপক, বৃহৎ ও তীক্ষ্ণ এবং ঘড়ির কাঁটার মত সুনির্দ্দিষ্ট সময়ের তালিকা ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধ যেমন মরমনস্ক বন্দর হইতে ওডেসা বা ক্রিমিয়া পর্য্যন্ত একটানা দুই হাজার মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনের সংগ্রাম, প্রশান্ত মহাসমুদ্রের

যুদ্ধ তেমন নিরবচ্ছিন্ন একটানা যুদ্ধ নহে, কিন্তু দৈর্ঘ্যে উহা রুশ-জার্ম্মান রণাঙ্গনকে ইতিমধ্যেই ডিঙ্গাইয়া গিয়াছে। ইহার প্রথম কারণ বিমান এবং দ্বিতীয় কারণ নৌবহর। এই বিশাল সমুদ্রের বিভিন্ন দ্বীপে অতি দ্রুত বিমানবহর ও নৌবহরের যুদ্ধ চলিবে এবং বিদ্যুৎগতিতে পরস্পর পরস্পরকে ঘায়েল করিতে চাহিবে। কিন্তু নৌ এবং বিমান যুদ্ধই ইহার শেষ কথা নহে, ইহার সঙ্গে স্থলপথের যুদ্ধ অনিবার্য্যরূপে দেখা দিয়াছে এবং স্থলপথের আরও বিস্তার ঘটিবে। অর্থাৎ ইঙ্গ-মার্কিণ-জাপ যুদ্ধ জলে, স্থলে ও আকাশে যুগপৎ সমান তীব্রতা ও সমান দ্রুততার সহিত অনুষ্ঠিত হইবে। জাপান প্রথম আক্রমণ সুরু করিয়াছে এবং তাহাও অতর্কিতে ও সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে। সুতরাং প্রথম সুবিধা জাপানই পাইবে। ইতিমধ্যেই হাওয়াই দ্বীপের পার্ল পোতাশ্রয় জখম, ওয়েক্ দ্বীপ দখল, সাংহাই অধিকার এবং হংকং অবরুদ্ধ হইয়াছে। ইহার প্রত্যেকটি কেন্দ্রই ইঙ্গ-মার্কিণের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ। ইহা ছাড়া ম্যানিলা, সিঙ্গাপুর এবং অন্যান্য স্থানেও বিমান ও নৌ-আক্রমণ ঘটিয়াছে। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বড় বিপদ দেখা দিয়াছে স্থলপথে এবং তাহা আমাদেরই ভারতবর্ষের প্রান্তে। ইন্দোচীনে জাপান অনেক দিন আগেই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেখানে নৌ ও বিমান ঘাঁটি দখল করিয়া জাপান এতদিন অপেক্ষমান ছিল। আজ শ্যাম উপসাগর হইতে নৌবহরের সাহায্যে একদিকে মালয় ও অন্য দিকে শ্যাম বা থাই-ল্যাণ্ডের উপর আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে। থাইল্যাণ্ড জাপানের নিকট বশ্যতা স্বীকার করিয়া জাপ-সৈন্যের জন্য রাস্তা ছাড়িয়া দিয়াছে। ফলে ব্রহ্মের সীমান্ত আজ প্রত্যক্ষভাবে এবং একান্তরূপে বিপন্ন। মালয় উপ-দ্বীপেও জাপ সৈন্যেরা অবতরণ করিয়াছে এবং এতক্ষণে সাম্রাজ্য সৈন্য-বাহিনীর সঙ্গে শ্যাম ও মালয় উপদ্বীপে নিদারুণ সংগ্রাম চলিতেছে।

যদি হংকংও গুয়াম্ সত্যই অবরুদ্ধ ও বেষ্টিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে বৃটিশ ও মার্কিণ নৌবহর অবিলম্বে জাপানকে ঘায়েল করিতে পারিবে না এবং যে-সিঙ্গাপুর লইয়া এত বিজ্ঞাপন ও হৈচৈ হইতেছে, তাহা ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনের দশায় পৌঁছিতে পারে। কারণ, জাপানের নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী সিঙ্গাপুরকে পাশে রাখিয়া মালয় ও শ্যামে প্রবেশ করিয়াছে। উদ্দেশ্য নিতান্ত স্পষ্ট—ব্রহ্ম দেশকে প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া এবং সিঙ্গাপুরকে বিচ্ছিন্ন করা। এই যুদ্ধে বিমান ও নৌ-বহরের ক্ষিপ্রতা এবং পটুতাই একমাত্র বড় কথা হইবে না, জল স্থল ও আকাশ-পথের মধ্যে সংযোগ রাখিয়া জাপানকে অগ্রসর হইতে হইবে। এই ত্রিধারার যুদ্ধের এত বড় সংগঠনী শক্তি জাপ-সমরকর্ত্তাদের আছে কিনা, তাহা শীঘ্রই বুঝা যাইবে। কিন্তু যে ভাবে তাহারা আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাতে বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ আছে।

:*:

রুশিয়া
চীন
আলাস্কা
কানাডা
যুক্তরাষ্ট্র
প্রশান্ত মহাসাগর
অষ্ট্রেলিয়া
ভারত মহাসাগর
কোডিয়াক
ডাচ হার্বার
সিএটল
সান ফ্রানসিস্কো
সান ডিয়েগো
পানামা
৪৫২০ মাইল
মিডওয়ে দ্বীপ (যুক্তরাষ্ট্র)
হনোলুলু
পার্ল হারবার
হাওয়াইয়ান দ্বীঃপুঃ
হাওয়াই (যুক্ত)
টোকিও
য়োকোহামা
সাংহাই
হংকং
ফরমোসা (জাপান)
ওয়েক (যুক্ত)
গুয়াম (যুক্ত)
ফিলিপাইন
মানিলা
ইয়াপ (জাপ)
সায়গন
ইষ্ট ইণ্ডিজ
বোর্ণিও
নিউগিনি
ফেনিং
গিলবার্ট
সলোমন
ফিজি দ্বীঃপুঃ
ব্রিজবেন
সিডনী
অকল্যাণ্ড
নৌ ও বিমান ঘাটি
যুক্তরাষ্ট্র ●
জাপান ▲
বৃটিশ ✚
রুশিয়া ■
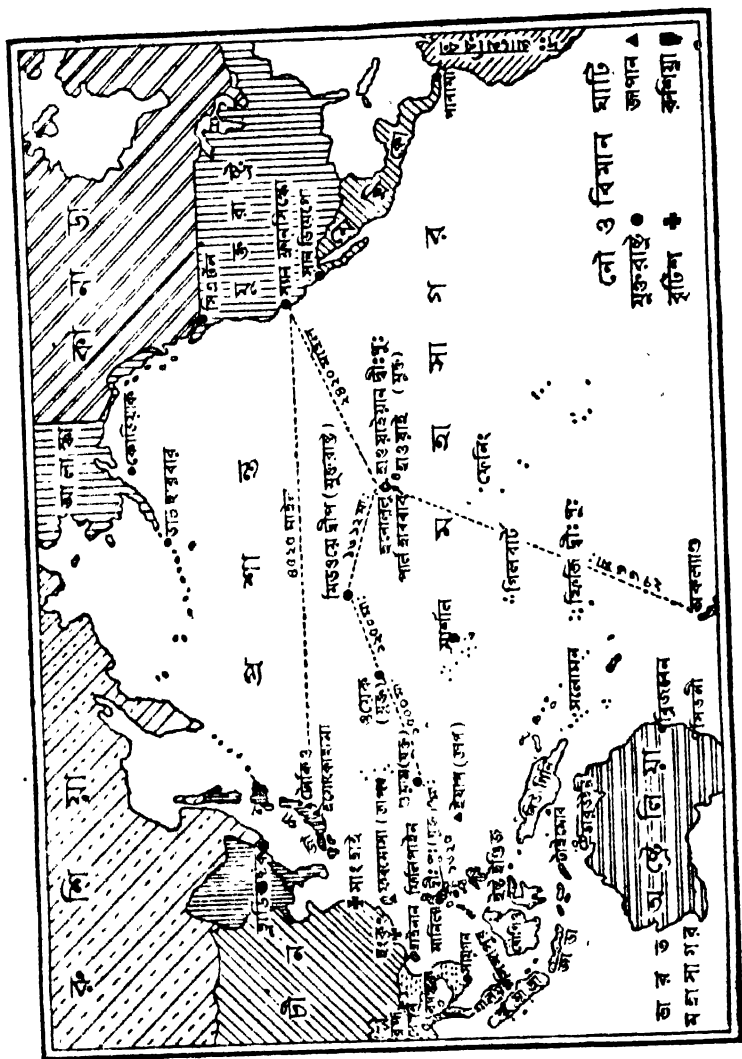
প্রথম অধ্যায়

(৪)

আক্রমণের গতি ও প্রকৃতি

১০ই ডিসেম্বর '৪১।

দীর্ঘকাল যাবৎ, এমন কি বিগত ১৯২০ সাল হইতেই কূটনীতিবিদ্‌ও রণনীতিবিদ্‌গণ জাপান ও আমেরিকার সংঘর্ষের সম্ভাবনা সম্পর্কে গবেষণা করিয়া আসিতেছিলেন। ইহারই অন্ততর কারণস্বরূপ ১৯২১ সালের নবেম্বর মাসে ওয়াশিংটনে নৌবল-প্রধান রাষ্ট্রসমূহের এক সম্মেলন হয় এবং তাহাতে বৃটেন, আমেরিকা ও জাপানের নৌ-নির্ম্মাণ তালিকা প্রভূত পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হয়। কিন্তু জাপানের মনে অবিশ্বাস বরাবরই ছিল, এজন্য জাপানের বড় যুদ্ধজাহাজগুলি হ্রাস করিতে আমেরিকাকে এই সর্ত্ত মানিতে হয় যে, ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ও গুয়াম্ দ্বীপে তাহারা নৌঘাঁটি তৈয়ার করিবে না। পরবর্ত্তীকালে নিরস্ত্রীকরণ

আন্দোলনের ফলে সিঙ্গাপুর সম্পর্কেও এমন নীতি সাময়িকভাবে গৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুর শেষ পর্য্যন্ত পরিপূর্ণরূপে নৌ-কেল্লা ও নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত হইলেও জাপানের সহিত বাহ্যিক সৌহার্দ্দ্য বজায় রাখিবার জন্য ফিলিপাইন, গুয়াম্ ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে আধুনিক ধরণের নৌঘাঁটি, কেল্লা ও জাহাজঘাটা ইত্যাদি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হয় নাই। অবশ্য এই যুদ্ধের হিড়িকে কোন্ শক্তি গোপনে কতটা অগ্রসর হইয়া রহিয়াছেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন হইলেও একথা সত্য যে, আমেরিকার পক্ষ হইতে জাপানের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিম, পূর্ব্ব ও উত্তর অংশে যে পরিমাণ আয়োজন ও সতর্কতার প্রয়োজন ছিল, তাহা অনুসৃত হয় নাই। জাপানী যুদ্ধের এই এক সপ্তাহের ফলাফল দেখিয়া আমেরিকা নিশ্চয়ই এজন্য ক্ষুণ্ণ হইবে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি অতিকায় যুদ্ধ-জাহাজের মত—এইগুলির নড়িতে চড়িতে এবং উদ্যোগ আয়োজনে এত সময় লাগে যে, ঠিক উপযুক্ত মুহূর্ত্ত সেই অবসরে উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ১৯১৪ সালের বৃটেন বা ১৯৩৯ সালের বৃটেনের মধ্যে সামরিক দৃষ্টিতে কোন তফাৎ নাই এবং বৃটেনের বন্ধু বৃকোদর আমেরিকারও এই একই ব্যারাম দেখিতেছি। আমেরিকার উদরে বিশাল অস্ত্রাগার, অপরিমিত কাঁচামাল, প্রভূত স্বর্ণভাণ্ডার, অসংখ্য কলকারখানা এবং প্রচুর লোকজন। আধুনিক যান্ত্রিক মহাযুদ্ধ চালাইবার পক্ষে আমেরিকার যোগ্যতার কোন অভাব নাই, বরং জাপানের চেয়ে অনেক বেশীগুণ শক্তি তাহারা রাখে। তথাপি জাপান প্রথম আক্রমণেই আমেরিকাকে (এবং বৃটেনকে তো বটেই) আত্মরক্ষার প্যাঁচে ফেলিয়া দিয়াছে। ইহার মূলে রহিয়াছে বৃটেনের জমিদারী বুদ্ধির রক্ষণশীলতা এবং আমেরিকার বণিক বৃত্তির তামসিকতা! যান্ত্রিক যুদ্ধের ব্লিজক্রিগের যুগে এই উভয় প্রকার মনোবৃত্তিই রণাঙ্গনের পক্ষে মারাত্মক। অগেকার

প্রবন্ধগুলিতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরের যে সমস্ত স্থান ও দ্বীপের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, সেইগুলিই আজিকার মহাযুদ্ধে প্রধান অংশ গ্রহণ করিবে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই দ্বীপগুলি স্পেনের নিকট হইতে আমেরিকার হাতে আসিয়াছে ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে। এই সমস্ত দ্বীপে স্পেনীয়দের আত্মরক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল আধুনিক যন্ত্রবিজ্ঞান ও রণ-বিজ্ঞানকে অনুসরণ করিয়া সেইগুলিই আজ নৌ-ঘাঁটি, বিমান-ঘাঁটি ও পোতাশ্রয়ে পরিণত হইয়াছে। সাধারণতঃ ফিলিপাইন, গুয়াম্, ওয়েক্, মিডওয়ে (মধ্যবর্ত্তী) ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এবং একান্ত উত্তরবর্ত্তী (বেরিং উপসাগরে কাছাকাছি) অ্যালিউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও একান্ত দক্ষিণবর্ত্তী স্যামোয়া দ্বীপ—প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই বিরাট অংশই জাপ-মার্কিণ যুদ্ধের নৌ-রণক্ষেত্ররূপে ধরা যাইতে পারে। খুব সংক্ষেপে এই দ্বীপগুলির কথা উল্লেখ করিয়া বলা যায় যে, একমাত্র ফিলিপাইনই ছোট বড় ৩১০০ দ্বীপ লইয়া গঠিত। ইহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় লুজন ও মিণ্ডা-নাও দ্বীপ। এইগুলির মোট আয়তন ১১৫০০০বর্গ মাইল, জনসংখ্যা ১ কোটির উপর, কিন্তু অধিকাংশই মালয় জাতীয়। ফিলিপাইনে তিনটি নৌঘাঁটি আছে, যথা, ক্যাভিট, (ম্যানিলা) ওলোনগাপো এবং পোলোক। ফিলিপাইনের আত্মরক্ষা অনেক বৎসর ধরিয়া মার্কিণ সামরিক কর্ত্তৃ-পক্ষের উদ্বেগের স্থল হইয়া রহিয়াছে এবং জাপানের আশঙ্কাতেই ফিলি-পাইনকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই। উহার নৌঘাঁটি ও সামরিক আত্মরক্ষার সমস্ত দায়িত্বই আমেরিকার হাতে। জাপানের দক্ষিণ প্রান্তিক নৌঘাঁটি হইতে ফিলিপাইনের দূরত্ব ১৩০০ হইতে ১৭৫০ মাইলের মধ্যে। কিন্তু ইন্দোচীনের সহিত নূতন সামরিক চুক্তি হওয়ার ফলে এই ব্যবধানও হ্রাস পাইয়াছে এবং এক্ষণে ইন্দোচীন হইতে ফিলিপাইন ৭০০ মাইলের বেশী নহে। বিশ বৎসর

আগে অনেক মার্কিণ নৌ-বিশেষজ্ঞ বলিয়াছিলেন যে, আমেরিকার সহিত জাপানের যুদ্ধ বাধিলে ম্যানিলার অবস্থা পোর্ট আর্থার বন্দরের মত হইবে! লুজন এবং মিণ্ডানাওতে অবতরণের উৎকৃষ্ট ঘাঁটি (landing place) আছে এবং যে তিনটি নৌঘাঁটি ফিলিপাইনে রহিয়াছে, উহা জাপানীদের নৌ-আক্রমণের মুখে টিকিতে পারিবে না। আমেরিকাকে আসিতে হইবে ৫ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী হাওয়াই দ্বীপের নৌঘাঁটি হইতে। বিশ বৎসর আগে যদি এই অবস্থা থাকিয়া থাকে, তবে, বর্ত্তমান বোমারুর যুগে উহা আরও কত বিপজ্জনক হইয়াছে! যে হাওয়াই দ্বীপের উপর জোর দেওয়া হইতেছে, তাহারই বা অবস্থা কি? এই দ্বীপটি আমেরিকার অধিকারে যায় ১৮৯৮ সালে, কিন্তু এখানে ১৯২০ সালে আড়াই লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে ১ লক্ষ ১০ হাজারই ছিল জাপানী। এই প্রচুর সংখ্যক জাপবাসিন্দা যুদ্ধের সঙ্কটে যে কোন সময় বিদ্রোহ বাধাইতে এবং জাপানের আক্রমণে সহায়তা করিতে পারে। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হার্ব্বার একটি বিখ্যাত পোতাশ্রয়। এখানে একটি প্রকাণ্ড ডক আছে এবং বড় বড় যুদ্ধ জাহাজগুলি ইহাতে আশ্রয় লইতে পারে। ইহা ছাড়া এখানে জাহাজ মেরামতের কারখানা এবং তীররক্ষী কামান ও কেল্লা ইত্যাদি রহিয়াছে। তথাপি বড় রকমের কোন নৌবহর সম্ভবতঃ এখানে রাখা সুবিধাজনক নহে। হাওয়াই হইতে অত্যধিক দূরত্বের জন্য ফিলিপাইনকে সাহায্য দেওয়া কঠিন, তবে, আমেরিকার উপকূল রক্ষার পক্ষে হাওয়াইয়ের উপযোগিতা আছে। কিন্তু জাপান চতুরের মত প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইয়া পার্ল পোতাশ্রয় ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, অনেক মার্কিণ জাহাজও ঘায়েল হইয়াছে, যথেষ্ট প্রাণহানিও ঘটিয়াছে। অপর পক্ষে যে গুয়াম্ দ্বীপকে ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরের পক্ষে আমেরিকার চাবিকাঠি বলা হয়, উহাও চারিদিকে জাপানী দ্বীপের দ্বারা বেষ্টিত।

ক্যারোলাইন, পালেউ, ম্যারিয়ানা ও মার্শাল দ্বীপপুঞ্জের নৌ ও বিমান ঘাঁটি হইতে জাপান গুয়ামে দ্রুত আক্রমণ চালাইতে পারিবে। কার্য্যতঃ জাপান তাহাই করিয়াছে এবং গুয়ামের রাজধানীরও পতন হইয়াছে। গুয়াম্ দ্বীপ লম্বায় ৩২ মাইল, চওড়ায় ৪ হইতে ১০ মাইল মাত্র। রাজধানী আগানা হইতে ৮ মাইল দূরে আপ্রা পোতাশ্রয়, একটি চওড়া প্রণালী দিয়া নৌ-বহর এখানে উপস্থিত হইতে পারে। নৌ-বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, এখান হইতে ১৫০০ মাইল দূরবর্ত্তী ফিলিপাইনের ভাগ্যসূত্র গুয়ামের সহিত অবিচ্ছিন্ন। ভূমধ্যসাগরের পক্ষে যেমন মাল্টা, জার্ম্মাণীর পক্ষে যেমন হেলিগোলাণ্ড, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার পক্ষে যেমন সিঙ্গাপুর, ফিলিপাইনের পক্ষে গুয়ামও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। এমন গুরুত্বপূর্ণ গুয়ামের পতনে যদি আর বিলম্ব না থাকিয়া থাকে, তবে, ফিলিপাইন আত্মরক্ষা করিবে কিসের জোরে? গুয়ামের চারিদিকে যে সমস্ত জাপানী দ্বীপ রহিয়াছে, সেগুলির মধ্যে ইয়াপ একটি উৎকৃষ্ট সাবমেরিণ ঘাঁটি, এই ঘাঁটি হইতে ম্যানিলা ও গুয়ামের যোগাযোগ ছিন্ন করা যাইতে পারে। ক্যারোলাইন দ্বীপের পশ্চিমে পালেউ দ্বীপের এঙ্গুয়ার পোতাশ্রয় জাপানের আর একটি শক্তিশালী ঘাঁটি। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জার্ম্মাণীর বিখ্যাত 'এমডেন' রণতরী এখান হইতেই (তখন ইহা জার্ম্মাণীর ছিল) কয়লা সংগ্রহ করিয়া ভারত মহাসাগরের অভিযানে বাহির হইয়াছিল। এই দ্বীপগুলি এক্ষণে জাপানী ঘাঁটিতে পরিণত হওয়ায় গুয়াম্ ও ফিলিপাইন বিপদে পড়িয়াছে। আমেরিকার আরও যে সমস্ত দ্বীপ আছে, যেমন ওয়েক, মিডওয়ে ইত্যাদি সেগুলিও আজ জাপানী আক্রমণে বিপন্ন। একমাত্র উত্তরবর্ত্তী অ্যালিউ-শিয়ান (এখানে ডাচ হার্ব্বার নামে একটি ভালো পোতাশ্রয় আছে) এবং দক্ষিণবর্ত্তী স্যামোয়া হাওয়াই দ্বীপ হইতে ২৩০০ মাইল দূরে অবস্থিত এবং

সেখানকার পোতাশ্রয়কে আধুনিক কায়দায় নৌ-কেল্লায় পরিণত করা হইয়াছে কিনা, জানা যায় নাই।

প্রশান্ত মহাসাগরের বিস্তার অপরিসীম। এই অপরিমিত বিস্তারের জন্য নৌবহরগুলিকে একান্তরূপে নৌঘাঁটির উপর এবং একাদিক্রমে দীর্ঘ-পথ চলিবার শক্তির উপর নির্ভর করিতে হয়। প্রকাণ্ড নৌবহর ছাড়া এই মহাসমুদ্রে অভিযান চালানো কষ্টকর। কিন্তু ইহার জন্য অবিশ্বাস্য পরিমাণ কয়লা ও পেট্রোল দরকার। ৩০টি অতিকায় যুদ্ধ জাহাজ, (ব্যাটলশিপ) ২০টি বৃহত্তম ক্রুজার, ৪০টি ডেষ্ট্রয়ার ও আনুসঙ্গিক অনেক ছোট বড় পোত এই মহাসমুদ্রে প্রয়োজন। একদা এই নৌ-বহরসহ পানামা হইতে ফিলিপাইন পর্য্যন্ত ঘণ্টায় মাত্র ১০ মাইল (সামুদ্রিক) গতিতে যাতায়াতের প্রস্তাব করা হইয়াছিল। হিসাবে দেখা গিয়াছে পানামা হইতে ম্যানিলা পর্য্যন্ত যাইতে ২৪২২০০ টন পরিমাণ কয়লা এবং ৪১৬০০ টন পরিমাণ পেট্রোল দরকার! ইহা শান্তির সময়ের অবস্থা এবং তাহাও একবারের ভ্রমণের জন্য। সুতরাং যুদ্ধের সময়ে কি ঘটিবে, এই প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। জাপানকে একা প্রতিরোধ করার শক্তি আমেরিকার আছে কিনা, সন্দেহজনক। এজন্য বৃটেন, চীন, ওলন্দাজ এবং শেষ পর্য্যন্ত রাশিয়ার সহযোগিতাও দরকার হইবে। বর্ত্তমানে একমাত্র রাশিয়া ছাড়া আর সকলেই জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। এই রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ওলন্দাজের সামরিক শক্তি কিছু উল্লেখযোগ্য বটে, কিন্তু মনে রাখা দরকার হল্যাণ্ড জার্ম্মাণীর অধিকৃত, সুতরাং তাহার বাধাদান শক্তি সীমাবদ্ধ। চীনের অবস্থাও সুখকর নহে। কারণ, উহার সমস্ত সমুদ্রতীরস্থ বন্দর ও বড় বড় সহর জাপ দখলে গিয়াছে। আমেরিকা বা বৃটেনের পক্ষে চীনকে আর তেমন সাহায্য দান সম্ভব নহে। বোধহয় রাশিয়ার অবস্থাও তাহাই, তবে রাশিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ চাপে পড়িয়া পরবর্ত্তী কোন কালে

হয়তো জাপানের বিরুদ্ধে সাহায্য দানে অগ্রসর হইবে। কিন্তু আপাততঃ একমাত্র বৃটেন ছাড়া আমেরিকার শক্তিশালী সমরসঙ্গী আর কেহই নাই। সুতরাং বৃটেনের অবস্থাটা পরীক্ষা করা যাউক।

সিঙ্গাপুর, হংকং, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, মালয় দ্বীপপুঞ্জ, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ প্রধানতঃ এইগুলিই বৃটেনের সম্বল এবং এই বিচিত্র পাঁচমিশালী শক্তি বৃটেনের ভরসা। জাহোর প্রণালীর অপর তীরে সিঙ্গাপুর উপদ্বীপ, এই প্রণালী দীর্ঘ, কিন্তু সঙ্কীর্ণ। ইহার ভৌগলিক অবস্থা এমন চমৎকার যে, আত্মরক্ষা খুব সহজসাধ্য। সিঙ্গাপুর আধুনিক নৌ-ঘাঁটি ও নৌ-কেল্লার মধ্যে শীর্ষস্থানীয়, কোটি কোটি টাকা ইহার জন্য বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড ব্যয় করিয়াছে। ইহার মধ্যে ভাসমান ডক, শুষ্ক ডক, তীররক্ষী বড় কামান, পেট্রোল সরবরাহ কেন্দ্র এবং প্রচুর কয়লা মজুতের ব্যবস্থা আছে। সিঙ্গাপুরের বাবদ বোধহয় ২ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে, শত্রুর আক্রমণ হইতে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার উপযোগী করিয়া এই নৌ-দুর্গ নির্ম্মিত হইয়াছে। হংকং হইতে এই স্থান প্রায় দেড় হাজার মাইল এবং ফরমোসা দ্বীপ হইতে ১৬০০ মাইল। সিঙ্গাপুর সমগ্র পূর্ব্ব এশিয়ার প্রধান প্রবেশপথ হাওয়ায় বৃটেনের সহিত যুদ্ধ বাঁধিবার ফলে জাপানের যোগাযোগ ব্যাহত হইবে। জাপানের সমগ্র আমদানী বাণিজ্যের শতকরা ৪৮ ভাগ এই পথ দিয়া চলে। সুতরাং সিঙ্গাপুর যতক্ষণ হাতে থাকিবে, ততক্ষণ কেবল সামরিক দিক দিয়াই নহে, জাপানের যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থারও প্রভূত ক্ষতি হইবে। ইহা ছাড়া আমেরিকা ও চীনের সহিত যুদ্ধের ফলে জাপানের অন্যান্য বাণিজ্যও প্রচণ্ড মার খাইবে। এজন্য গুয়াম্ ফিলিপাইন ও হাওয়াই দ্বীপের মত হংকং এবং সিঙ্গাপুর জাপান সর্ব্বাগ্রে দখল করিতে চাহিবে। জাপানী আক্রমণের গতি লক্ষ্য করিলে বুঝা

যায় যে, হংকং অবরোধ করিয়া সিঙ্গাপুরকে বিচ্ছিন্ন করাই জাপানীদের মতলব। সিঙ্গাপুরের চেয়ে হংকং জাপানের অধিকতর নিকটবর্ত্তী, এবং ইহা ক্যাণ্টন হইতে ৯০ মাইল দক্ষিণে। তীরভূমি হইতে দেড় মাইল চওড়া একটি প্রণালীর দ্বারা ইহা বিচ্ছিন্ন। যে দ্বীপের উপর ইহা অবস্থিত, তাহা পাহাড় ও বন্ধুর ভূমিতে আচ্ছন্ন। কোন নদী এখানে নাই। তবে, এই বন্দরের নানাস্থানে সৈন্যদল অবতরণ করিতে পারে, কিন্তু বৃহৎ কোন সেনাবাহিনীর এখানে একযোগে অবতরণ সম্ভব নহে। কিন্তু হংকং পোতাশ্রয় এত বৃহৎ ও উৎকৃষ্ট যে, যে কোন বড় নৌবহর এখানে আশ্রয় পাইতে পারে। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি যদি জাপানীদের হাতে পড়ে, তবে, সিঙ্গাপুর হইতে আগাইয়া আসিয়া কোন বৃটিশ নৌ-বহর সহজে জাপানকে ঘায়েল করিতে পারিবে না। সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের পর রহিয়াছে অষ্ট্রেলিয়ার পূর্ব্ব তীরস্থ সিডনী ও মেলবোর্ণ। এখানে সুরক্ষিত এবং অস্ত্রসজ্জিত নৌ-ঘাঁটি ও কেল্লা রহিয়াছে। ইহা ছাড়া পূর্ব্বতীরে ব্রিসবেন, নিউক্যাসেল, উত্তরদিকে টরেস প্রণালীতে থার্সডে দ্বীপ, দক্ষিণে অ্যাডেলাইড, পশ্চিমে ফ্রিম্যাণ্টেল, একান্ত উত্তর-পশ্চিমে পোর্ট ডারউইন ঘাঁটি রহিয়াছে। আরও দক্ষিণে টাসম্যানিয়া দ্বীপে আছে হোবার্ট, কিন্তু এইগুলির মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ পোর্ট ডারউইন। যদি অবস্থা চক্রান্তে বৃটিশ নৌ-বহরকে সিঙ্গাপুর ছাড়িতে হয়, তবে, পোর্ট ডারউইনই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ ও নিকটতম ঘাঁটি। কিন্তু মুস্কিল এই যে, এই ঘাঁটি হইতে জাপানী নৌ-বহরের নাগাল পাওয়া একান্ত কঠিন। অষ্ট্রেলিয়ার পর নিউজিল্যাণ্ডে চারিটি সুরক্ষিত ঘাঁটি আছে,—অকল্যাণ্ড, ওয়েলিংটন লিটলটন এবং ডিউনেডিন। নিউজিল্যাণ্ডে নৌ-বহরের পক্ষে অকল্যাণ্ডই সর্ব্বপ্রধান ঘাঁটি। ইহার পর বৃটিশ সাম্রাজ্যের আর একটি প্রধান ঘাঁটি আমাদের ভারতবর্ষ। পশ্চিম উপকূলে করাচী ও বোম্বাই, দক্ষিণে সিংহল

দ্বীপের কলম্বো ও ত্রিনকোমালি, পূর্ব্ব উপকূলে মাদ্রাজ, আরও পূর্ব্বে কলিকাতা এবং ব্রহ্মদেশে আছে রেঙ্গুণ। কিন্তু এই ঘাঁটিগুলি এবং ভারতীয় নৌ-বহরকে কোনক্রমেই প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর বলা যায় না। বৃটেনের সাম্রাজ্যনীতি ভারতবর্ষকে সামরিক দিক দিয়া বিশ্বাস করে নাই। এজন্যই কোন বৃহৎ ও শক্তিশালী নৌ-বহর এখানে গড়িয়া উঠে নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্যের এই সমস্ত ঘাঁটি ছাড়া অন্যান্য ঘাঁটিও আছে। যেমন, বোর্ণিও, নিউগিনি, ফিজি ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ। সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের নৌ-বহরের পক্ষে এই সমস্ত ঘাঁটি সাহায্যকারী এবং জাপানের নাগালের বাহিরে। যদি ইউরোপীয় যুদ্ধে বৃটেন বিব্রত না হইত, তবে, জাপান বৃটিশ নৌবহরের বিরুদ্ধে খুব সুবিধা করিতে পারিত না। কিন্তু জাপানী রণনীতিবিদ্‌গণের লক্ষ্য ছিল বৃটেনের সর্ব্বাপেক্ষা অসুবিধার মুহূর্ত্তে আক্রমণ করা। তাহাদের মতে সিঙ্গাপুরের কেন্দ্রে বৃটিশ নৌ-বহরকে অকেজো করিতে পারিলে আর কোন চিন্তার কারণ নাই। এই কারণেই তাহারা Timing the first act of war বা উপযুক্ত মুহূর্ত্তের আক্রমণকে যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় বলিয়া ধরিয়া লইয়াছে।

জাপান ও বৃটেনের এক্ষেত্রে পরস্পরের রণনৈতিক লক্ষ্য উল্লেখ করিবার মত। বৃটেন চাহিতেছে :—

(১) জাপানী নৌবহরকে ধ্বংস করা।

(২) জাপানের নৌ-পথের সমস্ত যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করা এবং

(৩) জাপানের বড় বড় সহরে, শিল্প-ব্যাণিজ্যের কেন্দ্রে এবং সমস্ত নৌ ও জাহাজ-ঘাঁটিতে বিমান আক্রমণ ও ধ্বংস করা।

আর জাপান চাহিতেছে :—

(১) বৃটেনের নৌ-বহরকে সম্পূর্ণ ঘায়েল করা।

(২) বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীকে বিদ্যুৎগতি যুদ্ধে ধ্বংস করা।

(৩) গোড়াতেই দক্ষিণ চীন-সমুদ্রের সমস্ত ঘাঁটি দখল করা এবং

(৪) বৃটেনের যোগাযোগ ব্যবস্থা নষ্ট করা।

সম্ভবতঃ জাপান এই পরিকল্পনা সম্মুখে রাখিয়াই অতি দ্রুত ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়াছে। যদি তর্কের খাতিরে এমন একটা দুর্ভাগ্যের কথা ধরিয়া লওয়া যায় যে, হংকং ও সিঙ্গাপুরের আর কোন আশা নাই, তাহা হইলে জাপানী নৌ-বহর আসিয়া দাঁড়াইবে সিঙ্গাপুর ও বোর্ণিও দ্বীপের মাঝামাঝি এবং উহার সাবমেরিণগুলি মালাক্কা, শুণ্ডা, বালি ও লম্বক প্রণালীসমূহের মধ্য দিয়া অতর্কিত আক্রমণ চালাইবে এবং এই সঙ্কীর্ণ জলপথগুলি জাপানের পক্ষে অত্যন্ত সহায়ক হইবে। আর বৃটিশ নৌ-বহরকে তেমন অবস্থায় অষ্ট্রেলিয়ার ঘাঁটি ও পোতাশ্রয় গুলির দিকে যাইতে হইবে। দূরত্ব ও নৌ-ঘাঁটির উৎকর্ষের বিবেচনায় সিডনী এবং পোর্ট ডারউইন সম্ভবতঃ বৃটেনের আশ্রয়স্থল হইবে। কিন্তু খুব দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত না হইলে বৃটেনের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজি-ল্যাণ্ড হইতে পাল্টা আক্রমণ চালানো সহজ হইবে না। যদি বৃটিশ নৌ-বহরকে একটি প্রকাণ্ড শক্তিমান পুরুষরূপে কল্পনা করা যায়, তবে, এমন অনুমান স্বাভাবিক যে, সিঙ্গাপুর (মালয়সহ) ও বোর্ণিও—এই দুই দ্বীপের উপর দাঁড়াইয়া সে জাপানী নৌ-বহরকে বাধা দিবে। ইহাকে আমরা বাম ও দক্ষিণ পার্শ্ব বলিয়া ধরিতে পারি। যদি ফ্রান্সের পতন না হইত এবং শ্যাম বৃটেনের কবলে থাকিত, তাহা হইলে সিঙ্গাপুরের বামবাহু ফরাসী ইন্দো-চীন, শ্যাম ও শ্যাম উপসাগরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইত। কিন্তু ইন্দো-চীন ও শ্যাম * ইতিপূর্ব্বেই জাপানের দখলে

* ৮ই তারিখ জাপ সৈন্য থাইল্যাণ্ড আক্রমণ করে। নৌবহর ও বিমানবহর ইহাতে সাহায্য করে। অতঃপর শ্যাম ও জাপানের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

গিয়াছে। এই অবস্থায় বৃটেনকে প্রয়োজন হইলে বোর্ণিও হইতে একেবারে দূরবর্ত্তী নিউজিল্যাণ্ড পর্য্যন্ত সরিয়া আসিতে হইতে পারে। এই বৃহৎ দেশের মধ্যে ম্যাকাসার প্রণালী, মালাক্কা প্রণালী, টরেস প্রণালী এবং অসংখ্য ছোটবড় দ্বীপ বৃটিশ সাবমেরিণ ও বিমানবহরের পক্ষে সহায়ক হইবে। স্বাভাবিক সময়ে প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরের রণনৈতিক অবস্থার বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, আমেরিকার তুলনায় বৃটেনের পক্ষে আক্রমণাত্মক বা Offensive নীতি অনুসরণের সুবিধা ছিল। কিন্তু এই সুযোগ নষ্ট হইয়াছে প্রথমতঃ ইউরোপীয় মহাযুদ্ধে বৃটিশ নৌ-বহরের শক্তিক্ষয়ে এবং দ্বিতীয়তঃ ইন্দো-চীন ও শ্যামের আত্মসমর্পণে। বৃটেন যদি পূর্ব্বাহ্নে ইরাণের মত শ্যাম দেশ দখল করিয়া রাখিত, তবে উহা মালয় ও ব্রহ্মদেশের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটি হইতে পারিত। সম্ভবতঃ জাপানের সহিত সংঘর্ষ এড়াইবার জন্যই তাঁহারা থাইল্যাণ্ডকে নিজেদের সামরিক এলাকার অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। বর্ত্তমানে যে অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে তাহাতে বৃটেন ও আমেরিকার পক্ষে একমাত্র আত্মরক্ষার নীতি বা Defensive অনুসরণ না করিয়া উপায় নাই।

প্রথম অধ্যায়

---

(৫)

সমুদ্রপথের অভিযান

১১ই ডিসেম্বর '৪১।

একদিকে হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের পার্ল হারবার এবং অন্যদিকে ইন্দো-চীন ও মালয়ের মধ্যবর্ত্তী শ্যাম উপসাগর—এই হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথে জাপান ছড়াইয়া পড়িয়াছে। কোন্ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া জাপান সীমাহীন সমুদ্রের অভিযানে বাহির হইবার জন্য এতটা দুঃসাহসী হইল? বৃটেনের মত জাপানও একান্তরূপে দ্বীপবাসী, নীল সমুদ্রের জলের সঙ্গে তাহার রক্তের টান রহিয়াছে। জাতি হিসাবে তাহার জীবন-ধর্ম্ম সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল, এজন্য সামুদ্রিক জাতির রাষ্ট্রধর্ম্মও সাগরের স্রোত ধরিয়া প্রবাহিত। নৌবহর এবং নৌশক্তিই জাপানের প্রধান অবলম্বন এবং এই শক্তিই জাপানের

অগ্রগতির মূল কারণ। ১৯০৪-৫ সালে এড্মিরাল টোগোর নেতৃত্বে রুশ-জাপান যুদ্ধই জাপানীদিগকে ঐতিহাসিক খ্যাতি দিয়াছে। রাশিয়ার বিশাল সাম্রাজ্যশক্তিকে দ্বন্দ্বে আহ্বান করিয়া এবং উহাকে চূড়ান্তরূপে পরাজিত করিয়া জাপান যে অভূতপূর্ব্ব প্রেরণা পাইল, সেই প্রেরণা ক্রমশঃ তাহাকে পৃথিবীব্যাপী শক্তির বিরুদ্ধে উন্মাদ করিয়া তুলিয়াছে। রুশ-জাপান যুদ্ধের বিচারে জাপান একান্তরূপে আধুনিক ও নূতন রাষ্ট্ররূপে পরিগণিত। তথাপি জাপানের পুরাণো ইতিহাস আছে—যদিও সে ইতিহাস ইংলণ্ডের মত বহুদূর অতীতের গর্ভে নিহিত কিম্বা বিভিন্ন অভিযানের দ্বারা কীর্ত্তিমণ্ডিত নয়। জাপ নৌশক্তির বিশ্বাসযোগ্য লিখিত ইতিহাসে দেখা যায় যে, ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে (১৫৯২) জাপানীরা কোরিয়া দখলের জন্য নৌ-অভিযান করিয়াছিল। দুই লক্ষ সৈন্য এই জন্য মজুত হইয়াছিল। সেদিনের বিচারে এত প্রচুর সংখ্যক সৈন্যের অভিযান একটি অভিনব ব্যাপার, সন্দেহ নাই। কিন্তু তার চেয়েও অভিনব এই যে, এই দুই লক্ষ সৈন্যই শত শত মাইল সমুদ্রপথ অতিক্রম করিয়াছিল। বিশেষজ্ঞগণ অনুমান করেন যে, ইহার জন্য নিশ্চয়ই কয়েক হাজার ছোট বড় পোত ব্যবহৃত হইয়াছিল। সুতরাং সেই সময়েও জাপানী নৌপোতের সংখ্যা ও শক্তি কম ছিল না। তথাপি কোরিয়াবাসীদের হাতে জাপান সেদিন প্রচণ্ড মার খাইয়াছিল, কারণ সেদিনের অভিযানের নেতাগণ ভুলিয়া গিয়াছিলেন যে, সমুদ্রের উপর একাধিপত্য বিস্তার ছাড়া সমুদ্র পারবর্ত্তী দেশকে সাফল্যের সহিত আক্রমণ করা যায় না। সমুদ্রের উপর আধিপত্য লাভই নৌ-যুদ্ধের প্রথম নীতি। কোরিয়াবাসীরা একপ্রকার লৌহবর্ম্মাবৃত পোত ব্যবহার করিয়া সেদিনের জাপানী নৌবহরের ও নৌসৈন্যের ধ্বংস সাধন করিয়াছিল। নৌবিশেষজ্ঞ বাইওয়াটারের মতে বোধ হয় এই 'কূর্ম্মপোত'-ই (উহার আকৃতি অনুসারে

জাপানীরা এই নামকরণ করিয়াছিল) পৃথিবীর প্রথম লৌহবর্ম্মাবৃত যুদ্ধ-জাহাজ। এই অদ্ভুত 'সামুদ্রিক জানোয়ার' সেদিন জাপানী নৌবহরের ত্রাস সঞ্চার করিয়াছিল।

ইহার পর জাপানের জাহাজ নির্ম্মাণে ইউরোপীয় প্রভাব আরম্ভ হয় এবং তাহাও ঘটে ঘটনাচক্রে। ১৬০০ খৃষ্টাব্দে উইল এডামস্ নামে একজন ইংরাজ ওলন্দাজ জাহাজে চড়িয়া আসিয়া উপকূলে আট্‌কা পড়েন। নৌ-পোত নির্ম্মাণে তাঁহার কৃতিত্ব দেখিয়া জাপানী কর্ত্তারা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন। উইল এডাম্‌সের নেতৃত্বেই প্রথম জাপানের দেশীয় কারিগর ও মিস্ত্রীগণ ইউরোপীয় প্রথায় জাহাজ তৈয়ার করিতে শিখে এবং কয়েক বৎসরের মধ্যেই ১০০টন ভারবহনক্ষম অনেকগুলি জাহাজ সমুদ্রে ভাসানো হয়। ইহার পর সুদীর্ঘ আড়াই শত বৎসরের ইতিহাস নিঃশব্দ। জাপান বহির্জ্জগতের সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া আপন স্বাতন্ত্র্যের গর্ব্বে বাস করিতেছিল। তারপর ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে আবার জাপানের সহিত ইউরোপ ও আমেরিকার সম্পর্ক-সূত্রের সূচনা হয়। মার্কিণ নৌ-যোদ্ধা পেরির নেতৃত্বে ৪খানা মার্কিণ যুদ্ধজাহাজ জাপানী সমুদ্রে তিমি মাছের ব্যবসায়ের জন্য ঘাঁটি স্থাপনের দাবী জানায়। ইহার পর ক্রমে ক্রমে নানাসূত্রে বৃটিশ, ফরাসী ও ওলন্দাজ জাহাজগুলি জাপানী সমুদ্রে আবির্ভূত হয়। নৌ-পথের এই সমস্ত চাঞ্চল্যকর ঘটনায় জাপানের জাতীয় জীবনে সাড়া পড়িয়া যায় এবং জাপান অতি দ্রুত ইউরোপীয় এবং মার্কিণী কায়দায় নূতন যুদ্ধজাহাজ ও নৌবহর গড়িয়া তোলে। বর্ত্তমানে জাপান নৌরণবহর ও নৌবাণিজ্যবহরে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত। সরকারী ও বে-সরকারী কলকারখানা, ডক্, হার্ব্বার, ইয়ার্ড ও পোর্ট এবং বেস্ ইত্যাদির দিক হইতে জাপান সম্পূর্ণরূপে আত্মনির্ভরশীল। অর্থাৎ যে কোন প্রকারের বাণিজ্য-জাহাজ, যুদ্ধ-

জাহাজ ও যাত্রী-জাহাজ নির্ম্মাণে জাপান আজ এতটা অগ্রগতিসম্পন্ন যে, তাহার জন্য কোন দেশের সাহায্য বা সহযোগিতার দরকার নাই।

একথা লেখা বাহুল্য যে, নৌ-সৈন্যবাহিনী ছাড়া নৌবহরের কোন অর্থ নাই। যুদ্ধজাহাজ একটা বিরাট যন্ত্র বা অস্ত্র মাত্র, ইহার আসল প্রাণ রহিয়াছে চালক ও সৈন্যবাহিনীর মধ্যে। সুতরাং জাপ নৌবহরের অগ্রগতির সঙ্গে নৌবাহিনী ও নৌ-বিভাগও গড়িয়া উঠিয়াছে। জাপানের যে-সমস্ত অঞ্চল সমুদ্র তীরবর্ত্তী, সাধারণতঃ সেই সমস্ত জেলা হইতেই নৌসৈন্য ও নাবিক সংগৃহীত হইয়া থাকে। ইহারা সমুদ্রতীরবাসী বলিয়া ছোটবেলা হইতেই সমুদ্রের সর্ব্বপ্রকার দুঃখকষ্ট, সুখসুবিধা এবং লাঞ্ছনা ও রোমাঞ্চের সহিত একান্তরূপে পরিচিত। সমুদ্রের সহিত আশৈশব পরিচয়ের ফলে জাপানী নৌ-সৈন্যেরা স্বাভাবিক পটুতা অর্জ্জন করিয়াছে। জাপানী নৌবাহিনীতে দুই শ্রেণীর সৈন্য আছে :—

(১) যাহারা স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে ১৮ হইতে ২০ বৎসরের মধ্যে যোগ দিয়া থাকে, ইহারা ৬ বৎসরকাল ট্রেণিং লইয়া থাকে।

(২) যাহারা সৈনিকবৃত্তির জন্য বাধ্যতামূলকভাবে সংগৃহীত হইয়া থাকে, ইহাদের প্রাথমিক শিক্ষাকাল ৩ বৎসর।

মূলতঃ স্বেচ্ছাসৈনিকের বৃত্তির উপরেই জাপ নৌ-বাহিনীর প্রতিষ্ঠা। যাঁহারা অফিসারের পদের জন্য স্কুলে ও কলেজে প্রবেশ করেন, তাঁহারা প্রধানতঃ বিখ্যাত সাৎসুমা গোষ্ঠী হইতে সংগৃহীত হইয়া থাকেন। অনেক বড় বড় খ্যাতনামা জাপ নৌসেনাপতি এই গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। তীরভূমিতে ইঁহাদের শিক্ষাকাল দীর্ঘস্থায়ী নহে। কারণ, জাপানী নৌকর্ত্তৃপক্ষ বিশ্বাস করেন যে, নৌ-সেনানীর আসল শিক্ষা সমুদ্রে, অর্থাৎ সক্রিয় ও সচল নৌবহরে। নৌ-রণবিদ্যার বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা এত বিস্তৃত যে, উহার বর্ণনা অত্যন্ত কঠিন এবং এখানে অপ্রয়োজনীয়।

সংক্ষেপে শুধু ইহাই বলা যায় যে, নৌবহর ও নৌবিভাগের সর্ব্বপ্রকার কার্য্যের জন্য হাতে-কলমে যুদ্ধ হইতে সুরু করিয়া সাধারণ নাবিকবৃত্তি পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়েই জাপানের শিক্ষাপ্রণালী উন্নত এবং আধুনিক ধরণের। জাপানের নৌযুদ্ধপ্রণালী জার্ম্মাণ, মার্কিণ ও ইংরাজ বিশেষজ্ঞগণও প্রশংসা করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে জাপানী নৌসেনানীরা সংযত, পরিশ্রমী, উৎসাহী এবং সাহসী ও আত্মবিশ্বাসপরায়ণ,—এই আত্মবিশ্বাস জাপানী নৌবাহিনীর একটা জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মত। ঐতিহাসিকদের মতে চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধে অতি সহজে জয়লাভ করিয়া জাপানী নৌবাহিনীর মধ্যে বিস্ময়কর আত্মবিশ্বাস জন্মিয়াছে। তাঁহাদের নৈপুণ্য, সাহস ও আত্মবিশ্বাসই কেবল উল্লেখযোগ্য নহে, তাঁহাদের দুর্দ্দমনীয় দৃঢ়তা এবং ব্যক্তিগত বীরত্বও প্রশংসনীয়। জনৈক নৌরণপণ্ডিত বলিয়াছেন :—

It would be a poor compliment to Japanese navalmen to call them brave, that they certainly are; but to great personal courage they add a fierce tenacity which is no less impressive.

ইহার দৃষ্টান্ত মিলিবে চীন ও রাশিয়ার যুদ্ধে। এই সমস্ত গুণ ছাড়াও জাপানী নৌ-সৈন্যদের বুদ্ধিমত্তা, দৈহিক শক্তি, ক্ষিপ্রতা ও চাতুর্য্যও পৃথিবীর যে কোন শ্রেষ্ঠ নৌবাহিনীর সহিত তুলনীয়। রাশিয়ার সহিত পোর্ট আর্থারের যুদ্ধে জাপানের জাতীয় জীবনের ইতিহাসে যে যুগান্তর আনিয়া দিয়াছে, সেই যুদ্ধ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, জাপানীরা নৌরণবিদ্যায় কত নিপুণ।

১৯০০ খৃষ্টাব্দ হইতেই জাপান ও জারের রাশিয়ার মধ্যে মন কষাকষি চলিতেছিল এবং যুদ্ধ যে অনিবার্য্য উভয় পক্ষই তাহা ধরিয়া

লইয়া প্রস্তুত হইতেছিল। অবশেষে ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ১৪ই ফেব্রুয়ারী উভয়ের মধ্যে সঙ্ঘর্ষ আরম্ভ হয়। রাশিয়া গোড়া হইতেই নৌবহরের শক্তিতে জাপানের অপেক্ষা অনেক বেশী শ্রেষ্ঠ ছিল। রাশিয়ার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নূতন যুদ্ধ-জাহাজগুলির ১খানা বাদে, অর্থাৎ মোট ১৭ খানা ব্যাটেলশিপ্ ও ক্রুজার প্রাচ্য সমুদ্রে জমায়েৎ ছিল, ইহার সঙ্গে যুক্ত হইল পোর্ট আর্থারের ঘাঁটি ও ব্লাডিভোষ্টক বন্দরের নৌবহর।

সুতরাং রুশ নৌশক্তি অজেয় বলিয়াই সকলের ধারণা ছিল। কিন্তু জাপানীরা দুঃসাহসী। তাহারা স্থির করিয়া লইল নৌবহরের দুর্ব্বলতা সত্ত্বেও তাহারা শ্রেষ্ঠতর রণনীতি ও রণকৌশলের দ্বারা রাশিয়াকে হারাইয়া দিবে। গোড়া হইতেই জাপ রণনীতি এক প্রকাণ্ড সমস্যার মুখে পড়িল। রাশিয়ার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত জয়লাভ করিতে হইলে বিশাল সৈন্যবাহিনীকে সমুদ্র পার হইতে হইবে। এই বিশাল সৈন্যদলের সহিত নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করিয়া রসদ, অস্ত্র, গোলাগুলী ও অজস্র প্রকারের দ্রব্য সরবরাহ করিতে হইবে। কিন্তু রুশ নৌ-বহর যতক্ষণ অক্ষত ও কার্য্যক্ষম থাকিবে, ততক্ষণ কি ভাবে এই অসাধ্য সাধন সম্ভব? সুতরাং জাপ নৌবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এড্মিরাল্ টোগো স্থির করিলেন—হয় শত্রুর নৌবহরকে আগে ধ্বংস করিতে হইবে, কিম্বা সম্পূর্ণরূপে অবরোধের দ্বারা উহাকে অকেজো করিয়া রাখিতে হইবে। কিন্তু ইহা সহজসাধ্য নহে। রাশিয়া কেবল জাহাজের শক্তিতেই বলীয়ান্ নহে, তাহাদের দুইটি উৎকৃষ্ট নৌঘাঁটি ও নৌকেল্লা রহিয়াছে। পোর্ট আর্থার ও ব্লাডিভোষ্টকের সুরক্ষিত ঘাঁটি হইতে তাহারা অনায়াসে যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। তাহাদের নৌবহরের অধিকাংশ যদিও পোর্ট আর্থারের ঘাঁটিতে, তথাপি ১২০০ মাইল দূরবর্ত্তী ব্লাডিভোষ্টক বন্দরে রহিয়াছে তাহাদের ক্রুজারবাহিনী। কিন্তু জাপানী নৌবহরের

এমন ক্ষমতা নাই যে, এই দুই নৌঘাঁটিই তাহারা একযোগে অবরোধ করিতে পারে। এড্‌মিরাল টোগো ইহা ছাড়া আর এক প্রকারের অসুবিধায় পড়িলেন। তাঁহার কোন রিজার্ভ বা মজুত যুদ্ধজাহাজ ছিল না। সুতরাং যদি কোন বড় জাহাজ ঘায়েল বা খতম হয়, তবে উহার স্থান পূরণ করা সম্ভব ছিল না। কাজেই সাময়িকভাবে পরাজয় স্বীকার করিলেও তাঁহার বিপদ ঘটিবে। এই প্রকার জটিল অবস্থায় তিনি যে রণনীতির অনুসরণ করিলেন, পৃথিবীর সর্বত্র তাহা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করিয়াছে। এক চমৎকার পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি দুঃসাহসের সঙ্গে পোর্ট আর্থার বন্দরের নৌবহরের উপর টর্পেডো আক্রমণ আরম্ভ করিলেন। পরদিন তিনি তাঁহার নৌবহরকে পোর্ট আর্থারের পাল্লার মধ্যে লইয়া গেলেন এবং যে সমস্ত রুশ জাহাজ বাহির হইয়া আসিল, তিনি সেগুলির অধিকাংশ জখম করিলেন। অপর পক্ষে তাঁহার নিজের বিশেষ কোন ক্ষতি হইল না। এই দুঃসাহসিক আক্রমণাত্মক নীতির ফলে রাশিয়ার প্রধান নৌবহর প্রায় অচল অবস্থায় পৌঁছিল। ফলে, টোগো তাঁহার নৌবহরের একাংশকে পাঠাইতে পারিলেন ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরের ক্রুজারগুলির উপর নজর রাখিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে তিনি টোকিও গভর্ণমেণ্টকে জানাইলেন যে, এক্ষেণ জাপানী সৈন্যদলকে নিরাপদে কোরিয়ায় পাঠানো যাইতে পারে। তিনি নিজে পোর্ট আর্থারের কাছাকাছি অপেক্ষা করিতে লাগিলেন এবং রুশদের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখিয়া যখনই সুযোগ পাইলেন তখনই টর্পেডো দ্বারা আক্রমণ, দূর পাল্লার কামান হইতে গোলাবর্ষণ করিতে এবং মাইন পুঁতিতে লাগিলেন। এই সময় জাপ নৌবহরেরও ক্ষতি হইল, দুইখানা ব্যাট্‌ল্‌সিপ্‌ ও একখানা ক্রুজার একমাসের মধ্যেই নষ্ট হইল। তথাপি টোগো পোর্ট আর্থারের উপর তাঁহার বজ্রমুষ্টি শিথিল করিলেন না।

এই অবস্থায় আগষ্ট মাসে রুশ নৌবহর জাপানীদের বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার জন্য মরিয়া হইয়া উঠিল। উভয়পক্ষে ঘোরতর লড়াই বাধিল। টোগোর জাহাজ (Flagship) 'মিকাসা' সাংঘাতিক ক্ষতিগ্রস্ত হইল, কিন্তু রুশীয় নৌবহর পরাজিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া গেল। কতকগুলি জাহাজ নিরপেক্ষ বন্দরে আশ্রয় নিল এবং কতকগুলি পোর্ট আর্থারে ফিরিয়া গেল। সেখান হইতে তাহারা আর বাহির হইতে পারিল না। ইহার চারিদিন পর টোগোর সহকারী এড্‌মিরাল্ কামিমুরার সহিত ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরের ক্রুজারবাহিনীর নিদারুণ সঙ্ঘর্ষ বাধিল। এই নৌবহরও জাপানীদের হাতে পরাজিত হইল। এই সংঘর্ষে যে দুইখানা যুদ্ধজাহাজ রেহাই পাইয়াছিল, সেই দুইটি ভ্লাডিভোষ্টক বন্দরে ফিরিয়া যায় এবং আর কখনও সমুদ্রে জাপানীদের বিরুদ্ধে হানা দেয় নাই। সাত মাসের কম সময়ের মধ্যে জাপানীরা সমুদ্রের উপর আধিপত্য লাভ করিল এবং স্বচ্ছন্দচিত্তে তাহাদের সামরিক অভিযান চালাইতে লাগিল। রাশিয়া শেষ পর্য্যন্ত তাহাদের বাল্‌টিক নৌবহর প্রশান্ত মহাসমুদ্রে পাঠাইয়া এই পরাজয়ের প্রতিশোধ লইতে চাহিল। কিন্তু গোড়া হইতেই ইহা একটা ব্যর্থ চেষ্টা ছিল। ইউরোপ হইতে দীর্ঘ পাড়ি দিয়া এশিয়া খণ্ডে পৌছিবার মুখে সুশিমা প্রণালীতে এডমিরাল্ টোগো এই নৌবহরকে বাধা দেন। যে সঙ্ঘর্ষ ঘটিল তাহাতে রুশ নৌবহর সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। খুব সামান্য কয়েকখানা জাহাজই নিরপেক্ষ বন্দরে যাইতে পারিয়াছিল, আর বাকী সমস্ত রুশ জাহাজ হয় নিমজ্জিত না হয় ধৃত হইয়াছিল। আধুনিক নৌযুদ্ধের ইতিহাসে এতবড় চূড়ান্ত নৌ-সঙ্ঘর্ষ খুব কম ঘটিয়াছে, অথচ জাপানীদের ক্ষতি অতি সামান্যই হইয়াছিল। ঐতিহাসিকগণ বলেন যে, এই সমস্ত সংগ্রামে জাপানী নৌবহরের মহড়া, নৈপুণ্য ও সাহস অত্যন্ত উচ্চস্তরের হইয়াছিল।

জাপানী নৌসেনাপতিগণ যে তিনটি গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহা রুশদের মধ্যে দুর্লভ ছিল। নৌযুদ্ধ পরিচালনায় এই তিনটি গুণ উল্লেখযোগ্য :—

(১) **Accuracy of diagnosis,** বা আসল অবস্থার লক্ষণ সঠিকভাবে নির্ণয়

(২) **Concentration of purpose,** বা লক্ষ্য পূরণের জন্য শক্তির সংহতিকরণ, এবং

(৩) **Steadiness of conduct,** বা পরিচালনার নিয়ম শৃঙ্খলা

জাপানী নৌসংগ্রামের পিছনে এই ঐতিহ্য রহিয়াছে। জাপানী নৌবাহিনী এজন্য গর্বিত, আত্মবিশ্বাসী এবং দুঃসাহসী হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামেও জাপানের অভিযান এই সমস্ত লক্ষণ বহন করিয়া আনিতেছে। আধুনিক জাপ নৌবহর অতিকায় যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাট্‌ল্‌সিপের দিক হইতে বৃটেন ও আমেরিকার সমকক্ষ নহে। কিন্তু ক্রুজার শ্রেণীর জাহাজে জাপান যথেষ্ট শক্তিশালী। ক্ষিপ্রতা, দ্রুতগামিতা, গোলাগুলী বর্ষণের পটুতা এবং যান্ত্রিক সজ্জার শ্রেষ্ঠতায় জাপ নৌবহর প্রশান্ত মহাসাগরের মার্কিণ নৌবহরের সহিত পাল্লা দিতে পশ্চাৎপদ হইবে না—বিশেষজ্ঞদের ইহাই ধারণা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পেনাং ও হংকংয়ের পতন

(১)

মিত্রশক্তির সমস্যা

১২ই ডিসেম্বর '৪১।

১৯১৭ সালের এপ্রিল মাসে বৃটেন ও ফ্রান্সের এক সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমেরিকা জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছিল। কিন্তু এবারের অবস্থা বিপরীত; এবার জার্ম্মাণীই আগাইয়া আসিয়া আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। রাইখষ্ট্যাগে এক বক্তৃতায় হিট্‌লার ইতালী ও জার্ম্মাণীর সম্মিলিত যুদ্ধ ঘোষণার কথা জানাইয়াছেন এবং প্রকাশ করিয়াছেন যে, জার্ম্মাণী, ইতালী ও জাপান পরস্পরের মধ্যে সামরিক চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন। যে চুক্তি এতকাল রাজনৈতিক ও আধা-সামরিক ছিল, তাহা এক্ষণে পুরাপুরি সামরিক প্রতিজ্ঞাপত্রে রূপান্তরিত হইল। গত বৎসর অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন যে,

আমেরিকাকে প্রতিরোধ করিতে হইলে জার্ম্মাণীর পক্ষে জাপানকে যুদ্ধে না নামাইয়া উপায় নাই। বিগত মহাযুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরাজয়ের অন্যতম কারণ আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান এবং সেবার জাপান মিত্রশক্তির পক্ষে ছিল। বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবার প্রধানতম বিঘ্ন বৃটেনের নৌ-শক্তি এবং জার্ম্মাণীর নৌবলহীনতা। ইহার সঙ্গে আমেরিকার নৌবহর ও অস্ত্রাগার সংযুক্ত হইলে বৃটেন আরও বেশী শক্তিশালী হইবে। কিন্তু আমেরিকা ও বৃটেনের পরেই জাপান নৌ-শক্তিতে শ্রেষ্ঠ। ওয়াশিংটন-চুক্তির দ্বারা বৃটেনের ও আমেরিকার আনুপাতিক নৌ-শক্তির হিসাবে জাপানকে নৌ-বহর কমাইতে হইয়াছিল, কিন্তু পরবর্ত্তীকালে জাপান এই অবস্থাকে অস্বীকার করিয়া তাহার নৌ-বল বৃদ্ধি করিয়াছে। বর্ত্তমানে মার্কিণ ও বৃটিশ বড় যুদ্ধ-জাহাজগুলি (ক্যাপিটাল শিপ), জাপানের তুলনায় বেশী, সন্দেহ নাই। কিন্তু ছোট যুদ্ধ-জাহাজের সংখ্যা এবং ক্ষিপ্রতা ও নৌ-অস্ত্রসজ্জায় জাপান ইহাদের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। একদল বিশেষজ্ঞের মতে ছোট যুদ্ধ-জাহাজই (ক্রুজার) আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের দ্রুততা ও ক্ষিপ্রতার যুগে অনেক বেশী কার্য্যকরী। বড় যুদ্ধ-জাহাজের গতিবেগ কম এবং মহড়া চালাইবার পক্ষে অসুবিধা এবং একবার এইগুলি ডুবিয়া গেলে অস্ত্রে, যন্ত্রে, লোকবলে ও অর্থব্যয়ে অপরিমিত লোকসান ঘটিয়া থাকে। জাপানী নৌ-বলের এই সাহায্য জার্ম্মাণী গ্রহণ করিতে চাহিয়াছে আমেরিকার বিরুদ্ধে। রোম, বার্লিন, টোকিওর সামরিক চুক্তির অন্যতম রহস্য এই। কিন্তু উপযুক্ত সময় বুঝিয়া উপযুক্ত আঘাত হানিবার অপেক্ষায় জাপান ছিল। দুই বৎসর যুদ্ধ চালাইয়া বৃটেনের নৌ-শক্তির প্রভূত ক্ষতি হইয়াছে। পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে তাহার দায়িত্ব এবং রাশিয়া ও অন্যান্য মিত্ররাষ্ট্র আজ বিব্রত। জাপান এমন মুহূর্ত্তে বৃটেন ও আমেরিকাকে আঘাত করিয়াছে যে, ইঙ্গ-মার্কিণের পক্ষে

সহসা তাল সামলানো কঠিন। এই বিদ্যুৎগতি আক্রমণের পশ্চাতে জার্মাণীর চাল আছে, একথা পূর্ব্বাহ্নে অনুমান করা গিয়াছিল। এক্ষণে প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের বক্তৃতায়ও উল্লেখ করা হইয়াছে যে, অক্ষ-শক্তিবর্গ পূর্ব্ব হইতে প্ল্যান ও চক্রান্ত করিয়া প্রশান্ত মহাসমুদ্রে এই অতর্কিত আক্রমণ করিয়াছে। আক্রমণের ফলে গুয়াম, ওয়েক, মিডওয়ে (প্রশান্ত মহাসমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ) এবং হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ এমনভাবে বিপন্ন হইয়াছে যে, রুজভেল্টের মতে এই দ্বীপগুলি অধিকৃত হইতে বিলম্ব নাই। এই স্বীকারোক্তি আমেরিকার নৌ-বহরের পক্ষে অত্যন্ত উদ্বেগজনক। আজিকার দিনে একথা কাহারও অজানা নাই যে, নৌ-বহরকে যুদ্ধ চালাইতে গেলে উহার পক্ষে আশ্রয়স্থল আবশ্যক। জাহাজের কয়লা, পেট্রোল, রসদ এবং মেরামতি কাজ ও শত্রুর অতর্কিত আক্রমণ হইতে আড়াল লইবার জন্য নৌ-ঘাঁটি ও জাহাজঘাটা (base and dock) থাকা একান্ত দরকার। প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিস্তার ৮।৯ হাজার মাইল। ফিলিপাইন হইতে হাওয়াই দ্বীপ পর্য্যন্ত পর পর কতকগুলি নৌ ও বিমান ঘাঁটি আমেরিকার রহিয়াছে। হাওয়াই দ্বীপের পর আড়াই হাজার মাইল পর্য্যন্ত আর কোন নৌ-ঘাঁটি আমেরিকার নাই। সুতরাং প্রশ্ন উঠিবে গুয়াম, হাওয়াই প্রভৃতি সমস্ত দ্বীপ আমেরিকার হাত ছাড়া হইয়া গেলে মার্কিণ নৌ-বহর জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইবে কিরূপে? আর এইগুলি হাত ছাড়া হইলে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জও দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না। কারণ, ফিলিপাইনের নিকটে জাপানের যে সমস্ত দ্বীপ রহিয়াছে, সেগুলি হইতে বিমান ও নৌ-আক্রমণ চালাইয়া ফিলিপাইনকে কাবু করা সহজতর হইবে। ইতিমধ্যেই ফিলিপাইনে জাপানী বিমান আক্রমণ প্রবল হইয়াছে এবং জাপ সৈন্যেরা সেখানে অবতরণও

করিয়াছে। সুতরাং আমেরিকার নৌ বা বিমান শক্তির সহসা পাল্টা-আক্রমণ চালাইবার সুবিধা দেখা যাইতেছে না।

আমেরিকার অবস্থা যখন এই, তখন বৃটেনের সঙ্কট আরও বেশী উদ্বেগজনক। প্রশান্ত মহাসাগরে বৃটিশ নৌ-বহরের 'সর্দ্দার' ছিল দুইখানা অতিকায় যুদ্ধ-জাহাজ—'প্রিন্স অব ওয়েলস্' এবং 'রিপালস্'। এই যুদ্ধ-জাহাজ দুইটি ভীমকায় ভাসমান দুর্গের মত দুর্ভেদ্য ছিল। কিন্তু জাপানী বোমারু বিমানের আঘাতে এই দুইখানা যুদ্ধ-জাহাজই ডুবিয়া গিয়াছে এবং এই সঙ্গে নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি এডমিরাল ফিলিপ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছেন। যুদ্ধ বাধিবার এক সপ্তাহের মধ্যেই এই ভয়াবহ-ক্ষতি বৃটেনের প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌ-বহরকে সঙ্কটজনক অবস্থায় ফেলিয়াছে। অবশ্য জাপানের একখানা ক্রুজার, একখানা ডেষ্ট্রয়ার নিমজ্জিত এবং আর একখানা বড় জাহাজ ঘায়েল হইয়াছে, কিন্তু জাপান সবেমাত্র যুদ্ধ সুরু করিয়াছে। উহার সমগ্র নৌবহর এখনও অক্ষত এবং অটুট। অপরপক্ষে বৃটেনের যুদ্ধ-জাহাজ ও নৌ-বহর দুই বৎসর ধরিয়া নানাভাবে এত ঘায়েল হইয়াছে এবং এত সমুদ্রে উহাদের দায়িত্ব পালন করিতে হয় যে, প্রশান্ত মহাসাগরের এই প্রচণ্ড ক্ষতি পূরণ করা দুঃসাধ্য। উপযুক্ত সংখ্যক যুদ্ধ-জাহাজ ও উপযুক্ত নৌ-ঘাঁটি হাতে না থাকিলে সমুদ্রপথের যুদ্ধ চালানো অসম্ভব। স্থলযুদ্ধে যেমন উভয় পক্ষের লক্ষ্য থাকে army বা সৈন্যবাহিনীকে সম্পূর্ণ ঘায়েল করা, জলযুদ্ধেও তেমনি উভয়পক্ষের লক্ষ্য থাকে নৌ-বহরগুলিকে ধ্বংস করা। কারণ নৌ-বহরগুলি একাধারে অস্ত্র ও সৈন্য। বর্ত্তমানে পূর্ব্ব এশিয়ায় বৃটেনের নৌ-বহর স্বাভাবিক কারণেই সঙ্কীর্ণ ও সীমাবদ্ধ (নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা নিশ্চয়ই জানিবার উপায় নাই), এই সঙ্কীর্ণ নৌ-বহরের দলপতি ছিল 'প্রিন্স অব ওয়েলস্' এবং 'রিপালস্'। ইহাদের ডুবির দ্বারা বৃটেনের সমগ্র নৌ-শক্তির

উপর প্রচণ্ড আঘাত পড়িয়াছে। ৪০০ মাইল দূর হইতে উড়িয়া আসিয়া লক্ষ্য বস্তুর উপর ঠিক মত বার বার বোমা বর্ষণ জাপানী বৈমানিকের কৃতিত্বের পরিচায়ক। স্বয়ং প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতায় এই রণচাতুর্য্যের প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন।

দীর্ঘকাল যাবৎ রণবিশারদগণ বলিয়া আসিতেছিলেন যে, গুয়াম্ (মার্কিণ) এবং সিঙ্গাপুর (বৃটিশ) কেন্দ্র প্রশান্ত মহাসমুদ্রের নৌ-যুদ্ধের চাবিকাঠি স্বরূপ। এই চাবিকাঠি যাহাদের দখলে থাকিবে, নৌ-আধিপত্য তাহাদের ঘটিবে। এই ঘাঁটি দখল এবং এখানকার নৌ-বহরকে ঘায়েল করিতে পারিলে আক্রমণকারীর অন্ততঃ সাময়িকভাবেও প্রাধান্য লাভ হইবে। জাপান চতুরের মত ঠিক এমন আঘাত হানিবার অপেক্ষাতেই ছিল। অতর্কিত আক্রমণ চালাইয়া সে সর্ব্বপ্রথমেই বৃটিশ নৌ-বহরকে ঘায়েল করিয়াছে এবং আমেরিকার ঘাঁটিগুলি প্রায় দখলে আনিবার জো করিয়াছে। এই অবস্থায় সিঙ্গাপুরের অবস্থা স্বভাবতঃই শোচনীয় হইয়া উঠিবে এবং সিঙ্গাপুরে যদি সঙ্কটের সৃষ্টি হয়, তবে অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড ও ভারতবর্ষ গুরুতর বিপদে পড়িবে। কিন্তু বর্ত্তমানে সিঙ্গাপুরের সঙ্কট উদ্বেগজনক হইবার পূর্ব্বেই ব্রহ্ম-সীমান্তে জাপানী বোমারুর আক্রমণ ঘটিয়াছে। ইন্দোচীন, শ্যাম উপসাগর ও থাইল্যাণ্ড জাপানের দখলে যাওয়ায় সিঙ্গাপুরকে পার্শ্বে রাখিয়াই জাপান ব্রহ্মদেশে হানা দিতে সাহসী হইয়াছে। বিমান বিশেষজ্ঞগণ বলিতেছেন যে, একমাত্র ইন্দোচীনেই ৯০টি বিমান ও নৌ-বিমান (seaplane) ঘাঁটি আছে! ফরাসীরা বিমান বিদ্যায় ওস্তাদ। যুদ্ধের আগে প্যারিস হইতে সাইগন পর্য্যন্ত ফ্রান্সের বিখ্যাত বিমান সার্ভিস ছিল, (বাটাভিয়ায় ওলন্দাজদেরও ছিল)। ইন্দোচীনের এই সমস্ত ছোট-বড় ঘাঁটির আজ সমস্তগুলিই জাপানের হাতে আসিয়াছে। ইহা ছাড়া থাইল্যাণ্ডে বা

শ্যামদেশে জাপানীরা অনেক দিন আগেই বিমান ঘাঁটি তৈয়ারীতে 'সাহায্য' করিয়াছিল। থাইল্যাণ্ডে ২০টি বিমান ও নৌ-বিমান ঘাঁটি রহিয়াছে। এই মোট ১১০টি বিমান ঘাঁটির (অবশ্য সবগুলিই প্রথম শ্রেণীর নহে) সাহায্য আক্রমণকারী জাপান পাইবে। রেঙ্গুণ হইতে ব্যাঙ্ককের (শ্যাম) দূরত্ব ৭৫০ মাইল। কিন্তু এই দূরত্ব মাত্র রাজধানী বা প্রধান নগরীর হিসাবে। বিমান ঘাঁটিগুলি ইতস্ততঃ চারিদিকে এবং সীমান্ত অঞ্চলেও অবস্থিত। সুতরাং বুদ্ধিমান পাঠকগণ সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে, শ্যাম ও ইন্দোচীনের বিমান ঘাঁটিগুলি হইতে জাপান বোমারুর সাহায্যে অনায়াসে ব্রহ্মদেশ ও মালয়ে অগ্রগতি লাভ করিতে পারিবে। অপরপক্ষে মিত্রশক্তি এই দিকে উপযুক্ত বিমান বহর সমাবেশ করিতে পারেন নাই। কাজেই বিমানপথে ও সমুদ্র পথে মিত্রশক্তির অবস্থা সুখকর নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

---
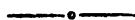
(২)

হংকং অবরোধ

১৫ই ডিসেম্বর '৪১।

জাপানীরা আক্রমণের সুরু হইতেই প্রায় সমস্ত মার্কিণ ও বৃটিশ ঘাটিগুলির উপর আঘাত হানিতেছিল। ১৫ই তারিখ হইতে বিখ্যাত হংকং বন্দরে অবরোধ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। অতর্কিত আক্রমণে সমুদ্র পথে আধিপত্য লাভ করিয়া এবং শ্রেষ্ঠতর বিমানশক্তি ও সৈন্যশক্তি প্রয়োগ করিয়া জাপানীরা গোড়া হইতেই গোলাবর্ষণ আরম্ভ করে। মিত্রপক্ষের সহিত যাহাতে সংবাদ আদান প্রদান না চলিতে পারে, এজন্য ১১ই তারিখ তাহারা হংকং ও ওয়াশিংটনের তারের সংযোগ (cable line) নষ্ট করিয়া দেয়। যোগাযোগ নষ্ট করিতে পারা রণকৌশলের একটা বড় লক্ষ্য; সুতরাং প্রারম্ভেই তাহারা এই কাজটি করিয়া রাখিল। হংকংকে

কেবল তাহারা সমুদ্রপথেই অবরোধ করে নাই, স্থলভাগ দিয়াও তাহারা বেষ্টনী সৃষ্টি করিল। ১৯৩৮ সালে চীনের হাত হইতে এক দুর্দ্ধর্ষ ও কৌশলপূর্ণ সংগ্রামের দ্বারা জাপানীরা ক্যাণ্টন দখল করিয়া লইয়াছিল। তখন হংকং বন্দর দিয়া ক্যাণ্টনে চীনাদের জন্য বিদেশ হইতে (বিশেষভাবে বৃটেন হইতে) সাহায্য যাইত। এই সাহায্যের পথ ছিন্ন হইল ক্যাণ্টন দখলের দ্বারা। এই গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রটি জাপানীদের হস্তগত হইলে ভবিষ্যতে হংকং যে বিপন্ন হইবে, সেই ধারণা পূর্ব্বাহ্নেই করা উচিত ছিল। কারণ, জাপানীদের হংকং আক্রমণে দেখা যাইতেছে যে, তাহারা ক্যাণ্টন হইতে অগ্রসর হইতেছে। কোয়াংটান প্রদেশের ইহা রাজধানী; ইহার পরেই কৌলুনের এলাকা আরম্ভ। জাপানীরা ক্যাণ্টনের পথ ধরিয়া কৌলুনে পৌছিয়াছে এবং ইহা দখল করিয়াছে। ক্যাণ্টন হইতে ইহার দূরত্ব মাত্র দুই মাইল। অতএব অবস্থা স্বভাবতঃই গুরুতর হইবে। হংকংয়ের পশ্চাৎদিক দিয়া এই অভিযান ব্যাহত করিবার জন্য চীনা বাহিনী ক্যাণ্টনে ও কৌলুনে জাপানের উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল, কিন্তু সেই আক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। কৌশল হিসাবে ইহা ভালোই ছিল। কারণ ইহা দ্বারা হংকংয়ের উপর চাপ হ্রাস পাইত। এক্ষণে ভোরবেলা হইতে অবরোধকারী জাপ সেনাদল ও হংকংয়ের আত্মরক্ষাকারীদের মধ্যে প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ চলিতেছে। জাপানীরা নৌবহর ও বিমানবহর হইতে গোলা ও বোমাবর্ষণ করিতেছে। ইহা ছাড়া কৌলুনের পিছনে পাহাড়ের উপর কামান বসাইয়া হংকংয়ের উপর অগ্নিবৃষ্টি করিতেছে। জনৈক সংবাদদাতা বলিতেছেন—

'যদিও জাপানীরা প্রচণ্ড বিমান আক্রমণ চালাইতেছে, তথাপি হংকং-বাসীরা জার্ম্মাণ আক্রমণের সময় লণ্ডনবাসীদের অনুরূপ প্রতিরোধ চালাইতেছে। হংকংয়ের সম্মুখস্থ ৩০ বর্গ মাইল জাপানীরা অধিকার করিয়াছে

বলিয়া যে দাবী করা হইয়াছে, তাহা বোধ হয় সত্য। বৃটিশেরা ব্যবহার উপযোগী সমস্ত জিনিষপত্রই ধ্বংস করিয়াছে। স্কটল্যাণ্ড, কানাডা, ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের সৈন্যগণ হংকংয়ের দুই সহস্র স্বেচ্ছাসৈন্যের সহযোগিতায় হংকং রক্ষা করিতেছে। মনে হইতেছে, প্রধান স্থল অঞ্চল হইতে হয়তো সৈন্য অপসারণ করিতে হইবে এবং শেষ পর্য্যন্ত দ্বীপটিকে রক্ষা করা হইবে। দ্বীপরক্ষা কার্য্য দীর্ঘস্থায়ী ও তীব্রতর হইবে।'

* * * *

পরবর্ত্তী তারিখগুলিতে দেখা যায় যে, চীনাবাহিনী ক্যাণ্টন-হ্যাঙ্কৌ রেলপথের ধার দিয়া কৌলুন দখলকারী জাপানী সৈন্যদের পার্শ্ব ও পশ্চাৎ দেশ আক্রমণ করিয়াছে। আর জাপ গোলন্দাজবাহিনী হংকংয়ের সমগ্র বন্দরের উপর গোলাবর্ষণ সুরু করিয়াছে। এই চীনাবাহিনীর সহিত জাপানীদের কয়েকদিন ঘোরতর যুদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু চীনারা জাপানীদের ক্ষতি সাধন করিলেও জয়লাভ করিতে পারে নাই।............

এইভাবে আক্রান্ত ও অবরুদ্ধ হইয়া হংকং কতকাল আত্মরক্ষা করিতে পারিবে? যাঁহারা দীর্ঘ অবরোধের কথা ভাবিতেছেন, তাঁহারা বোধ হয় বিশুদ্ধ সমরনীতির দিক দিয়া বিচার করিতেছেন না, করিতেছেন আত্মসান্ত্বনা লাভের জন্য। হংকংয়ের উপর আক্রমণ অত্যন্ত গুরুতর হইয়াছে। যদি কোন সমুদ্রতীরস্থ বন্দর নৌপথ দিয়া আক্রান্ত, বিব্রত ও অবরুদ্ধ হয়, তবে দীর্ঘকাল উহার পক্ষে আত্মরক্ষা করা কঠিন। নৌ-ঘাঁটি ও নৌ-বন্দর সাধারণতঃ সমুদ্রপথের আক্রমণ ও আত্মরক্ষার এবং যোগাযোগ রক্ষার জন্য স্থাপিত হইয়া থাকে। কিন্তু শত্রুর আক্রমণে যদি সেই সমুদ্রপথ বিপন্ন, বেষ্টিত ও যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে একমাত্র দুর্গশ্রেণীর আড়ালে থাকিয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়, এবং একান্তরূপে নির্ভর করিতে হয় নিজেদের পূর্ব্বাহ্ণে সংগৃহীত

রসদ, পানীয়, গোলাগুলি এবং অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্তের উপর। কিন্তু হংকংয়ে দীর্ঘ অবরোধের উপযোগী এতগুলি আবশ্যকীয় দ্রব্য ও সৈন্যের ব্যবস্থা আছে কিনা, সন্দেহজনক। সমুদ্রপথের যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় এই পথ দিয়া কোন নূতন সৈন্য, অস্ত্র, রসদ ইত্যাদি আনা সম্ভব নহে। এমন কি একমাত্র বেতারযন্ত্র ছাড়া সংবাদ আদান-প্রদানের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যদি নৌপথের পর স্থলপথের সংযোগও অব্যাহত থাকিত, তাহা হইলেও কিঞ্চিৎ আশা করা যাইত। কিন্তু সেই সম্ভাবনাও নষ্ট হইয়াছে। কারণ জাপানীরা কৌলুন ও ক্যান্টন দখল করিয়া সেই পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। এভাবে বহির্জগতের সহিত সংযোগ হারাইয়া হংকং দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধ চালাইতে পারিবে বলিয়া মনে হয় না। বিশেষতঃ জাপানীরা বিদ্যুৎ-গতিতে জল, স্থল ও আকাশ পথ ধরিয়া আক্রমণ চালাইয়াছে এবং ক্ষুদ্র হংকং দ্বীপের উপর প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। হংকংয়ের গবর্ণর অবশ্যই সাহসী ও দৃঢ়চেতা পুরুষের মত এই বিপজ্জনক অবস্থায়ও শেষ পর্য্যন্ত লড়িবার সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়াছেন। তাঁহার এই ঘোষণানুযায়ী হংকংয়ের সংগ্রাম ইতিহাসের প্রশংসা লাভ করিবে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত সামরিক জয়লাভ সম্ভব হইবে কিনা, তাহা নিশ্চয়ই সংশয়াচ্ছন্ন।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(৩)

উত্তর মালয়ে

১৬ই ডিসেম্বর '৪১।

হংকং বন্দর ও নৌ-ঘাঁটির বিপদ যখন ঘনাইয়া আসিতেছে, তখন নিম্ন ব্রহ্মে জাপ সৈন্যের প্রবেশ ও উত্তর মালয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। নিম্ন ব্রহ্মের শেষ প্রান্ত লেজের মত সমুদ্রে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং উহা মালয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই পুচ্ছের শেষভাগে ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট এবং এই ভিক্টোরিয়া পয়েন্টের ভিতর দিয়াই কিছু জাপ সৈন্য প্রবেশ করিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে উত্তর মালয়ের যে অংশে এক্ষণে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সহিত জাপানীদের যুদ্ধ চলিতেছে, ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট হইতে উহার নিরবচ্ছিন্ন স্থলপথের যোগ রহিয়াছে। এই সমগ্র অংশটাই মানচিত্রে দীর্ঘ লম্বমান সূতার মত দেখা যাইতেছে। মালয়

উপদ্বীপ ৭০০ মাইল দীর্ঘ, সঙ্কীর্ণতম অংশে ইহা মাত্র ৩০ মাইল চওড়া ও বিস্তৃততম অংশে ১৮০ মাইল। ক্রা যোজক হইতে ইহা সিঙ্গাপুরে গিয়া শেষ হইয়াছে এবং ক্রার উপর হইতে দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্মের আরম্ভ হইয়াছে। মালয় উপদ্বীপ অরণ্যের জন্য বিখ্যাত। বহু রোমাঞ্চকর আরণ্যক চিত্রের উপাদান মালয়, বোর্ণিও ইত্যাদি হইতে সংগ্রহ করিয়া সিনেমা-বিলাসীদের মনোরঞ্জন করা হইয়াছে। নানা শ্রেণীর বিচিত্র জন্তু জানোয়ার এই দেশের গভীর জঙ্গলের বাসিন্দা। নদীগুলি কুমীরে ভর্ত্তি। তীরভূমির অধিকাংশই জলাভূমি মাত্র। ইহা ছাড়া মালয়ের শিরদাঁড়া অরণ্যবহুল গিরিশ্রেণীতে নিবদ্ধ। এই সমস্ত পাহাড়ের অনেক শৃঙ্গ আছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ শৃঙ্গ ৭ হাজার ফুট। নিম্ন ব্রহ্মের টেনাসারিম বিভাগ, যেখানে জাপানী বোমারুর আক্রমণ ঘটিয়াছে সেখানে টিনের কারখানা আছে। এই বিভাগ সালুইন, থাটন, আমহার্ষ্ট, টাভয় ও মাগুঁরি জেলা লইয়া গঠিত। জেলাগুলি সমস্তই অরণ্যে ও পাহাড়ে আচ্ছন্ন। নদীর মধ্যে সালুইন প্রধান। সালুইন জেলার পাহাড়গুলির শৃঙ্গ ১ হাজার হইতে ৩ হাজার ফুট, থাটনে পাহাড় কিছু কম এবং উহাদের শৃঙ্গগুলি ৩০০ হইতে ১ হাজার ফুট উঁচু মাত্র। টাভয় জেলাও অনুরূপ, কিন্তু টাভয় অত্যধিক গভীর জঙ্গলে পরিপূর্ণ। এখানে সীমান্তবর্ত্তী পাহাড়ের উচ্চতা আড়াই হাজার ফুট। মাগুঁরি জেলা ব্রহ্মের শেষ প্রান্ত। ইহার পূর্ব্বে ও দক্ষিণে শ্যামদেশ ও শ্যাম উপসাগর এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর। ভিক্টোরিয়া পয়েন্টের যেখানে ইহা শেষ হইয়াছে সেখানে ইহা সমুদ্রের সঙ্গে মিশিয়াছে। এখানে কিংস্ সেলোয়, এলফিনষ্টোন, ডোমেল, ক্যাম্পবেল প্রভৃতি কতকগুলি দ্বীপ আছে। এই দ্বীপগুলি বিমান ও নৌঘাঁটির পক্ষে সহায়ক এবং ব্রহ্মদেশ রক্ষার পক্ষে এই দ্বীপগুলি কাজে লাগিবে। নিম্ন ব্রহ্ম বা উত্তর মালয় কোনটাই বড়

রকমের যুদ্ধের উপযোগী নহে, কারণ এই দেশগুলি জঙ্গল ও পাহাড়ে আচ্ছন্ন এবং রাস্তাঘাট কম ও সঙ্কীর্ণ। তথাপি সংবাদে প্রকাশ, জাপানী সৈন্যরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সহিত প্রাকৃতিক বিঘ্নকে অস্বীকার করিতেছে এবং জঙ্গলে ও কুমীর পরিপূর্ণ নদীতে দুঃসাহসেব সহিত যুদ্ধ চালাইতেছে। দীর্ঘকাল দক্ষিণ চীনে সংগ্রাম করিয়া জাপানী সৈন্যরা এই অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে।

কিন্তু এই সমস্ত দেশেরই ভাগ্যসূত্র জড়িত সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের সহিত। হংকংকে অবরোধ করিয়া প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হইতেছে। হংকংয়ের পতন হইলে সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ নৌবহরের দক্ষিণ চীন সমুদ্রে অভিযান চালানো অত্যন্ত কঠিন হইবে এবং সিঙ্গাপুর অঞ্চল হয়তো বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। হংকংয়ের যুদ্ধে চীনারা যথেষ্ট সাহায্য করিতে পারিত। যদি তাহারা ক্যান্টন হইতে পশ্চাৎ ও পার্শ্বদেশ সাফল্যের সহিত আক্রমণ করিতে পারিত, তাহা হইলে হংকং রক্ষা অনেক বেশী সহজ হইত। আক্রান্ত স্থানগুলিকে জাপান যেমন পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে, তেমনই জাপানী রণনীতির আর একটা বড় উদ্দেশ্য হইতেছে মার্কিণ ও বৃটিশ নৌবহরের মধ্যে সংযোগ রক্ষার পথ বিচ্ছিন্ন করা। এই কারণেই তাহারা ফিলিপাইন হইতে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মার্কিণ দ্বীপে দ্রুত আক্রমণ চালাইতেছে। আর একটি গুরুতর প্রশ্ন এই যে, এই সংগ্রাম কেবল নৌবহর ও স্থল সৈন্যের উপর নির্ভরশীল নহে। বিমানবাহিনী ও বিমানবহরের কার্য্যকারিতা এই যুদ্ধে অত্যন্ত বেশী। বিমান শক্তিতে যাহারা শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহারা যেমন নৌবহরকে ঘায়েল করিতে পারিবে, তেমনই প্রতিপক্ষের সমস্ত প্রকার সামরিক লক্ষ্য নষ্ট করিতে পারিবে। কিন্তু মালয়ের যুদ্ধে বৃটিশ পক্ষে উপযুক্ত সংখ্যক বিমানের অভাব ঘটিয়াছে। প্রচুর সংখ্যক বিমান

না আসা পর্য্যন্ত মালয় হইতে জাপানীদিগকে বিতাড়ন কার্য্যতঃ অসম্ভব। হয়তো শেষ পর্য্যন্ত মালয় ছাড়িয়া সিঙ্গাপুরে পশ্চাদপসরণ ঘটিতে পারে।

সাধারণতঃ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া কোন শত্রুদেশে সৈন্যদলের অবতরণ অত্যন্ত বিপজ্জনক। এজন্য প্রথমেই দরকার সমুদ্রের উপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। এই আধিপত্য প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন প্রতিপক্ষের নৌবহর ধ্বংস বা অকেজো করা কিম্বা উহা পৌঁছিবার আগেই সেনাদলকে সমুদ্র পার করা। রণপণ্ডিতগণ আরও বলেন যে, জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর মধ্যে পরিপূর্ণ সংযোগ প্রতিষ্ঠা না হইলে এই প্রকার অভিযানে আক্রমণকারীর পক্ষে সাফল্য অর্জ্জন প্রায় অসম্ভব। কিন্তু মালয়ে জাপ সৈন্যেরা ইতিমধ্যেই বহু স্থানে অবতরণ করিয়াছে এবং তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছে। এই আক্রমণের ব্যাপারে তাহারা যথেষ্ট কৌশল খাটাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বহু স্থানে একই সময়ে সৈন্যদলের অবতরণ প্রকৃতপক্ষে একটা ধাপ্পা মাত্র। কারণ নির্দ্দিষ্ট কোন্ স্থানে আক্রমণকারী তাহার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহা বুঝা যায় না। ফলে একই সময়ে অনেকগুলি স্থান রক্ষা করিতে গিয়া আত্মরক্ষাকারীদলের শক্তি বিচ্ছিন্ন হয় এবং ছড়াইয়া পড়ে। আক্রমণকারী ঠিক এমন সুযোগেরই অপেক্ষা করে এবং আত্মরক্ষাকারীর সর্ব্বাপেক্ষা দুর্ব্বল স্থানে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ঘায়েল করিবার চেষ্টা করে। উত্তর মালয়ের জাপবাহিনী সম্ভবতঃ এই কৌশলই অবলম্বন করিয়াছে। এজন্যই তাহারা একই সময়ে বহু স্থানে অবতরণ করিয়া একটিমাত্র কেন্দ্রে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শক্তি প্রয়োগ করিয়াছে। ইহার ফলে কেডার যুদ্ধ অন্ততঃ স্থানীয়ভাবে বিপদ ঘটাইতে পারে। দক্ষিণ ব্রহ্মের যেখানে প্রথম আক্রমণ ঘটিয়াছে, সেখান হইতে সমগ্র ব্রহ্ম দেশ বিপন্ন করা যাইবে না। কারণ এখান হইতে কেবল রেঙ্গুণেরই

দূরত্ব ৫ শত মাইল। ভৌগোলিক অসুবিধার জন্য কোন বড় রকমের অভিযান এই অঞ্চলে চালানো কঠিন।

জাপবাহিনী স্বভাবতঃই স্বজাতগর্ব্বী, দুঃসাহসী ও বেপরোয়া। এই দিক দিয়া জার্ম্মাণ সৈন্যদের সহিত তাহাদের কিছু সাদৃশ্য আছে। যে কোন বিঘ্ন অতিক্রমণের জন্য তাহারা আত্মবলি দিতে বা বেপরোয়া আক্রমণ করিতে পারে। মালয়ে সেই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। উত্তর মালয়ের কোটাবারুর বিমান ঘাঁটি তাহারা ইতিমধ্যে দখল করিয়াছে এবং বর্ত্তমানে কেডায় প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে। প্রাকৃতিক বিঘ্নের জন্য এখানে আত্মরক্ষাকারীদের আড়াল লইবার এবং অতর্কিত পাল্টা আক্রমণ চালাইবার অনেক সুবিধা আছে। কিন্তু জঙ্গল ও পাহাড়ের জন্য বিমান আক্রমণ ও গোলা-বর্ষণে উভয় পক্ষেরই অসুবিধা। গভীর জঙ্গলের আড়ালে লক্ষ্যবস্তুর সন্ধান পাওয়া যেমন কঠিন, তেমনই প্রতিপক্ষের উপর ঠিকমত বোমানিক্ষেপ অসু-বিধাজনক। তথাপি যুদ্ধ অত্যন্ত তীব্র হইতেছে এবং ভারতীয় সৈন্যরা অত্যন্ত বীরত্বের সহিত লড়িতেছে। পেনাংয়ে প্রচণ্ড বোমাবর্ষণ চলিতেছে এবং কেডা রক্ষাকারী ভারতীয় সৈন্যদের উপর এই আদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, তাহাদের একজনও পিছু হাটিতে বা আত্মসমর্পণ করিতে পারিবে না, শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে হইবে। সেনাপতির এই আদেশের দ্বারা রণক্ষেত্রের অবস্থা অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া মনে হইতেছে। ভবিষ্যৎ সঙ্কটজনক!

দ্বিতীয় অধ্যায়

(৪)

বিমান, আরও বিমান!

১৭ই ডিসেম্বর '৪১।

মালয় রক্ষাকারী সাম্রাজ্যবাহিনী দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াও জাপ-বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। কেডা অঞ্চল হইতে সাম্রাজ্যবাহিনী কিছু পশ্চাতে হটিয়া আসিয়াছে, ব্রহ্মের দক্ষিণপ্রান্ত ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট হইতেও বৃটিশবাহিনী হটিয়া আসিয়াছে। জাপানীরা মালয়ের উত্তর-পশ্চিম (বঙ্গোপসাগরের দিকে) অংশে ক্রমাগত চাপ দিতেছে এবং সাম্রাজ্যবাহিনীর প্রথম আত্মরক্ষার ব্যূহ ভেদ করিয়াছে। মালয়ের উত্তর পূর্ব্ব দিকেও যুদ্ধ চলিতেছে। 'রয়টার' বলিতেছেন যে, জাপানীরা ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টে প্রবেশ করিয়াছে, তাহারা মালয়কে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিতেছে। যদি মালয় বিচ্ছিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মদেশ ও সিঙ্গাপুরের

মধ্যে বিমান পথের যোগাযোগ নষ্ট হইবে। সিঙ্গাপুর ও রেঙ্গুণের মধ্যে বিমান পথের যে যোগাযোগ আছে, মালয় উপদ্বীপে উহার ঘাঁটি রহিয়াছে। সেই ঘাঁটিগুলি জাপানীদের হাতে পড়িলে বিমানগুলিকে রেঙ্গুণ হইতে খোলা সমুদ্রের উপর দিয়া সিঙ্গাপুরে যাইতে হইবে। কিন্তু মালয়ের তীর হইতে তেমন অবস্থায় জাপানী বিমান নিশ্চয়ই বাধা দিবে। সুতরাং মালয়ের যুদ্ধ সিঙ্গাপুরের পক্ষেও বিপজ্জনক।

মালয়-রক্ষাকারীগণ আর্ত্তনাদ করিয়া বলিতেছেন যে, তাঁহাদের আর সমস্তই ঠিক আছে, কিন্তু বিমান চাই এবং আরও বিমান চাই। যদি বিমান না পাওয়া যায়, তবে জাপানীদের মালয় হইতে হটানো যাইবে না, সোজা সিঙ্গাপুরের দিকে পালাইতে হইতে পারে। অতি সরল এবং স্পষ্ট উক্তি! ইহার উত্তরে ব্রহ্মদেশ, মালয় ও ভারতবর্ষের সমরকর্ত্তা-দিগকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে যে, তাঁহারা এতদিন ধরিয়া কি দিবানিদ্রা দিতেছিলেন? মালয়, সিঙ্গাপুর এবং গোটা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার ঘাঁটিগুলি যে সুরক্ষিত, একথা অজস্রবার ঘোষণা করা হইয়াছিল। জাপান যে আক্রমণ করিবে, তাহাও গত ৬ মাস ধরিয়া প্রচারিত হইতেছিল। তথাপি উপযুক্ত বিমানের অভাবে যুদ্ধের ৭ দিনের মধ্যেই বৃটিশ নৌ-বহরের শ্রেষ্ঠতম দুই যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংস হইল, মালয় ও ব্রহ্মদেশের দুই অংশে পশ্চাতে হটিতে হইল এবং আরও বিমান চাই বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে হইল!

এই অবস্থার যে উদ্ভব হইতে পারে, তাহা আশঙ্কা করিয়াই ভারত-বর্ষের শ্রমশিল্পের মালিকগণ এবং আত্মরক্ষায় উৎসাহী ব্যক্তিগণ যুদ্ধের গোড়া হইতেই এই দেশে মোটর-শিল্প ও বিমান-শিল্পের কারখানা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচুর আন্দোলন ও আবেদন করিয়া আসিয়াছেন। যদি বৃটিশ কর্ত্তারা সেই আবেদনে সাড়া দিয়া কারখানাগুলি প্রতিষ্ঠা করিতেন,

তাহা হইলে মালয়ের জঙ্গলে আজ জাপ বোমারু বিমানের মার খাইতে হইত না। আজিকার দিনে রণনীতির এই তথ্য আর অজ্ঞাত নাই যে, বর্ত্তমান ইঙ্গ-মার্কিণ-জাপ সংগ্রাম কেবল নৌবহর ও স্থল বাহিনীর উপরেই নির্ভরশীল নহে, উহা একান্তরূপে বিমানবহরের সহিত জড়িত। ১৯৩৯ সাল হইতে ১৯৪১এর ডিসেম্বর পর্য্যন্ত যান্ত্রিক যুদ্ধের ভয়াবহ অভিযান চলিয়াছে, কিন্তু বৃটিশ সমরযন্ত্রের শিথিল গ্রন্থি যেন কিছুতেই দৃঢ় হইতে চাহিতেছে না। নরওয়ের যুদ্ধে বৃটিশ বাহিনীর পরাজয় ঘটিল উপযুক্ত বিমান শক্তির সাহায্য ও সহযোগিতার অভাবে। বৃটিশ নৌবহর তীরের দিকে অগ্রসর হইতে বাধা পাইল এবং বৃটিশ স্থল-সৈন্তেরা জার্ম্মাণ বিমানের প্রচণ্ড আক্রমণে যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিল না। ইহার আগে পোল্যাণ্ডের রণক্ষেত্রে বীর পোলিশ বাহিনীর পরাজয় ঘটিল বিমানশক্তির দ্রুত ক্ষয়ের জন্য। তারপর বেলজিয়াম, হল্যাণ্ড, ফ্রান্স, গ্রীস ও বলকান ইত্যাদির যুদ্ধ ঘটিয়া গিয়াছে। ক্রীটের যুদ্ধে বৃটিশ নৌবহর পিছু হটিল জার্ম্মাণ বোমারুর রূঢ় আক্রমণের জন্য এবং আলেকজেন্দ্রিয়া বন্দর হইতে বৃটিশ বিমানের ক্রীট পর্য্যন্ত গমনে ব্যর্থতার জন্য। লিবিয়ায় ইতালীর বিরুদ্ধে বৃটিশ অভিযানের সাফল্য ঘটিয়াছিল নৌবহর ও বিমান বহরের পারস্পরিক সহযোগিতার জন্য। ইহা ছাড়া অসংখ্য জাহাজ ডুবির ব্যাপারে এবং ইতালীর টরেন্টো বন্দরে ও মাটাপনের নৌযুদ্ধে বার বার বিমানবহরের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হইয়াছে। বিমানবাহিত বোমা, টর্পেডো ও মাইন আজ নৌবহরকে পশ্চাতে ফেলিয়াছে। এত অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনার পরেও ভারতবর্ষের একান্ত পূর্ব্ব-দক্ষিণ দ্বারে বিমান শক্তির দুর্ব্বলতার কথা শুনা যাইতেছে।

আজ জাপানী নৌবহর ও বিমানবহর একত্রে হংকং, মালয়, ফিলিপাইন ও বৃটিশ বোর্ণিও দ্বীপকে বিপন্ন করিয়াছে। সংবাদে দেখা

যাইতেছে যে, 'Japanese forces landed at—' অর্থাৎ জাপ-সৈন্যেরা অমুক স্থানে 'অবতরণ' করিয়াছে। এই 'অবতরণ' শব্দটা লক্ষ্য করিবার মত। ইহার পশ্চাতে রণনীতির একটা বড় ইঙ্গিত লুকানো আছে। কারণ ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে, জাপ নৌবহর উপযুক্ত বিমান-বহরের সহায়তায় তীরের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা বিদীর্ণ করিয়া কিম্বা অতিক্রম করিয়া সৈন্যদল নামাইতে পারিতেছে। এই অবস্থাটা আক্রমণ-কারীর শক্তি ও আত্মরক্ষাকারীর দুর্ব্বলতার পরিচায়ক। জেনারেল স্যার এডমণ্ড আয়রণসাইড, যিনি কিছুকাল আগেও বৃটিশ ইম্পিরিয়েল জেনারেল ষ্টাফ বা সাম্রাজ্যিক সেনানীমণ্ডলীর বড়কর্ত্তা ছিলেন, তাঁহার মতামত এখানে উদ্ধৃত করা যাইতেছে। বিদেশে সমুদ্রপারের অভিযান সম্পর্কে তিনি বলিতেছেন,—

'There is no operation of war which is so difficult as a landing from the sea against an enemy who is prepared to offer resistance. Navy, Army and Air authorities have all to work together like one man... To attempt to establish an aerodrome ashore against an enemy with an air force is just as difficult as any other landing, for the enemy will not be hoodwinked into allowing you to get on equal terms with him as regards air before the main operation start...The whole administration of the operation should be thoroughly sound, and if there is any doubt about this such undertakings should be avoided like the pest.'

ইহার সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম এই যে, 'সমুদ্রপারবর্ত্তী কোন শত্রুর দেশে সৈন্য অবতরণের মত এমন কঠিন ও বিপজ্জনক কাজ আর কিছু নাই।

আত্মরক্ষাকারী সমুদ্রতীর হইতে বিমান ও অন্যান্য শক্তির সাহায্যে আক্রমণকারীকে গোড়া হইতেই এক প্রকাণ্ড যুদ্ধের ফ্যাসাদে না ফেলিয়া কিছুতেই অবতরণ করিতে দিবে না। এই অবস্থায় আক্রমণকারীকে নৌশক্তি, বিমানশক্তি ও স্থলশক্তির মধ্যে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য ঘটাইতে হইবে এবং পূর্ব্বাহ্নে সুনিপুণ সজ্যবদ্ধতার দ্বারা অত্যন্ত নিখুঁত আয়োজন করিতে হইবে। 'বিমানবহর, নৌবহর ও স্থলবাহিনীর মধ্যে যদি এই প্রকার নিখুঁত সংযোগ সাধিত না হয়, কিম্বা সেই বিষয়ে সন্দেহ থাকে, তবে এই ধরণের অভিযান বিষবৎ ত্যাগ করিতে হইবে।' বৃটিশ রণপণ্ডিতের এই অভিমতের বিচারে আজ জাপানীদের মালয়ে, বোর্ণিওতে ও ফিলি-পাইন ইত্যাদিতে অবতরণ কি আক্রমণকারীর শক্তি ও আত্মরক্ষাকারীর দুর্ব্বলতার সূচনা করিতেছে না? জাপান দূর সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া এত সহজে অবতরণ করিতেছে কিরূপে? ১৯১৪ সালেও ফ্রান্সের রণক্ষেত্রে আরও 'কামান চাই' 'গোলা চাই' এই চিৎকার শুনা গিয়াছিল। আজ ১৯৪১ সালেও মালয়ের জঙ্গলে সেই একই কাহিনী শুনিতেছি।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(৫)

হংকং ও পেনাংয়ের বিপদ

২০শে ডিসেম্বর '৪১।

ইঙ্গ-জাপ-মার্কিণ যুদ্ধের অবস্থা ক্রমশঃ জটিল হইয়া উঠিতেছে। মালয়ের উত্তরে ও ব্রহ্মের দক্ষিণ প্রান্তে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট দখলের পর জাপ-বাহিনী ক্রমশঃ মালয়ের উত্তর-পশ্চিম তীর ধরিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছে। মালয়ের পশ্চিম তীর ভারত মহাসাগরের দিকে। এখানকার ওয়েলেসলী প্রদেশ জাপানীদের দখলে আসিয়াছে। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী কেডা অঞ্চলে ইতিপূর্ব্বেই জাপানী ও সাম্রাজ্যবাহিনীর মধ্যে তীব্র সংগ্রাম চলিয়াছিল। কিন্তু সাম্রাজ্যবাহিনী ক্রমশঃই পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইয়াছিল। ওয়েলেসলী দখল হওয়ার ফলে পেনাং বন্দর বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল। মালয়ের অভ্যন্তর ভাগ হইতে পেনাং পর্য্যন্ত কয়েক মাইল জলপথের ব্যবধান আছে। সোজা সম্মুখের দিকে আক্রমণ করিয়া

জাপ সৈন্তেরা এই জলপথ অতিক্রম পূর্ব্বক পেনাং দখল করিতে পারে, কিম্বা পেনাংকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পশ্চাতে রাখিয়া তাহারা আরও দক্ষিণ অভিমুখে অভিযান করিতে পারে। পেনাং জাপানীদের দখলে গেলে মালয়ের অবস্থা যে অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কেবল তাহাই নহে, পেনাং একটি উৎকৃষ্ট বন্দর হওয়ায় জাপানীরা সিঙ্গাপুরের আগেই ভারত মহাসাগরের দিকে একটি ঘাঁটি পাইবে। সম্ভবতঃ ইতিপূর্ব্বে জাপানীরা শ্যাম উপসাগরে কিছু নৌ-আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কারণ, তাহারা যে ভাবে শ্যামে ও মালয়ে প্রবেশ করিয়াছে তাহাতে শ্যাম উপসাগরের উপর জাপানী নৌ-বহরের আধিপত্য ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। যদি কার্য্যতঃ ইহাই ঘটিয়া থাকে তাহা হইলে শ্যাম উপসাগর দিয়া আরও প্রচুর সৈন্য ও অস্ত্র এবং বিমানবহর পেনাংয়ে আমদানী করিয়া তাহারা একদিকে সিঙ্গাপুর এবং অন্যদিকে ভারত মহাসাগরের কিছু দূর পর্য্যন্ত আক্রমণ চালাইতে পারে। এমন কি, তাহারা পেনাং হইতে সুমাত্রা দ্বীপের উপর অভিযান চালাইবারও সুবিধা পাইতে পারে। কারণ পেনাং হইতে সুমাত্রার (উত্তরাংশ) দূরত্ব বিমানপথে দুইশত মাইলের বেশী হইবে না। জাপানের আশু লক্ষ্য হইতেছে সিঙ্গাপুরকে অন্যান্য সমস্ত ঘাঁটি হইতে বিচ্ছিন্ন ও বেষ্টন করিয়া ঘায়েল করা। এজন্য তাহারা প্রায় একই সময়ে হংকং, ফিলিপাইন, বোর্ণিও ও মালয় উপদ্বীপ আক্রমণ করিয়াছে। ইন্দোচীন ও শ্যাম ইতিপূর্ব্বেই তাহাদের কবলে গিয়াছে। এক্ষণে দক্ষিণ পার্শ্বে বোর্ণিও ও বাম পার্শ্বে মালয়ের উপর চাপ দিয়া এবং বোর্ণিও ও মালয় হইতে সুমাত্রার উপর আক্রমণ করিয়া সিঙ্গাপুরকে ঘিরিতে চাহিতেছে। যদি এই বেষ্টননীতি সফল হয়, তাহা হইলে নিঃসন্দেহে সিঙ্গাপুরের অবস্থা উদ্বেগজনক হইবে।

হংকংয়ের সংবাদ আদৌ আশাপ্রদ নহে। কয়েকদিন ধরিয়া সেখানে

প্রচণ্ড সংগ্রাম ও গোলাবর্ষণের পর জাপানীরা হংকংয়ে প্রচুর সৈন্য নামাইয়াছে। 'ডোমেই এজেন্সি'র সংবাদে প্রকাশ, জাপ সৈন্যগণ হংকংয়ের বৃটিশ আত্মরক্ষাবাহিনীর উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। ১২ ঘণ্টাকাল অবিরাম গোলাবর্ষণের পর কতকগুলি জাপ সৈন্য বোটে করিয়া প্রতিপক্ষের অজ্ঞাতসারে কৌলুন ও হংকংয়ের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী অতিক্রম করে। তাহারা বোটগুলি হইতে সমুদ্র তীরে লাফাইয়া পড়ে। বৃটিশ সৈন্যগণ প্রবলভাবে বাধা দেয় এবং ২০ মিনিটকাল হাতাহাতি যুদ্ধের পর কয়েকটি ঘাঁটি দখল করে এবং সঙ্কেতে জানায় যে, অবতরণকার্য্য সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। এইভাবে সৈন্য অবতারণ অত্যন্ত সঙ্কটের সূচনা করিতেছে। কারণ তীরভূমির আত্মরক্ষার ব্যবস্থা দুর্ব্বল না হইলে বা ভাঙ্গিয়া না পড়িলে জাহাজ বা বিমানযোগে অথবা নৌকাযোগে সৈন্য অবতরণ করান যায় না। জাপানীরা যখন প্রচুর সৈন্য নামাইতে সমর্থ হইয়াছে তখন হংকংয়ের নৌদুর্গ ও নৌঘাঁটি কতক্ষণ আত্মরক্ষা করিতে পারিবে ইহাই বিবেচনার প্রশ্ন। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার নৌবিশারদগণ সিঙ্গাপুরের ভাগ্যকে সর্ব্বদাই হংকংয়ের সহিত একত্র করিয়া দেখিয়াছেন। কারণ সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার পক্ষে হংকং অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটির মত। হংকং ও সিঙ্গাপুরের নৌ-যোগাযোগ অব্যাহত থাকিলে জাপানের পক্ষে অগ্রসর হইয়া আসা কঠিন। কিন্তু হংকংয়ের পতন হইলে নৌ-যুদ্ধের খাস এলাকা সিঙ্গাপুরের চারিদিকেই সীমাবদ্ধ হইবে। অপর দিকে পশ্চাৎ হইতে মালয় দিয়া জাপানীরা অগ্রসর হইতেছে। পেনাংয়ের অবস্থাও শোচনীয়। যদিও ইহার কোন বিস্তৃত সংবাদ পাওয়া যাইতেছে না, তথাপি উহা যে শীঘ্রই পরিত্যক্ত হইবে, তাহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। *

* প্রকৃতপক্ষে ২০শে তারিখেই পেনাংয়ের পতন সংবাদ আসে। সাম্রাজ্য-বাহিনী এই ঘাঁটি ত্যাগ করিয়া পশ্চাতে হটিয়াছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

---

(৬)

'[illegible]ণ্ড ষ্ট্রাটিজি'র সন্ধানে

২৪শে ডিসেম্বর '৪১।

'To plan a Grand Strategy'—এক জমকালো রণপরিকল্পনার সন্ধানে মিঃ চার্চ্চিল ও মিঃ রুজভেল্ট অকস্মাৎ ওয়াশিংটনে সম্মিলিত হইয়াছেন। মিঃ চার্চ্চিলের সঙ্গে গিয়াছেন লর্ড বীভারব্রুক এবং জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর প্রধান প্রধান সামরিক পুরুষগণ, লণ্ডনস্থিত মার্কিণ রাজদূত এবং ইংলণ্ডের আরও অনেক বাছাই করা বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি। স্বয়ং মিঃ চার্চ্চিল ও বৃটেনের বড় বড় পদস্থ ব্যক্তির এভাবে আমেরিকা গমন সমগ্র অবস্থার অত্যন্ত গুরুত্ব সূচনা করিতেছে। গত মহা-যুদ্ধের তুলনায় এবারের অবস্থা নানাদিক দিয়া অধিকতর উদ্বেগজনক; সেবার বৃটেনের প্রধান মন্ত্রীকে বার বার ব্যক্তিগতভাবে আমেরিকায়

ছুটিতে হয় নাই, কিন্তু এবার যাইতে হইতেছে। সেবার যুদ্ধ যে কায়দায় ও ঢংয়ে চলিয়াছিল এবার তাহা বাতিল হইয়া গিয়াছে। একমাত্র রাশিয়া ছাড়া প্রায় সম্পূর্ণ ইউরোপ হিটলারের কবলে এবং অন্যদিকে ইঙ্গ-মার্কিণ নৌশক্তির প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জাপান অতি অকস্মাৎ ব্যাপক আক্রমণ চালাইয়া প্রভূত সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে। সিঙ্গাপুর আজ বিপন্ন এবং এই সিঙ্গাপুর রক্ষা না পাইলে ব্রহ্মদেশ, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, নিউজিল্যাণ্ড, অষ্ট্রেলিয়া, ভারতবর্ষ ইত্যাদি গভীরতর সঙ্কটে পড়িবে এবং ওদিকে প্রশান্ত মহাসমুদ্রে মার্কিণ নৌবহর ও দ্বীপপুঞ্জ অকেজো হইয়া যাইবে। কি ভাবে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, জাপানী আক্রমণের অগ্রগতিকে ঠেকাইবার উপায় কি, ইহাই আজ মিত্রশক্তির সমস্যা এবং এই সমস্যা এত জরুরী যে, জাপানী যুদ্ধের দুই সপ্তাহের মধ্যেই মিঃ চার্চ্চিলকে ছুটিতে হইল আমেরিকায়।

বর্ত্তমান ইঙ্গ-মার্কিণ সংগ্রামে জাপানের প্রথম রণনৈতিক লক্ষ্য হইতেছে বৃটিশ নৌবহর ও মার্কিণ নৌবহরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো। অর্থাৎ এই দুই নৌ-বহর যেন কোন কেন্দ্রে সম্মিলিত হইতে কিম্বা পরস্পরের নিরাপদ ঘাঁটি হইতে সংযোগ স্থাপন করিয়া জাপানকে বাধা দিতে না পারে। এই জন্য জাপানের দ্বিতীয় লক্ষ্য হইতেছে ইঙ্গ-মার্কিণ-ওলন্দাজের নৌ ও বিমান ঘাঁটিগুলি, যথা হাওয়াই, ওয়েক্, গুয়াম্, ফিলিপাইন, হংকং, বোর্ণিও, মালয়, সুমাত্রা ও শেষ পর্য্যন্ত সিঙ্গাপুর দখল করা এবং এই সিঙ্গাপুর দখলের জন্য জাপানীদের তৃতীয় লক্ষ্য হইতেছে সিঙ্গাপুরকে দুই পার্শ্ব (flank) ও সম্মুখভাগের (front) ঘাঁটি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নৌ, বিমান ও স্থলপথের সাহায্যে ঘিরিয়া ধরা ও এই ভাবে ঘায়েল করা। এই রণনীতি কাজে খাটাইতে গিয়াই জাপান নৌবহর, বিমানবহর ও স্থল-বাহিনীকে একটা সুনির্দ্দিষ্ট পদ্ধতিতে গড়িয়া তুলিয়া এবং সমস্ত আয়োজন

পূর্ব্বাহ্নে চতুরের মত পাকা করিয়া অতি অকস্মাৎ ব্যাপক ও প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে। যুদ্ধের দুই সপ্তাহের মধ্যেই সাংহাই, গুয়াম্, মালয়ের উত্তরাঞ্চল ও ব্রহ্মের দক্ষিণপ্রান্ত দখল হইয়াছে, হংকংয়ে তাহারা প্রবেশ করিয়াছে, ফিলিপাইনে প্রচুর জাহাজ, সৈন্য ও বিমানযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালানো হইয়াছে; বোর্ণিও, হাওয়াই ও ওয়েক্ আক্রান্ত হইয়াছে এবং এই সমস্ত দ্বীপের প্রত্যেকটিই আজ বিপন্ন। যদি শীঘ্রই এই স্থানগুলির পতন ঘটে, তাহা হইলে সিঙ্গাপুর রক্ষা পাইবে কি মন্ত্রে, ইহাই আজ মিত্রশক্তির সমরনীতিবিদদের নিকট দুশ্চিন্তার বিষয় হইয়াছে। বৃটেনের নৌবহর যে ভাবে ঘায়েল হইয়াছে এবং মার্কিণ দ্বীপসমূহ ও পার্ল হারবারের জাহাজগুলি যে ভাবে নষ্ট হইয়াছে, তাহাতে প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে মার্কিণ নৌবহর ও বিমানবহর ৭।৮ হাজার মাইল বিস্তৃত প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে অগ্রসর হইয়া আসিবে কি ভাবে? প্রশান্ত মহাসমুদ্রের এই দূরত্বের পাল্লা বর্ত্তমান যুদ্ধের রণনীতির উপর ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ঘটাইবে। অথচ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, বৃটেন, আমেরিকা বা রাশিয়া একক ও পৃথকভাবে জাপানের তুলনায় আদৌ হীন নহে, বরং বহু দিক দিয়া জাপানের চেয়ে অনেক বেশী শক্তি ইহারা রাখে। কিন্তু প্রত্যেকেই আজ বিচিত্র সঙ্কটে বিব্রত। দুই বৎসরের যুদ্ধে বৃটেনের নৌবহর ও বিমানবহর এবং ট্যাঙ্ক প্রচুর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে, জার্ম্মাণীর উৎপাতে মিশর দেশ পর্য্যন্ত রণক্ষেত্রের বিস্তার হইয়াছে। আমেরিকা একদিকে অতলান্তিক এবং আর একদিকে প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ব্যবধানে—হাজার হাজার মাইলের তফাৎ। দুই মহাসাগরের উপযোগী নৌবহর তাহার রহিয়াছে, কিন্তু এক মহাসমুদ্রে জার্ম্মাণীর নৌ-যুদ্ধকে এড়াইয়া বৃটেনকে সাহায্য দানের প্রশ্ন এবং আর এক মহাসমুদ্রে জাপানী আক্রমণে বিপন্ন বিভিন্ন দ্বীপের ঘাঁটিগুলিকে রক্ষা করিয়া অগ্রসর হইবার প্রশ্ন। অপর

পক্ষে রাশিয়া জার্ম্মাণীর সহিত সংগ্রামে বিব্রত এবং চীন ৪।৫ বৎসর ধরিয়া সংগ্রামের ফলে সমস্ত সহর ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর হইতে বঞ্চিত। ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের আপন গৃহ অর্থাৎ হল্যাণ্ড জার্ম্মাণীর অধিকারে। সুতরাং পূর্ব্বভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের শক্তি কতটুকু তাহা বুঝিবার মত। 'এ-বি-সি-ডি' শক্তিসমূহ যখন এই বিচিত্র অবস্থায় পড়িয়াছেন, তখন জাপান সৈন্যবলে এবং অস্ত্র ও যন্ত্রবলে অধিকতর বলীয়ান হইয়া যুদ্ধ চালাইতেছে।

ওয়াশিংটনে যে সম্মেলন বসিয়াছে, তাহাতে এই সমস্ত জটিল প্রশ্ন উত্থিত হইবে। কি ভাবে বিশাল সমুদ্রের দূরত্বের ব্যবধান ঘুচানো যায়—বৃটেন, আমেরিকা, রাশিয়া ও চীনের রণনীতি, অর্থনীতি ও রাজনীতিকে কি ভাবে একটি কেন্দ্রে সংহত করা যায়, কি ভাবেই বা সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের উপযোগী করিয়া সমস্ত দেশের শক্তিকে সংগঠিত করা যায়, ইহার বিচার চলিবে ওয়াশিংটনে। যুদ্ধ চলিতেছে সমস্ত পৃথিবীতে, কিন্তু বিচ্ছিন্ন ভাবে। এই বিচ্ছিন্ন শক্তিসমূহের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করাই চার্চ্চিল-রুজভেল্টের লক্ষ্য। বর্ত্তমানে এই চারিটি দেশের রাজধানীতেই পরস্পরের মিলিটারী মিশন বা সামরিক প্রতিনিধিমণ্ডলী রহিয়াছেন। তাঁহারা সেই দেশের হাই-কমাণ্ডের সঙ্গে যোগসূত্র রাখিয়াছেন। কিন্তু এই যোগসূত্র চলিতেছে সাধারণতঃ পরস্পরের সংবাদ আদান প্রদান ও সরবরাহ ব্যবস্থার সম্পর্কে। অর্থাৎ কোন রণনীতি ও যুদ্ধের নেতৃত্ব ও পরিচালন লইয়া নহে। কিন্তু জাপান ও জার্ম্মাণীকে সম্পূর্ণরূপে বাধা দিতে হইলে এই গদাই-লস্করি চালের যুদ্ধে চলিবে না, পরস্পরের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া এই সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধে জয়লাভ করা যাইবে না। সুতরাং দরকার কোনও একটা **Supreme War Council** বা সর্ব্বোচ্চ সমর পরিষদ কিম্বা

সম্মিলিত সেনানীমণ্ডল বা Joint executive staffs কিম্বা ঐক্যবদ্ধ সামরিক নেতৃত্ব বা Unified command—এই ধরণের কোন একটা ব্যবস্থার। সেবারের যুদ্ধ পৃথিবীতে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে, কিন্তু এবারের সংগ্রাম পৃথিবীর সর্ব্বত্র মিত্রশক্তির বিরুদ্ধে। সেবার Allied command বা সম্মিলিত সামরিক নেতৃত্ব প্রধানতঃ গড়িয়া উঠিয়াছিল প্যারিসে—ইঙ্গ-ফরাসী সমর নেতাদের মিলনে। ইহার সঙ্গে পরে আমেরিকা যোগ দিয়াছিল। কিন্তু অবস্থা এবারের মত এত জটিল ও গুরুতর ছিল না। তথাপি বিভিন্ন শক্তির সমর নেতাদের সম্মিলিত নেতৃত্বে অনেক সময় বিভ্রাট দেখা দিয়াছিল। প্রত্যেক সেনাপতি ও রাষ্ট্রনেতাই স্ব স্ব দেশের স্বার্থ আগে দেখিয়া থাকেন এবং প্রত্যেকেই অপরের অপেক্ষা বিজ্ঞ ও ধুরন্ধর বলিয়া বিশ্বাস করেন। ফলে সেনাপতিদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয় এবং রাষ্ট্রনেতাগণও স্ব স্ব কূটনীতির চাপে পড়েন। ইহার ফল রণক্ষেত্রের উপর ভালো হয় না, বরং যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে বিঘ্ন দেখা দেয়। যেমন, তর্কের খাতিরে বলা যাইতে পারে, আমেরিকা হয়তো ফিলিপাইন ও গুয়ামের উপর বেশী জোর দিবেন, বৃটেন হয়তো সিঙ্গাপুর ও হংকংয়ের উপর গুরুত্ব দিবেন এবং চীন হয়তো চীন-ব্রহ্ম রাস্তা ও ইউনানের উপর জোর দিবেন এবং রাশিয়া হয়তো ব্লাডিভোষ্টক বন্দর ও মাঞ্চুকু-সোভিয়েট সীমানার গুরুত্ব দেখাইবেন। ইহাতো গেল রণনীতির দিক হইতে স্থানের গুরুত্ব। ইহা ছাড়া অস্ত্রশস্ত্র, মাল-মশলা, সৈন্য, সরবরাহ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অজস্র রকমের প্রশ্ন আছে। সুতরাং ব্যাপারটা আদৌ সহজ নহে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১)

হংকংয়ের পতন

২৭শে ডিসেম্বর '৪১।

এক সপ্তাহকাল (১৮ই হইতে ২৫শে ডিসেম্বর) অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকিয়া হংকং আত্মসমর্পণে বাধ্য হইয়াছে। জাপানীরা যে ভাবে আক্রমণ করিয়াছিল এবং যে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য তাহারা জাহাজযোগে নামাইতে পারিয়াছিল তাহাতেই বুঝা গিয়াছিল যে, হংকংয়ের আয়ু শেষ হইয়া আসিয়াছে। কানাডীয়, বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যেরা সংখ্যায় ও অস্ত্রসজ্জায় এত দুর্ব্বল ছিল যে, তাহারা যে এই কয়দিন আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহাই যথেষ্ট। তাহারা বীরত্বের সহিত সংগ্রাম করিয়াছে সন্দেহ নাই এবং আত্মরক্ষাকারী সৈন্যেরা প্রচুর ক্ষতি স্বীকার করিয়াও শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়াছিল, কিন্তু জাপানীদের প্রচণ্ড আক্রমণে, বিশেষতঃ সংখ্যার ও

অস্ত্রশস্ত্রে তাহারা অত্যধিক শক্তিমান হওয়ায় হংকংয়ের অবরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইল না। হংকং দ্বীপ এত ক্ষুদ্র যে, এখানে কোন বড় রকমের আক্রমণ হইলে আত্মরক্ষাকারীদের বশ্যতা স্বীকার ছাড়া উপায় ছিল না। যে ভাবে উহাকে অবরোধ করা হইয়াছিল এবং কৌলুনের চীনা এলাকার দিক হইতে যে ভাবে প্রচণ্ড কামান দাগানো হইয়াছিল, তাহাতে হংকং দুর্গের অনিবার্য্য বিপদ ছিল। জাপানীরা তিন বার উহার আত্মসমর্পণ দাবী করে এবং তিনবারই উহা প্রত্যাখ্যাত হয়। কিন্তু গুরুতর বিপদ দেখা দিল পানীয় জলের প্রশ্নে। হংকংয়ের জল সরবরাহ নির্ভর করে পাহাড়ের উপর স্থাপিত জলাধারগুলির উপর। শত্রু বিমানের আক্রমণ হইতে জলাধারগুলি রক্ষা করিবার মত বিমানবাহিনী ছিল না। সুতরাং প্রধান জলাধারগুলি শীঘ্রই জাপানীদের হস্তগত হয়। গোলাবর্ষণের ফলে জলের পাইপসমূহ ধ্বংস হইয়া যায়। পূর্ত্ত বিভাগ জল সরবরাহের ব্যবস্থা করিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু শত্রুসৈন্য পুনঃ পুনঃ পাইপগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে। এই সমস্ত অপরিসীম বাধা বিপত্তির মধ্যে গবর্ণর স্যার মার্ক ইয়ং সামরিক নেতা ও সৈন্যদের সহ-যোগীতায় শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ়তার সহিত আত্মরক্ষার লড়াই চালাইয়াছিলেন। কিন্তু নৌ ও স্থল বাহিনীর অধিনায়কগণ তাঁহাকে জানান যে, আর প্রতিরোধ চালানো সম্ভব নয়। অতঃপর কৌলুনের একটি হোটেলে বসিয়া জাপ সামরিক ও নৌ কর্ত্তৃপক্ষের সহিত আলাপ আলোচনার পর স্যার মার্ক ইয়ং বিনা সর্ত্তে আত্মসমর্পণ করেন।

ভারত মহাসাগরে পেনাং ও দক্ষিণ চীন সমুদ্রে হংকং জাপানীদের দখলে গেল। এই দুই নৌঘাঁটিই দুই সমুদ্রের পক্ষে প্রয়োজনীয়। কিন্তু পেনাংয়ের চেয়ে হংকংয়ের মূল্য অনেক বেশী। হংকং বন্দর ও নৌঘাঁটি হিসাবে উৎকৃষ্টতর, খাস জাপানের দিক হইতে নিকটতর

এবং সিঙ্গাপুর রক্ষার পক্ষে অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। হংকং শত্রুর হাতে যাওয়ায় সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ নৌ-বহরের অগ্রসর হইয়া আসা কঠিন। হংকং দ্বীপ ও চীনের তীরভূমি প্রায় পরস্পরের সহিত জোড়া লাগানো, মাঝখানে একটি সঙ্কীর্ণ জলপথ রহিয়াছে, ইহা ক্যান্টন নদীর প্রবেশ পথে অবস্থিত। এই দ্বীপ মাত্র ১১ মাইল লম্বা এবং ২ হইতে ৫ মাইল চওড়া। ইহারই উত্তর প্রান্তে কৌলুন উপনিবেশ। দ্বীপটি আগে চীনাদের ছিল, ১৮৩৯ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা ছিল চীনা জেলেদের একটা আড্ডা। এই বৎসর ইংরাজ ব্যবসায়ীরা ক্যান্টন হইতে হংকং দ্বীপে চলিয়া আসিতে বাধ্য হয়। ১৮৩৯ সালের জুলাই মাসে চীনাদের সঙ্গে বৃটিশ লস্করদের ঝগড়া বাধে এবং একজন চীনা নিহত হয়। ফলে, চীনের সহিত বৃটেনের যুদ্ধ বাধে এবং বৃটিশবাহিনী হংকংকে ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহার করে ও দখল করে। পরে সন্ধিসূত্রে ইহা বৃটেনেরই অধিকারভুক্ত হয়। এই দ্বীপের উত্তরাংশে অতি সঙ্কীর্ণ ভূমিখণ্ডে, যে ভূমির একদিকে পাহাড়

হংকংয়ের মানচিত্র

ও অন্যদিকে সমুদ্র, সেখানে ভিক্টোরিয়া সহর গড়িয়া উঠে। এই সহরটি পশ্চিম হইতে পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মাত্র ৪ মাইল বিস্তৃত। ভিক্টোরিয়া গিরিশৃঙ্গের উপর অনেক চমৎকার বাসগৃহ নির্ম্মিত হইয়াছিল এবং পাহাড়ের উপর হইতে হংকং বন্দরের দৃশ্য উপভোগ করিবার মত।

হংকংয়ের বর্ত্তমান যুদ্ধের শেষের দিকে এই গিরিশৃঙ্গ হইতেই বৃটিশ সৈন্যেরা জাপানীদিগকে বাধা দিয়াছিল এবং আত্মরক্ষার পক্ষে এই দিকটা সুবিধাজনক ছিল। পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয় বন্দরগুলির মধ্যে হংকং অন্যতম, চীনের সহিত প্রচুর বাণিজ্য এই পথ ধরিয়া চলিত। কিন্তু জাপানীরা ইতিপূর্ব্বেই চীন যুদ্ধের সময় ক্যান্টন-হংকং রেলপথ বিচ্ছিন্ন ও চীনের সহিত বাণিজ্যিক যোগাযোগ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। তথাপি জাপানের বিরুদ্ধে নৌ-সংগ্রামে হংকংয়ের যথেষ্ট গুরুত্ব ছিল। অনেক দিন ধরিয়া জাপানী রণনীতিবিদ্‌গণ একটা প্রশ্ন চিন্তা করিয়া আসিতেছিলেন—বৃটেনকে কখন আক্রমণ করিতে হইবে? তাহারা এমন একটি মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন, যখন বৃটেনের নৌ-বহরের অধিকাংশই থাকিবে দূরবর্ত্তী ইউরোপীয় সমুদ্রে এবং আমেরিকা থাকিবে ৫।৬ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে। কার্য্যতঃ জাপান ঠিক সেই সন্ধিক্ষণেই আক্রমণ করিয়াছে। জাপানী রণনীতিবিদ্‌গণের এই ধারণা ছিল যে, সিঙ্গাপুরস্থিত বৃটিশ নৌবহর হংকং ও ফরমোজার দিকে অগ্রসর হইয়া জাপানী নৌ-বহরকে প্রকাশ্য সংগ্রামে আহ্বান করিবে? সিঙ্গাপুর হইতে হংকংয়ের দূরত্ব ১৪৪০ মাইল এবং ফরমোজা ১৬২৫ মাইল। সুতরাং কোন বৃটিশ নৌ-বহর যদি সিঙ্গাপুর হইতে ১৫ নট গতিতে রওনা হয়, তবে হংকংয়ের রণক্ষেত্রে পৌছিতে ৪ দিন সময় লাগিবে। এই চারি দিন সময়ের মধ্যেই হংকং দখল করিতে হইবে, জাপানীদের ইহাই ছিল বর্ত্তমান মহাযুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী ধারণা। কিন্তু এক্ষণে দেখা গেল সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ নৌ-বহর দক্ষিণ চীন সমুদ্রে যাত্রার আগেই 'প্রিন্স অব্ ওয়েলস্' এবং 'রিপালস্'—এই দুইটি অতিকায় যুদ্ধ-জাহাজ ডুবিয়া গেল এবং নৌ-পথে কোন প্রকার বাধা না পাইয়া হংকং দখল হইয়া গেল! ১৯২৩ সালে ইংলণ্ডের 'মর্ণিং পোষ্ট' পত্রিকায় সুদূর প্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করিয়া জনৈক বিশেষজ্ঞ

মন্তব্য করিয়াছিলেন—Hongkong was only twenty hours from the southern end of Formosa. If Japan elected to take that place and the Philippines at the same time, neither England nor America would have any naval base in the Far East and both would be powerless. 'ফরমোজার দক্ষিণ প্রান্ত হইতে জাহাজযোগে হংকংয়ে যাইতে মাত্র ২০ ঘণ্টা সময় লাগে। যদি জাপান হংকং ও ফিলিপাইন উভয় দ্বীপকেই এক সঙ্গে অধিকারের ইচ্ছা করে, তবে সুদূর প্রাচ্যে ইংলণ্ড বা আমেরিকা কাহারও আর নৌ-ঘাঁটি থাকিবে না এবং উভয়েই শক্তিহীন হইয়া পড়িবে।' জাপানী আক্রমণের গতি এবং ইঙ্গ-মার্কিণ নৌ-শক্তির অবস্থা বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে যে, সমগ্র অবস্থা ক্রমশঃ গভীর সঙ্কটের দিকে যাইতেছে। জনৈক জাপানী নৌ-বিশেষজ্ঞ হিসাব করিয়াছিলেন যে, ইউরোপে যদি বৃটেনের কোন প্রকার বাধাও না থাকে (অর্থাৎ যদি শান্তি থাকে), তাহা হইলে মাল্টা হইতে সুয়েজ খাল হইয়া কোন বৃটিশ নৌ-বহরের পক্ষে সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতে (১৫ নট গতিতে) অন্ততঃ ২০ দিন সময় লাগিবে এবং উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরিয়া আসিতে অন্ততঃ ৩৭ দিন সময় লাগিবে। এই দীর্ঘ সময়ের সুযোগে জাপান হংকং দখল ও সিঙ্গাপুর অবরোধ করিতে পারিবে। কিন্তু এই দীর্ঘ সময়ের কোন প্রয়োজন হইল না। ওয়েক্, গুয়াম্, হংকং, পেনাং, ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট এবং উত্তর মালয় জাপানীরা দখল করিয়াছে। নৌ-ঘাঁটি হাত ছাড়া হইয়া গেলে নৌ-যুদ্ধ দুঃসাধ্য হইয়া পড়ে এবং যদি ইহার সঙ্গে বিমান বহরের অভাব দেখা দেয়, তবে অবস্থা আরও মারাত্মক হইবে। জাপানীরা জানে যে, One of the first conditions of victory in a modern sea-fight is to gain command of the air. অর্থাৎ আধুনিক নৌ-সংগ্রামে

জয়লাভ করিতে হইলে উহার প্রথম সর্ত্তই হইতেছে আকাশের উপর আধিপত্য লাভ। আকাশের উপর আধিপত্য করিতে হইলে উপযুক্ত বিমানবহরের দরকার। আবার উপযুক্ত বিমানবহরের সহযোগীতা ছাড়া সমুদ্রপথে নৌবহরের যুদ্ধ সফল হইতে পারে না। এবং সমুদ্রপথে সাফল্য লাভ না হইলে স্থলপথের অভিযানও দানা বাঁধিতে পারে না। সুতরাং বিমান শক্তির একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু হংকং, মালয় বা ফিলিপাইনের যুদ্ধে বৃটেন বা আমেরিকার বিমান শক্তির শ্রেষ্ঠতা কোথায়? হংকংয়ে বৃটিশপক্ষ বীরত্বের সহিত লড়িয়াছে বটে, কিন্তু একমাত্র বীরত্বই যুদ্ধের শেষ কথা নহে। যুদ্ধের মুখ্য উদ্দেশ্য জয়লাভ এবং সেই হিসাবে জাপানীরা লাভবান।

তৃতীয় অধ্যায়

মালয়ের পতন

(১)

'সামনে আরও দুর্দ্দিন'

২৮শে ডিসেম্বর '৪১।

১৯৪০ সালের যুদ্ধে বারম্বার পরাজয়ের পর মিঃ চার্চ্চিল এই ভরসা দিয়াছিলেন যে, ১৯৪১ সালে তাঁহাদের আয়োজন-পর্ব্ব শেষ হইবে, ১৯৪২ সালে তাঁহারা পাল্টা আক্রমণের দ্বারা জার্ম্মাণীকে কাবু করিবেন। এক্ষণে ওয়াশিংটনে মার্কিণ সিনেট সভায় এক উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়া মিঃ চার্চ্চিল বলিতেছেন যে, ১৯৪২ সালও আমাদের নিকট দুর্ব্বৎসর হইবে, তবে, ১৯৪৩ সালে আমরা পাল্টা আক্রমণ করিতে পারিব। জাপানের আক্রমণের জন্যই মিঃ চার্চ্চিল মিত্রপক্ষের সময় এক বৎসর পিছাইয়া দিলেন, সন্দেহ নাই। আগে শত্রু ছিল একা জার্ম্মাণী, এক্ষণে জাপানও শত্রু এবং জার্ম্মাণী ও জাপানকে কেন্দ্র করিয়া আরও

অনেক শত্রু দল বাধিয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল নিজেই স্পষ্টভাবে স্বীকার করিয়াছেন যে, জাপানের এই অতর্কিত আক্রমণের জন্য গুরুতর বিপদের সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ আমেরিকা বা বৃটেন, কেহই এই ধরণের আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিল না। মিঃ চার্চ্চিলের মতে এশিয়া ও ইউরোপের সর্ব্বাপেক্ষা সামরিক বলসম্পন্ন (**the greatest** military powėr) রাষ্ট্র জাপান ও জার্ম্মাণী ইঙ্গ-মাকিণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। তাহাদের আয়োজন পাকা ও নিখুঁত, তাহাবা দুর্দ্ধর্ষ ও নিষ্ঠুর যোদ্ধা। সুতরাং ইঙ্গ-মাকিণ রাষ্ট্রদ্বয়ের অদৃষ্টে কিছুকাল ধরিয়া লাঞ্ছনা ঘটিবেই। আমেরিকা ও বৃটেন যে শত্রুদ্বয়ের সম্মুখীন হইয়াছে, তাহাদের শক্তি কত দুর্দ্ধর্ষ মিঃ চার্চ্চিল তাহা গোপন করেন নাই। তাঁহার নিজের ভাষা এখানে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে।

'The forces ranged against us are enormous. They are bitter, they are ruthless. The wicked men and their factions, who have launched their peoples on the path of war and conquest know that they will be called to terrible account if they cannot beat down by force or arms the people they have assailed. They will stick at nothing. They have a vast accumulation of war weapons of all kinds. They have highly trained disciplined armies, navies and air-services. They had plans and designs which have long been tried and matured. They will stop at nothing that violence or treachery can suggest. It is quite true that on our side our own resources in manpower and materials are as yet mobilised and developed and we both have much to learn in the cruel art of war. We have, therefore, without doubt a time of tribulation

before us. In the same time some ground will be lost which will be hard and costly to regain.'

ইহার সহজ মর্ম্ম এই যে, প্রচণ্ড ও ব্যাপক শক্তি আমাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হইয়াছে। এই শক্তি নৃশংস ও নির্ম্মম। এই সমস্ত দুরন্ত লোক ও তাহাদের দলবল জানে যে, যদি তাহারা পাশবিক শক্তি ও অস্ত্রের দ্বারা বিপক্ষ দলকে পরাজিত করিতে না পারে; তবে তাহাদিগকে ভয়াবহ পরিণামের সম্মুখীন হইতে হইবে, এই জন্য কোন প্রকার কার্য্যেই তাহারা ক্ষান্ত থাকিবে না। সর্ব্বপ্রকার সামরিক অস্ত্রের বিশাল আয়োজন তাহারা করিয়া রাখিয়াছে ; তাহাদের স্থল সৈন্য, নৌ-সৈন্য ও বিমান সৈন্য অত্যন্ত সুশিক্ষিত ও নিয়মশৃঙ্খলায় উন্নত। দীর্ঘ কাল ধরিয়া তাহারা রণপরিকল্পণা স্থির করিয়াছে এবং এই পরিকল্পনা পরীক্ষার দ্বারা তাহারা পাকা করিয়া লইয়াছে। বৃটেন ও আমেরিকা যে অস্ত্রবল ও লোকবল এতদিন ধরিয়া সঞ্চয় করিয়াছে, তাহা এখনও যথেষ্ট নহে এবং এই নিষ্ঠুর রণনীতি সম্পর্কে ইঙ্গ-মার্কিণ উভয় রাষ্ট্রেরই এখনও অনেক কিছু শিখিবার আছে। সুতরাং আমাদের সামনে যে দুর্দ্দিন রহিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। ইতিমধ্যে কতকগুলি ভূখণ্ড আমাদের হাতছাড়া হইবে এবং সেগুলি পুনরায় উদ্ধার করিতেও আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি ও দুর্ভোগ ভুগিতে হইবে।

স্বয়ং মিঃ চার্চ্চিল শত্রুর রণশক্তি সম্পর্কে যে চিত্র আঁকিয়াছেন, উহার উপর রং ফলানো অনাবশ্যক। এই প্রকার দুর্দ্ধর্ষ শক্তিকে রোধ করিতে হইলে সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের মূলমন্ত্র শিখিতে হইবে। কি ভাবে রাষ্ট্রের সমগ্র জনশক্তি, অর্থশক্তি, বিজ্ঞানশক্তি, শ্রমশক্তি এবং কাঁচামাল ও রাষ্ট্রনীতির শক্তি যুদ্ধ জয়ের উদ্দেশ্যে প্রয়োগ করা যায় সেই বিরাট পরিকল্পনা স্থির ও অনুসরণ করিতে হইবে। মিঃ চার্চ্চিল বলিতেছেন যে, বিগত মহাযুদ্ধের পর ২০ বৎসর ধরিয়া তাঁহারা যে শান্তির বাণী

ও শান্তির নীতি অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন, উহারই জন্ত তাঁহারা আজ রণক্ষেত্রে পারিয়া উঠিতেছেন না। মিঃ চার্চ্চিলের এই মতবাদের মধ্যে সমগ্র সত্য প্রকাশ পায় নাই। কারণ ইঙ্গ-মার্কিণ ও ফরাসী রাষ্ট্রনীতি যে শান্তির বাণী প্রচার করিতেছিল, সেই শান্তির মূলে ছিল এই যে, ইংরাজের ও ফরাসীর বিশাল সম্রাজ্য ও আমেরিকার বিশাল ব্যবসায় ঠিক একই ধারায় চলিবে। অর্থাৎ ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার বনিয়াদ উনবিংশ শতাব্দী হইতে বিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্য্যন্ত একই ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া থাকিবে। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে এই সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য-সুখ স্বপ্নের নিদ্রাভঙ্গ হওয়া উচিত ছিল। তারপর সোভিয়েট বিপ্লব ও সোভিয়েট রাষ্ট্রের অগ্রগতির দ্বারাও এই ভুলের সংশোধন হওয়া উচিত ছিল। শান্তির মূল্য তখনই যখন শান্তি বা peace সমগ্র মানুষের সর্ব্বপ্রকার রাষ্ট্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও নৈতিক অধিকারকে স্বীকার করে। কিন্তু বৃটেন, আমেরিকা বা ফ্রান্স তাহা করেন নাই। ফরাসী সাম্রাজ্য ও বৃটিশ সাম্রাজ্য ইহার বড় দৃষ্টান্ত। ফ্রান্স শোচনীয়রূপে পরাজিত, তথাপি ফরাসী উপনিবেশের উপর দাবী ও লোভ তাহাদের যায় নাই। সাধারণ গৃহস্থ মৃত্যুমুখে পড়িয়াও যেমন কুমড়াগাছ ও লাউগাছ সম্পর্কে বাড়ীর লোকদিগকে সাবধান করিয়া যায়, এই সমস্ত পরাধীন রাজ্য ও উপনিবেশ সম্পর্কেও মালিকরূপী রাষ্ট্রকর্ত্তাদের সেই একই মনোভাব! এই মনোভাব লইয়া Total war বা সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধ চালানো যায় না। উহার পিছনে এমন একটা মতবাদ থাকা চাই, যে মতবাদ নূতন রাষ্ট্রধর্ম্মের মত—যাহা প্রত্যেকটি মানুষকে আত্মবিসর্জ্জনে উদ্দীপ্ত করিবে। সোভিয়েট রাশিয়া এই শক্তির উপর দণ্ডায়মান, এই জন্তই আজিকার পৃথিবীতে একমাত্র রাশিয়াই জার্ম্মাণীকে প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে। কিন্তু বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট কি তেমন আদর্শ

ও কর্ম্মপ্রণালী গ্রহণ করিতে পারিতেছেন? তাঁহারা ভারতবর্ষকে কি অবস্থায় রাখিয়াছেন? প্রাকৃতিক সম্পদে ও জনসংখ্যায় ভারতবর্ষ রাশিয়া ও আমেরিকার সমান, কিন্তু সেই ভারতবর্ষের অবস্থা কি? এখানকার যুদ্ধায়োজনের চেহারাটা কিরূপ? কয়টি এরোপ্লেন, ট্যাঙ্ক ও মোটরগাড়ী ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতেছে এবং মালয় ও হংকং হইতে কেন বার বার যুদ্ধাস্ত্রের অভাবের উপর জোর দিয়া সামরিক কর্তৃপক্ষ নিজেদের দুর্ভাগ্য গোপন করিতে চাহিতেছেন?

মিঃ চার্চ্চিল ১৯৪৩ সালের দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু গোটা ১৯৪২ সালে দুর্দ্ধর্ষ জাপান যে অবস্থার সৃষ্টি করিবে, উহার প্রতীকার কি ভাবে সম্ভব হইবে? প্রশান্ত মহাসাগর ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার বাকি দ্বীপ, উপদ্বীপ ও রাজ্যগুলি জাপান কর্ত্তৃক আক্রান্ত বা দখল হইলে জাপান কি আরও বেশী শক্তিশালী হইবে না? প্রশান্ত মহাসমুদ্রের ৮।১০ হাজার মাইল দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিবে কোন্ নৌবহর ও বিমানবহরের সাহায্যে? ফিলিপাইন হইতে ওয়েক্ দ্বীপ পর্য্যন্ত সমস্ত নৌঘাঁটি হাতছাড়া হইলে মার্কিণ নৌবহর অগ্রসর হইবে কিরূপে? নৌঘাঁটি ছাড়া নৌবহর কি দীর্ঘ মহড়ায় ঘুরিতে পারে? কয় হাজার এরোপ্লেন এবং আরও কত সংখ্যক জাহাজ তৈয়ারী করিতে পারিলে মহাসমুদ্রের এই বিশাল অভিযানে আমেরিকা বা বৃটেন বাহির হইতে পারিবে এবং উহার জন্য কত মাস সময় লাগিবে? আমেরিকা ও বৃটেনের নৌশক্তি ও বিমানশক্তি সম্মিলিত হইবে কোথায় এবং উভয়ের রণপরিকল্পনা কোন্ কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত হইবে, সামরিক নেতৃত্বেরই বা ঐক্য হইবে কি ভাবে? রণবিজ্ঞানের এই মূল প্রশ্নগুলির জবাব পাওয়া দরকার। চার্চ্চিল ও রুজভেল্টের সম্মিলিত পরিকল্পনা যদি এই প্রশ্নগুলির মীমাংসা করিতে পারে, তবেই আগামী দুর্দ্দিনে মিত্রপক্ষের জয়যাত্রা সম্ভব।

তৃতীয় অধ্যায়

(২)

'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটিজি'র আবিষ্কার ?

৫ই জানুয়ারী, '৪২।

বৃটেন ও আমেরিকার সেনাপতিমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ এবং মস্কো ও চুংকিংয়ের মধ্যে আলোচনার পর প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট ও মিঃ চার্চ্চিল তাঁহাদের বহু বিজ্ঞাপিত 'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটিজি' বা বিরাট রণ-পরিকল্পনার সন্ধান পাইয়াছেন। তাঁহাদের সম্মিলিত ঘোষণায় দেখা যাইতেছে যে, মিত্রশক্তির এই রণপরিকল্পনার প্রথম স্তর গড়িয়া উঠিয়াছে সামরিক নেতৃত্বের বণ্টন লইয়া এবং দ্বিতীয় স্তর গড়িয়া উঠিয়াছে ভারতবর্ষ সহ পৃথিবীর ২৬টি রাষ্ট্রের রোম-বার্লিন-টোকিওর বিরুদ্ধে প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরের দ্বারা। অর্থাৎ 'ষ্ট্রাটিজি'র প্রথমাংশ সামরিক এবং দ্বিতীয়াংশ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। বলা বাহুল্য

যে, সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে লড়িতে হইলে রণনীতিকে অর্থনীতি ও রাজনীতির পাকা বনিয়াদের উপর প্রতিষ্ঠা দিতে হইবে। এই প্রকার সুদৃঢ় ভিত্তি ছাড়া আধুনিক কালের সংগ্রাম অচল। এ জন্যই চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট ১লা জানুয়ারী তারিখ নূতন বর্ষের নূতন সঙ্কল্প ঘোষণা করিয়া পৃথিবীর ২৬টি রাষ্ট্রকে হিটলার-মুসোলিনী-টোজোর বিরুদ্ধে সম্মিলিত করিয়াছেন। ইহার সামরিক দিকটা বিশ্লেষণ করা যাউক।

যে বিরাট রণপরিকল্পনার কথা ঘোষিত হইয়াছে, তাহার প্রথমেই দেখিতেছি প্রাচ্য মহাদেশের রণাঙ্গনকে প্রধানতঃ দুইটি বিরাট রণক্ষেত্রে ভাগ করা হইয়াছে। প্রথমতঃ, দক্ষিণ-পূর্ব্ব (আমেরিকার দিক হইতে দক্ষিণ-পশ্চিম) প্রশান্ত মহাসাগর বা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং দ্বিতীয়তঃ, চীন মহাদেশ। দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসাগরের এলাকায় ধরা হইয়াছে ফিলিপাইন, মালয়, সিঙ্গাপুর, বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ, আর চীনের এলাকায় ধরা হইয়াছে খাস চীন, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশ। খুব সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশকেও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মধ্যে ফেলা হইয়াছে এবং ভারতবর্ষকে আলাদা করা হইয়াছে। জাপানী আক্রমণের পর ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশকে একত্রে জেনারেল ওয়াভেলের নেতৃত্বে আনা হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রহ্মদেশকে রণাঙ্গনের দিক হইতে আলাদা করিয়া কেবলমাত্র ভারতবর্ষের জন্য নূতন সৈনাপতি নিযুক্ত করা হইবে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিরাট রণাঙ্গনের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে খ্যাতনামা জেনারেল স্যার আর্চ্চিবল্ড ওয়াভেলের উপর। তিনি এই রণক্ষেত্রের জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর সর্ব্বোচ্চ অধিনায়ক বা **Supreme Commander** নিযুক্ত হইয়াছেন। জেনারেল ওয়াভেলের সহকারী হইবেন মার্কিণ বিমানবাহিনীর কর্ত্তা মেজর-জেনারেল জি এইচ ব্রেট এবং এই অঞ্চলের নৌ-শক্তির ভার পাইয়াছেন মার্কিণ

নৌ-সেনাপতি এডমিরাল টমাস সি হার্ট। বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল স্যার হেনরি পাওন্যাল—যিনি কিছুদিন আগে জেনারেল পপহ্যামের স্থলে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তিনি এক্ষণে জেনারেল ওয়াভেলের সেনানীমণ্ডলীর কর্ম্মাধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, মার্কিণ নৌ-শক্তি ও বিমানশক্তি জেনারেল ওয়াভেলের নেতৃত্বে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় সম্মিলিত হইল। ইহার কারণ তিন প্রকার—(১) ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, মালয়, সিঙ্গাপুর, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, বৃটিশ বোর্ণিও ইত্যাদি দেশগুলি একত্রে বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্ব্বপ্রধান অংশ। এই অংশ হাতছাড়া হইয়া গেলে ইতিহাসে বৃটিশ সাম্রাজ্যের কোন পাত্তা থাকিবে না এবং খাস বৃটেন দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত হইবে। অপর পক্ষে জাপান প্রচুর শক্তি লাভ করিয়া দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। সুতরাং বৃটেনের মাথার মণি রক্ষার দায়িত্ব বৃটিশ সেনাপতির হাতে থাকাই উচিত। (২) জাপানের বিরুদ্ধে এই সংগ্রামে সর্ব্বাধিক প্রয়োজন এরোপ্লেন ও যুদ্ধ-জাহাজের। কিন্তু বর্ত্তমানে নৌবহর ও বিমানবহর বৃটেনের যাহা আছে, তাহা পূর্ব্ব-এশিয়ায় সংগ্রাম চালাইবার পক্ষে আদৌ যথেষ্ট নহে। এইজন্য আমেরিকার উপর ভরসা রাখিতে হইতেছে এবং আমেরিকার বিমানবহর ও নৌবহর জেনারেল ওয়াভেলকে সাহায্য করিবে বিমান-সেনানী মেজর-জেনারেল ব্রেট ও নৌ-সেনানী এডমিরাল হার্টের মারফত। আমেরিকার যুদ্ধ ও স্বার্থ উভয়ই এই দুই সেনাপতির সহায়তায় অক্ষুণ্ণ থাকিবে। (৩) জাপানের বিরুদ্ধে ইঙ্গ-মার্কিণ সংগ্রাম ত্রিধারার যুদ্ধ (**war of three dimensions**) অনুসরণ করিবে। জল, স্থল ও আকাশের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতা ও সংযোগ প্রতিষ্ঠা করিয়া লড়িতে হইবে। জাপানী নৌ-বহর

প্রথম শ্রেণীর, সংখ্যার দিক দিয়া এই নৌ-বহর কিছু কম হইলেও (যুদ্ধের জন্য এই ঘাটতি ইতিমধ্যে পূরণ করা হইয়াছে কিনা কে জানে) ইহার গঠন-প্রণালী, অস্ত্রসজ্জা এবং রণপটুতা মার্কিণ নৌ-বহরের তুলনায় শ্রেষ্ঠ। জাপানের বিমানশক্তি সম্পর্কে সন্দেহ ছিল, কিন্তু যেভাবে জাপান বিমানবহরের সাহায্য লইয়াছে, তাহাতে মনে হয় যে, জাপান যথেষ্ট পরিমাণে এরোপ্লেন তৈয়ার ও. বিমান বাহিনী প্রস্তুত করিয়াছে এবং জাপানী স্থলসৈন্যের সাহস, একগুঁয়েমি ও পটুতা ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। সুতরাং জাপ সংগ্রামের এই ত্রিধারার শক্তিকে রোধ করিতে হইলে এমন একজন সেনাপতির উপরেই সর্ব্বোচ্চ ক্ষমতা থাকা উচিত, যিনি এই তিন প্রকারের যুদ্ধনীতিকে কেন্দ্রীভূত করিয়া জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে সংগ্রাম চালাইতে ওস্তাদ। সেই হিসাবে বৃটেন ও আমেরিকায় জেনারেল ওয়াভেল ছাড়া দক্ষতর সেনাপতির সন্ধান মিলে নাই। উত্তর আফ্রিকায় ইতালীয় জল, স্থল ও বিমান শক্তির বিরুদ্ধে জেনারেল ওয়াভেল প্রশংসনীয় নৈপুণ্যের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া প্রচুর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন। রণপরিকল্পনা বা ষ্ট্রাটিজির দিক হইতে জেনারেল ওয়াভেল খ্যাতিমান। রাশিয়ার যেমন টিমোশেঙ্কো, বৃটেনের তেমন ওয়াভেল। প্রকৃতপক্ষে রণপরিকল্পনাকে আশ্রয় করিয়াই রণকৌশল বা tactics দানা বাঁধিয়া উঠে। রণ-পরিকল্পনার উদ্দেশ্য জয়লাভ এবং এই জয়লাভকে কার্য্যক্ষেত্রে সফল করে রণকৌশল। উপযুক্ত মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করা, উপযুক্ত মুহূর্ত্তে আঘাত দেওয়া এবং দরকার মত সরিয়া যাওয়া—রণনীতির এইগুলি অন্ততর বৈশিষ্ট্য। রাশিয়ার রণক্ষেত্রে টিমোশেঙ্কো ইহার চমৎকার পরিচয় দিয়াছেন। উত্তর আফ্রিকায় জেনারেল ওয়াভেলও এই দিক দিয়া খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন।

ফ্রান্সের পতনের পর ১৯৪০ সালে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা অতি শোচনীয় হইয়াছিল। ইতালীয় সেনাপতি জেনারেল গ্রাৎসিয়ানী সেই সুযোগে মিশরের সীমানায় অগ্রসর হইয়াছিলেন। কিন্তু জেনারেল ওয়াভেল ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত অপেক্ষমান ছিলেন। যখন পাল্টা আক্রমণের মুহূর্ত্ত সন্নিকট বলিয়া তিনি বুঝিলেন, তখন তিনি গ্রাৎসিয়ানীকে আঘাত হানিলেন, গোটা লিবিয়ায় তিন লক্ষ ইতালীয় সৈন্যের শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িল। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায়ও এমন অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু সেই অবস্থা উত্তর আফ্রিকার চেয়ে অনেক বেশী উদ্বেগজনক। কারণ, জাপান অনেক বেশী শক্তিশালী।

ইংলণ্ডের কোন কোন মহলে এই উপলক্ষে ১৯১৪-১৮ সালের মিত্রশক্তির সম্মিলিত সৈনাপত্যের কথা স্মরণ করা হইয়াছে এবং মার্শাল ফসের সহিত জেনারেল ওয়াভেলের দায়িত্বের তুলনা করা হইয়াছে। একমাত্র ভাবী ইতিহাসই এই তুলনার সত্যমিথ্যা নির্ণয় করিতে পারে। তবে, আপাততঃ একথা স্বীকার্য্য যে, ১৯১৮ সালের মার্চ্চ মাসে পশ্চিম রণাঙ্গণে জার্ম্মাণীর প্রচণ্ড আক্রমণে মিত্রশক্তির অবস্থা আজিকার জাপানী আক্রমণের মতই সঙ্কটের সৃষ্টি করিয়াছিল। এই সঙ্কট রোধ করিবার জন্য সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অনুভব করিয়াছিলেন যে, একজন সেনাপতির হাতে সমগ্র মিত্রশক্তির সমস্ত বাহিনীর পরিচালন ভার দেওয়া দরকার। ২৬শে মার্চ্চ তারিখ মার্শাল ফস মিত্রশক্তির অর্থাৎ বৃটিশ, ফরাসী, মার্কিণ ও বেলজিয়ান বাহিনীর সর্ব্বপ্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন এবং ১৫ই জুলাই তারিখ তিনি ফরাসী রণক্ষেত্রের রেইম ও সয়সনে জার্ম্মাণ আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়া ১৮ই জুলাই তারিখ মার্ণে নদী তীরের বিখ্যাত পাল্টা আক্রমণের অভিযান আরম্ভ করেন। এখান হইতেই জার্ম্মাণীর চরম পরাজয়ের

সূচনা হয়। কিন্তু মার্শাল ফসের তুলনায় জেনারেল ওয়াভেলের সমস্যা আরও কঠিন। ইহার প্রথম কারণ সমুদ্র এবং দ্বিতীয় আকাশ। ১৯১৮ সালে রণনীতির এই দুই সমস্যা পশ্চিম রণাঙ্গনে জটিল ছিল না। আজ জাপানী নৌ-বহর শক্তিমান ও অক্ষত এবং বৃটিশ নৌ-বহর দুর্ব্বল ও মার্কিন নৌ-বহরের গতিবিধি অনিশ্চিত। প্রশান্ত মহাসমুদ্রে সাফল্য অর্জ্জন করিতে হইলে জেনারেল ওয়াভেলকে জাপান কর্ত্তৃক অধিকৃত ইঙ্গ-মার্কিণ দ্বীপগুলিকে উদ্ধার ও ইঙ্গ-মার্কিণ নৌ-বহরের সম্মিলিত মহড়ার পথ মুক্ত করিতে হইবে। জনৈক খ্যাতনামা নৌবিশেষজ্ঞের মতে "The enormous expanse of the Pacific makes base power and large steaming radius the dominating factors in the strategical problems of that ocean. Without a chain of well defended fuel stations it would be impossible for the American Fleet to operate for any length of time in the Western Pacific". সোজা কথায় প্রশান্ত মহাসমুদ্রের বিশালতার জন্য এখানকার রণনীতিতে দুইটি প্রশ্ন বৈশিষ্ট্য অর্জ্জন করিবে। প্রথমতঃ নৌ-ঘাঁটির শক্তি এবং দ্বিতীয়তঃ দীর্ঘপথে একাদিক্রমে জাহাজ চালাইবার শক্তি। পর পর সারিবদ্ধ সুরক্ষিত ঘাঁটি (এবং যে ঘাঁটি হইতে কয়লা ও পেট্রোল সংগ্রহ করা যায়) ছাড়া মার্কিণ নৌ-বহরের পক্ষে কোন দীর্ঘ মহড়ায় বাহির হওয়া অসম্ভব। মহাসমুদ্রের বিশালতা ও দূরত্ব এবং সেই দূরত্বের ব্যবধান ঘুচানো এখনকার রণনীতির জটিল সমস্যা। এই অভিমতের সঙ্গে আজিকার প্রশান্ত মহাসমুদ্রের অবস্থা মিলাইলে দেখা যাইবে যে সমস্যা কত কঠিন। কারণ, ওয়েক্ হইতে পেনাং পর্য্যন্ত (একমাত্র সিঙ্গাপুর ছাড়া) সমস্ত ইঙ্গ-মার্কিণ নৌ-ঘাঁটি আজ জাপানের দখলে। জেনারেল ওয়াভেল ও তাঁহার সেনানীবৃন্দকে এই

সমস্যার মীমাংসা করিতে হইবে। এইজন্য সম্ভবতঃ তাঁহারা ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত অপেক্ষা করিয়া আপাততঃ আরও পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন এবং জাপানকে দীর্ঘ বিস্তৃত রণাঙ্গনে ছড়াইয়া পড়িতে দিবেন—যেমন জার্ম্মাণীকে দিতে হইয়াছে রাশিয়ায়! আপাততঃ এই অসুবিধা স্বীকার করিতেই হইবে এবং এই জন্য সামরিক ভাষায় যাহাকে **delaying tactics** বলে অর্থাৎ সময় হরণ করার রণকৌশল গ্রহণ করিতে হইবে। এই সময় হরণের কৌশলের দ্বারা জাপানের অগ্রগতিতে যতটা সম্ভব বিলম্ব ঘটানো—এমন নীতির উপরেই ভরসা রাখিতে হইবে।

জাপানকে পিছন ও পার্শ্বদেশ হইতে আক্রমণের জন্য মার্শাল চিয়াং কাইসেককে ভার দেওয়া হইয়াছে এবং মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্য-বাহিনীগুলিকে তাঁহার অধীনে আনা হইয়াছে। চীন-ব্রহ্ম রাস্তা, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড—প্রধানতঃ এই তিন সীমানায় তিনি জাপানকে আক্রমণ করিবেন এবং এই বিষয়ে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্য মার্কিণ সেনাপতি ব্রেট ও বৃটিশ সেনাপতি ওয়াভেল ইতিপূর্ব্বেই চুংকিংয়ে গিয়া এক সমর-পরিষদ গঠন করিয়া আসিয়াছেন। এই পরিষদে মিত্রশক্তির প্রতিনিধিবর্গ থাকিবেন। আপাততঃ 'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটিজি'র যে ব্যবস্থা হইয়াছে, কাগজপত্রে তাহা মন্দ দেখাইতেছে না। সেনাপতিবৃন্দ খ্যাতিমান, সৈন্যদল উৎকৃষ্ট যোদ্ধা এবং মিত্রশক্তির দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা প্রচুর। কিন্তু রণক্ষেত্র বহু বিস্তৃত, ঘাঁটিগুলি হস্তচ্যুত এবং ট্যাঙ্ক, নৌবহর ও বিমানবহরের সংখ্যা অতি সামান্য। সুতরাং ষ্ট্রাটিজি ও ট্যাকৃটিসের মধ্যে পূর্ণ মিলন ঘটাইতে হইবে, অন্যথা মার্শাল ফসের উপর জেনারেল ওয়াভেল ইতিহাসের দিক হইতে টেক্কা দিতে পারিবেন না!

তৃতীয় অধ্যায়

—•—

(৩)

মালয়ের যুদ্ধ

১০ই জানুয়ারী, '৪২।

ব্রহ্মদেশের শেষ প্রান্ত হইতে মালয় উপদ্বীপ দীর্ঘ পুচ্ছের মত ঝুলিয়া পড়িয়াছে। এই পুচ্ছকে কেবল ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করাই জাপানীদের উদ্দেশ্য নহে, ইহার সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্ব সিঙ্গাপুরের জন্য। মালয়ের একান্ত দক্ষিণ প্রান্তে বিখ্যাত সিঙ্গাপুর নৌ-ঘাঁটি, মালয় দখল করিয়া এই ঘাঁটি বিচ্ছিন্ন বা অবরোধ করাই জাপানীদের আশু লক্ষ্য। ফিলিপাইনে, হংকংয়ে ও মালয়ে এবং অন্যত্র জাপানীরা প্রায় একই সময়ে আক্রমণ চালাইয়াছে। কিন্তু হংকং ও ম্যানিলা যত শীঘ্র দখল হইয়াছে, মালয়ে জাপানীদের অগ্রগতি ততটা দ্রুত হয় নাই। ইহার কারণ ফিলিপাইনে ও হংকংয়ে জাপান যতটা শক্তি লইয়া আঘাত

করিয়াছে, মালয়ে এখনও ততখানি জোর দেওয়া হয় নাই। নৌঘাঁটি ও সমুদ্রপথের সুবিধা এবং ইঙ্গ-মার্কিণ নৌবহরকে প্রথমে বেকায়দায় ফেলিবার জন্যই হংকং ও ম্যানিলা জাপানীরা আগে দখল করিয়াছে। মালয়ের যুদ্ধ প্রধানতঃ স্থলপথে,—নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনী স্থলপথের সংগ্রামে সহায়তা করিতেছে। সর্ব্বত্র জাপানী যুদ্ধের এই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার মত। কিন্তু মালয়ে জাপানীরা খুব প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিয়া না থাকিলেও তাহারা সাফল্য কম অর্জ্জন করে নাই। বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনীর শক্তি এখানে প্রায় সমস্ত দিক দিয়াই শত্রুর তুলনায় দুর্ব্বল। সুতরাং আত্মরক্ষাকারীদিগকে ক্রমাগতঃ পশ্চাতে হটিতে হইতেছে। মানচিত্র সন্ধান করিলে দেখা যাইবে যে, পেনাং হইতে প্রায় ২০০ মাইল দক্ষিণে ও মালয়ের পশ্চিম তীরে সেলাংগড়। সেলাংগড়ের বিপরীত দিকে অর্থাৎ মালয়ের পূর্ব্ব তীরে কুয়াণ্টান—কুয়ালালামপুর ও সেলাংগড় প্রায় কাছাকাছি। এই তিনটি স্থানের উপর রেখা টানিলে ইহারা মোটামুটি একই লাইনে পড়ে। বৃটিশ সাম্রাজ্য বাহিনী ঠিক এই লাইনের উপর সরিয়া আসিয়াছে। ইহাকেই মধ্য মালয়ের শেষ সীমা বলিয়া ধরা যায়, ইহার পরেই দক্ষিণ মালয় সুরু হইল, যাহার শেষ প্রান্ত সিঙ্গাপুর। অর্থাৎ সহজ কথায় উত্তর মালয় জাপানীদের দখলে গিয়াছে, মধ্য মালয়ে জাপানীরা বহু দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এখানকার আত্মরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিতে পারিলে তাহারা দক্ষিণ মালয়ে প্রবেশ করিবে। আরও সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, জাপানী সৈন্যেরা স্থল পথে সিঙ্গাপুরের ২০০ মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে।

দক্ষিণপ্রান্তিক ব্রহ্ম ও মালয়ের মধ্যে থাইল্যাণ্ড বা শ্যামের একটা ছোট্ট টুকরা অংশ আছে। এই ক্ষুদ্র অংশটাই মালয় ও ব্রহ্মকে স্থলপথে সংযুক্ত করিয়াছে। থাইল্যাণ্ড জাপানীদের আওতায় যাওয়ায় এই ক্ষুদ্র

দ ক্ষি ণ
চী ন
স মু দ্র
সিঙ্গোরা
পাটানী
কোটাবারু
আলোরস্টার
কেডা
প্রঃ ওয়েলেসলি
টানামারা
পেরাক
ট্রেঙ্গানু
ম্যা লা য়
পা হাং
কুয়ান্টান
পেকান
সেলাংগর
কুয়ালালামপুর
গেমাস
রমপিন
পয়েন্ট ডিকসন
মালাক্কা
জ হো র
মহারাণী
বাটু পাহাট
সিঙ্গাপুর
সু মা ত্রা
মাইল
০
৫০
১০০

মালয়ের মানচিত্র

ভূভাগই এক্ষণে ব্রহ্মদেশ ও মালয় উভয়ের বিপদ ঘটাইয়াছে। কারণ, ব্যাঙ্কক হইতে একটি রেলপথ দক্ষিণপ্রান্তিক ব্রহ্মের সীমা ঘেঁসিয়া সঙ্কীর্ণ থাইল্যাণ্ড যোজককে অতিক্রম করিয়া কোটাবারুতে পৌছিয়াছে এবং কোটাবারু হইতে মধ্য মালয়কে ভেদ করিয়া রেলপথ গিয়াছে সিঙ্গাপুর। এই রেলপথের সহিত কুয়ালালামপুর ও সেলাংগড়েরও যোগ রহিয়াছে। মালয়ের যুদ্ধে এই রেলপথ স্বভাবতঃই গুরুত্ব অর্জ্জন করিবে। সুতরাং এই রেলপথের উপর দৃষ্টি রাখা বাঞ্ছনীয়। জাপানীরা শ্যাম দেশ ও শ্যাম উপসাগর হইতে মালয়ে আক্রমণ চালাইয়াছে। সিঙ্গোরা হইতে কেডা হইয়া তাহারা পেনাং দখল করিয়াছে। পেনাং হইতে জাপানীদের এক বাহু জলপথে যাইতেছে সেলাংগড়ের দিকে এবং আর এক বাহু সম্ভবতঃ রেলপথ ধরিয়া ইপো হইয়া কুয়ালালামপুরে যাইবে। ইপো ইতিমধ্যেই সাম্রাজ্যবাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। বার্ণাম নদী ও পেরাক নদী এই অঞ্চলের যুদ্ধে উল্লেখযোগ্য হইয়াছে এবং নদী অতিক্রমণে জাপানীদের পটুতা ইতিপূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। সিঙ্গোরা হইতে জাপানীদের আর এক বাহু কোটাবারু দখল করিয়াছে। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ বিমানঘাঁটি দখলের পর কেলানটান ও ট্রেনঙ্গানাউ প্রদেশও জাপানীদের হাতে গিয়াছে। সুতরাং শত্রুপক্ষ শীঘ্রই মধ্য মালয়ের প্রান্ত সীমানায় পৌছিবে বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।

লণ্ডনে সরকারীভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, মালয়ের ১৫টি বিমান-ঘাঁটি জাপানীদের দখলে গিয়াছে। এতগুলি বিমান-ঘাঁটি শত্রুর কবলে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক। কারণ, বিমান-যুদ্ধের পক্ষে বিমান-ঘাঁটির একান্ত প্রয়োজন। নরওয়ে ও ক্রীটের যুদ্ধে মিত্রশক্তির হারিবার অন্যতম কারণ পূর্ব্বাহ্নে শত্রু কর্ত্তৃক বিমান-ঘাঁটিগুলির দখল। একে জাপানীদের বিমানশক্তি এখানে শ্রেষ্ঠতর, ইহার উপর তাহারা বিমান-

ঘাঁটিগুলি দখল করিয়া লইয়াছে। যদিও মালয় অত্যন্ত অরণ্যসমাকুল, দুর্গম দেশ, তথাপি আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধ প্রকৃতির বিঘ্নকে বার বার লঙ্ঘন করিতেছে। জাপানীরা দুঃসাহসী ও বেপরোয়া, জার্ম্মাণ রণনীতির আদর্শে তাহারা সংগঠিত ও সুশিক্ষিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দী হইতেই জাপানী গভর্ণমেণ্ট স্থলযুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরামর্শ ও শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছে। জনৈক বিশেষজ্ঞের অভিমত এখানে উল্লেখ করা যাইতে পারে :—

The Prussian Army is the master pattern on which Japan's military system has been fashioned and the broad principles of organisation and training laid down by General Meckel, the Prussian officer who was appointed military adviser to the Japanese Government in 1885, have never been departed from —প্রুশিয়ান (জার্ম্মাণ) সৈন্যবাহিনীর সর্ব্বোৎকৃষ্ট নক্সার উপর ভিত্তি করিয়াই জাপানী সামরিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৮৮৫ সালে প্রুশিয়ান সেনপাতি জেনারেল মেকেল জাপ গবর্ণমেণ্টের সামরিক পরামর্শদাতা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সৈন্যবাহিনীর সংগঠন ও শিক্ষার জন্য যে সমস্ত মূলনীতি তিনি স্থির করিয়াছিলেন, সেগুলি বরাবর অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে। ইহার পর বিগত মহাযুদ্ধের ১৯১৮ সাল হইতে ১৯৩০ এবং ১৯৩৬ সাল পর্য্যন্ত খ্যাতনামা জাপ সমরবিদ্ জেনারেল ট্যানাকা জাপানী সৈন্য বিভাগকে সম্পূর্ণরূপে আধুনিক কায়দায় পুনর্গঠন করিয়াছেন। জেনারেল ট্যানাকার প্রভাবেই আধুনিক জাপান উগ্র সামরিক ক্ষুধায় উজ্জীবিত হইয়াছে এবং চীন ও বর্ত্তমান যুদ্ধের পশ্চাতে ট্যানাকার রুদ্রনীতির প্রভাব স্বীকার করা যাইতে পারে। অধিকন্তু জার্ম্মাণীর সহিত যোগ দিয়া জাপান আধুনিক ব্লিজক্রিগ ও যান্ত্রিক যুদ্ধের কৌশল শিখিয়াছে এবং তাহার সৈন্যদলও সেই জন্য নূতন করিয়া ঢালিয়া সাজানো

হইয়াছে। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছে জাপানের নৌ-যুদ্ধের স্বাভাবিক রণপটুতা। আজ আমেরিকা ও বৃটেনকে এই রণপটুতার সম্মুখীন হইয়া লড়িতে হইতেছে।

• মালয়ের উপর জাপানীরা যে চাপ দিতেছে, সিঙ্গাপুরের পক্ষে তাহা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। কারণ, প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপানীদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় এবং সিঙ্গাপুরের দূরবর্ত্তী ও অদূরবর্ত্তী ঘাঁটিগুলি একে একে জাপানীদের হাতে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দেওয়ায় মালয়ের এই যুদ্ধ বিশেষ গুরুত্ব অর্জ্জন করিয়াছে। ইহার দ্বারা জাপানীরা চাহিতেছে জলপথের বিপদ এড়াইয়া সোজা স্থলপথে পশ্চাৎ হইতে সিঙ্গাপুরকে আক্রমণ। যদি মিত্রশক্তি থাইল্যাণ্ডে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে পারেন, তবে মালয়ের উপর যেমন চাপ হ্রাস পাইবে, তেমনি যদি তাঁহারা শীঘ্র বিমান আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, তাহা হইলে সিঙ্গাপুরের সঙ্কটও কাটিয়া যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

(৪)

দক্ষিণ মালয়ে অগ্রগতি

১৪ই জানুয়ারী, '৪২।

আগেকার প্রবন্ধে আমরা বলিয়াছি যে, সেলাংগড়, কুয়ালালামপুর ও কুয়াণ্টান—এই স্থানগুলির উপর রেখা টানিলে মোটামুটি যে লাইনের সৃষ্টি হয়, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনী সেখানেই ছিল। কিন্তু জাপানীরা ইতিমধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। কোন প্রকার ক্ষতি গ্রাহ্য না করিয়া এবং সাম্রাজ্যবাহিনীর দৃঢ় আত্মরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া জাপানীদের ব্লিজক্রিগ চলিতেছে দুর্দ্ধর্ষ বেগে। মালয়ের পশ্চিম তীরে সেলাংগড় ও পূর্ব্বতীরে কুয়াণ্টান দখল হইয়া গিয়াছে এবং কুয়ালালামপুরেরও পতন হইয়াছে। কুয়ালালামপুর সমগ্র মালয়ে অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন সহর ছিল, ইহা দখলে যাওয়াতে মালয়ের পশ্চিম তীরস্থ সুইটেনহাম বন্দরও

জাপানীরা ব্যবহারের সুযোগ পাইবে। মালয় ও সিঙ্গাপুরের সমস্ত সংবাদেই দেখা যাইতেছে যে, উপযুক্ত পরিমাণ বিমান-বহরের অভাবেই আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদল বীরত্বের সহিত লড়িয়াও তাল সামলাইতে পারিতেছে না। নিদারুণ বোমাবর্ষণের জন্য তাহারা ক্রমাগত পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইতেছে।

জাপানীরা ব্যোমাবর্ষণের আড়ালে অগ্রসর হইয়া যাইতেছে। তাহাদের সঙ্গে ছোট ছোট ট্যাঙ্ক রহিয়াছে এবং আত্মরক্ষার ব্যূহগুলিকে ঝাঁঝরির মত বহু স্থানে ছিদ্র করিয়া পদাতিক দল নানাপথে প্রবেশ করিতেছে। আত্মরক্ষাকারী সৈন্যরা বলিতেছে যে, জাপানীরা একই সময়ে ৬।৭ দিক হইতে আক্রমণ করিতেছে। আধুনিক আক্রমণাত্মক সংগ্রামের ইহাই রণকৌশল। প্রতিপক্ষের ব্যূহের মধ্যে ট্যাঙ্ক ও বোমারুযোগে বহু ছিদ্র সৃষ্টি করিয়া পদাতিক বাহিনীর প্রচণ্ড বেগে আঘাত ও অগ্রগতি —ইহাই আধুনিক জার্ম্মাণীর রণকৌশল এবং এই কৌশল জাপানীরাও অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য, এরোপ্লেন ও জাহাজের ব্যবস্থা থাকিলে জাপানীদের এই রণকৌশলও প্রতিহত করা যাইত। মধ্য মালয়ের শেষ প্রান্ত আজ অতিক্রান্ত প্রায় এবং ইহার পরেই দক্ষিণ মালয় বা জহোর রাজ্য সুরু হইবে এবং ইহারই দক্ষিণতম প্রান্তে সিঙ্গাপুর। ইতিমধ্যে আকাশপথে সেখানে প্রচুর বিমান আক্রমণ ঘটিতেছে। ইহার উদ্দেশ্য স্পষ্ট। বোমাবর্ষণের দ্বারা সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ঘাঁটি ছিন্ন করা, জনসাধারণকে সন্ত্রস্ত করা এবং সামরিক ব্যবস্থার বিভ্রাট ঘটানো—পরে স্থলপথে সিঙ্গাপুরকে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণ, ইহাই মালয়ের যুদ্ধে জাপানীদের লক্ষ্য।

১৯৩৯-৪০ সাল অর্থাৎ পোল্যাণ্ড ও ফ্রান্সের যুদ্ধের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুরক্ষিত ঘাঁটি এবং কংক্রীট ও ইস্পাতের প্রাচীর, বেষ্টনী ও কেল্লা

ইত্যাদির উপর সামরিক মহলের যথেষ্ট বিশ্বাস ছিল। ফ্রান্সের বিখ্যাত ম্যাজিনো লাইন পৃথিবীর অষ্টম বা নবম আশ্চর্য্য বলিয়া বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল। কিন্তু সেডানের (Sedan) মধ্য দিয়া জার্ম্মাণীর বন্যার বেগে প্রবেশ সেই ঐতিহাসিক দুর্গগুলিকে অকেজো বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। ইহার কারণ এই যে, নূতন যান্ত্রিক যুদ্ধে war of position বা স্থির-কেন্দ্রিক যুদ্ধের অবসান হইয়াছে। ইহার বদলে war of movement বা গতিশীল যুদ্ধের প্রবর্ত্তন হইয়াছে। অর্থাৎ ১৯১৪-১৮ সালে যেমন এক শ্রেণীর দুর্গ ও প্রাচীরের আড়ালে বসিয়া কিম্বা পরিখাতলে আশ্রয় লইয়া মাসের পর মাস ও বৎসরের পর বৎসর সৈন্যেরা আত্মরক্ষা করিতে পারিত এবং আক্রমণকারীর গোলাবর্ষণ ও অন্যান্য আঘাত দীর্ঘকাল সহ্য করিতে পারিত, আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে তাহা আর সম্ভব হইতেছে না। ফ্রান্সের ইতিহাস বিখ্যাত ভার্দ্দুনের যুদ্ধ ভার্দ্দুনের সুরক্ষিত দুর্গ আশ্রয় করিয়া চলিয়াছিল এবং একাদিক্রমে দীর্ঘ দেড় বৎসর সেই হিংস্র সংগ্রাম চলিয়াছিল। সেই রণক্ষেত্রে উভয় পক্ষের প্রচুর নরবলি ঘটিয়া থাকিলেও জার্ম্মাণী সেখানে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিল। কিন্তু এবার কোন একটিমাত্র রণক্ষেত্রে একাদিক্রমে দেড় বৎসর যুদ্ধ চলিতে পারিতেছে না। সোভিয়েট রাশিয়ায় ৬ মাস যাবৎ যুদ্ধ চলিতেছে বটে, কিন্তু উহা কোন নির্দ্দিষ্ট একটিমাত্র রণক্ষেত্রে নহে, রণক্ষেত্রের সীমা ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হইতেছে এবং রুশ সৈন্যদলকে ক্রমাগতঃ পশ্চাতে হটিয়া আসিতে হইয়াছে। অপর পক্ষে রাশিয়া বর্ত্তমানে প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জার্ম্মাণ সৈন্যদিগকে পশ্চাতে হটাইয়া দিতেছে ও পরাজিত করিতেছে। সময়ের ও ফলাফলের দিক দিয়া ইহা একটা যুগান্তকারী পরিবর্ত্তনের মত। ইহার মূলে রহিয়াছে আধুনিক ট্যাঙ্ক ও বোমারু বিমান এবং আনুষঙ্গিক যান্ত্রিক বাহিনী। বিমানগুলি ঝাঁক

ধাবিয়া ঠিক মাথার উপর আসিয়া বোমাবর্ষণের চেষ্টা করে এবং ট্যাঙ্কগুলি সঙ্গে সঙ্গে অগ্রসর হইয়া যায়। সুতরাং এই যুদ্ধে ঠিক স্থির হইয়া বসিয়া থাকিয়া আত্মরক্ষা করা যায় না। এই আক্রমণাত্মক যান্ত্রিক যুদ্ধকে রোধ করিতে হইলে অনুরূপ পাল্টা ব্যবস্থা থাকা দরকার। অনুরূপ সংখ্যক ট্যাঙ্ক ও বিমান এবং সাঁজোয়া গাড়ী ও প্রচুর পদাতিক যেমন দরকার, তেমনই সামরিক ভাষায় যাহাকে defence in depth বা আত্মরক্ষার গভীরতর ব্যূহ বলে সেই ব্যবস্থারও একান্ত প্রয়োজন। সহজ কথায় আক্রমণকারীকে প্রতিরোধ করিতে হইলে কেবল আত্মরক্ষার একটিমাত্র লাইন ও ব্যূহের সারি থাকিলেই চলিবে না। পর পর কয়েক মাইল বিস্তৃত এই ব্যবস্থা থাকা চাই এবং উহার মধ্যে দ্রুত সঞ্চরণশীল মহড়ার যান্ত্রিক আয়োজন থাকা চাই। রাশিয়া এই কৌশলেই দুর্দ্দান্ত জার্ম্মাণবাহিনীকে ঠেকাইয়া রাখিয়াছে। কেবল ম্যাজিনো লাইনের অচল এবং অনড় দুর্গরাশির ভরসায় থাকিলে চলিবে না। সিঙ্গাপুর অবশ্য ম্যাজিনো লাইন নহে, উহা নৌ-দুর্গ ও নৌ-ঘাঁটি। কিন্তু এই দুর্গ ও ঘাঁটি war of po·i·ion এরই উপযোগী। গতিশীল যুদ্ধের ক্রমাগত ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত আক্রমণের বিরুদ্ধে এবং ট্যাঙ্ক ও বোমারুর প্রচণ্ড আঘাতের সম্মুখে কি প্রকার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই আমাদের জানা নাই। স্থলপথে দক্ষিণ মালয় হইতে জাপানীরা যে ভাবে সিঙ্গপুরের দিকে অগ্রসর হইয়া চাপ দিতেছে এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের উপর যে ভাবে আক্রমণ চালাইতেছে, তাহাতে সিঙ্গাপুর পরিবেষ্টিত হওয়ারই সম্ভাবনা বেশী।

তৃতীয় অধ্যায়

(৫)

মালয়ের দুর্গতি

১৭ই জানুয়ারী '৪১।

মালয়ের দুর্গম দেশে জাপানী সৈন্যেরা অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। পাহাড়, জঙ্গল, জলাভূমি এবং নদী ইত্যাদি প্রকৃতির সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করিয়া জাপানীদের ব্লিজক্রিগ দুর্দ্ধর্ষ গতিতে চলিতেছে। তাহাদের এই গতি ১৯৪০ সালে পশ্চিম রণাঙ্গনে জার্ম্মাণ ব্লিজক্রিগের সহিত তুলনীয়। সেখানেও ইঙ্গ-ফরাসী বাহিনী সৈন্যসংখ্যায় ও অস্ত্রসজ্জায় জার্ম্মাণীর তুলনায় অনেক বেশী দুর্ব্বল ছিল এবং যান্ত্রিক সংগ্রামের নূতনতর রণকৌশলে জার্ম্মাণী অভিনব যুদ্ধ চালাইয়াছিল। মালয়েও জাপানীদের এই লক্ষণ দেখা যাইতেছে। তাহারা যে ভাবে উত্তর, মধ্য ও দক্ষিণ মালয় অতিক্রম করিতেছে, তাহাতে সিঙ্গাপুরের সীমানায় পৌছিতে খুব

বেশী বিলম্ব হইবে বলিয়া মনে হয় না। অবস্থা যে অত্যন্ত গুরুতর এবং সিঙ্গাপুরের সঙ্কট যে আসন্ন, তাহা ইংলণ্ডের বড় বড় পত্রিকাসমূহ এবং ওয়াকেফহাল মহল স্পষ্টই স্বীকার করিতেছেন। মালয়ে বৃটিশবাহিনীর সঙ্গে 'লণ্ডন টাইমসে'র যে বিশেষ সংবাদদাতা আছেন, তিনি এখানকার পরাজয় সম্পর্কে তিনটি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অবশ্য এই কারণগুলি নূতন নহে, তথাপি অবস্থা বুঝিবার পক্ষে এগুলির পুনরুল্লেখ করা যাইতে পারে। যথা:—(১) জাপানীদের তুলনায় বৃটিশ সাম্রাজ্য-সৈন্যের সংখ্যা অত্যন্ত কম। জাপানীদের সংখ্যা কয়েকগুণ বেশী হইবে। (২) দীর্ঘ ৬ সপ্তাহ ধরিয়া ক্রমাগত একটানা যুদ্ধের জন্য সৈন্যেরা অত্যন্ত ক্লান্ত। যদি তাহারা এভাবে ক্লান্ত না হইত এবং সংখ্যায় কিছুটাও সমান হইত, তাহা হইলে জাপানীরা এত সুবিধা করিতে পারিত না। সৈন্যেরা এত পরিশ্রান্ত যে ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য খাদ্য গ্রহণের আগেই ঘুমাইয়া পড়ে। কেবল তাহাই নহে, যে ধরণের যান্ত্রিক যুদ্ধ চলিতেছে তাহাতে স্নায়ুমণ্ডলীর অসাধারণ শক্তির প্রয়োজন। অতীতের যুদ্ধে সৈন্যদের মনে এই ভরসা থাকিত যে, তাহাদের পার্শ্বদেশ বা flank বিপন্ন হইলেও পশ্চাতে (ear) কোন ভয়ের কারণ নাই। কিন্তু এই যুদ্ধে সৈন্যেরা রাত্রিবেলা পর্য্যন্ত সর্ব্বদা ভয়ে ভয়ে থাকে—বুঝি বিপদ তাহাদের চারিদিকে এবং যে কোন মুহূর্ত্তে তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে। সৈন্যদের লড়াই করিবার শক্তি উচ্চস্তরের; কিন্তু সমস্যা শক্তির নহে, সমস্যা হইতেছে সংখ্যার। (৩) বিমানবহরের অভাব। এই অভাবের জন্য সাম্রাজ্যবাহিনীকে অপরিসীম বেগ পাইতে হইতেছে। সৈন্যদলের অগ্রবর্ত্তী বাহিনী জানে না তাহাদের সম্মুখে মাত্র ১০০ গজ দূরের জঙ্গলে শত্রুপক্ষ কি করিতেছে। সেনাপতিগণ বিমানবহরের অভাবে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। ফলে শত্রু সৈন্যের সংখ্যা কত, তাহারা

কোথায় কি ভাবে আছে এবং কোন্ দিক দিয়াই বা তাহারা আক্রমণের আয়োজন করিতেছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না।

এই বর্ণনা হইতে অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি হইবে। সাধারণতঃ যাহারা আক্রমণ করে, তাহারা প্রথমেই এই সুবিধা পায় যে, বিপক্ষের সৈন্য ও সেনাপতিদিগকে তাহাদের চালের জন্য অপেক্ষা করিতে হয় এবং সেই চাল অনুসারে চলিতে হয়। অর্থাৎ আত্মরক্ষাকারীর রণনীতিকে আক্রমণকারীর রণনীতির মুখাপেক্ষী হইতে হয় এবং গোড়া হইতেই আক্রমণকারীর চালের মধ্যে পড়িতে হয়। ফলে আত্মরক্ষাকারীদিগকে স্বাভাবিক কারণেই অনেক বেশী অসুবিধা ও বিপদ বরণ করিয়া লইতে হয়। আক্রমণকারীর আর একটা লক্ষ্য থাকে বহু দিকে সৈন্য পাঠাইয়া আত্মরক্ষাকারীকে বিভ্রান্ত করা। অর্থাৎ আক্রমণকারী সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন আঘাত এবং সর্ব্বাপেক্ষা বেশী শক্তি কোথায় নিয়োজিত করিবে তাহা আগে বুঝিতে না দেওয়া। সোজা বাঙ্গলায় ইহাকে ধাপ্পা দেওয়া (রণনীতির ভাষায় feint attack বলে) বলা যাইতে পারে। এই ধাপ্পা বুঝিতে হইলে অগ্রবর্ত্তী বাহিনী বা vanguardকেও সম্মুখভাগে নানা দিকে ছড়াইয়া দিতে হয়, সম্ভাব্য সমস্ত প্রবেশ পথে তীক্ষ্ণ নজর রাখিতে হয় এবং উপর হইতে নিরন্তর এরোপ্লেনযোগে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয়। সাধারণতঃ এরোপ্লেনই এই বিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সহায়ক। কিন্তু যেখানে উপযুক্ত এরোপ্লেনের অভাব, যেখানে শত্রুর গতিবিধি একান্ত অজ্ঞাত, সেখানে আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদলের বিপদ কত গুরুতর তাহা সহজেই অনুমেয়। মালয় রক্ষাকারী সাম্রাজ্যবাহিনী অত্যন্ত বীরত্বের সহিত লড়িতেছে; কিন্তু উপযুক্ত অস্ত্র ও যন্ত্রের অভাবে তাহাদের এই বীরত্ব জয়মণ্ডিত হইতে পারিতেছে না। এই সাম্রাজ্যবাহিনীর মধ্যে শতকরা মাত্র ২৫ ভাগ ইংরাজ সৈন্য রহিয়াছে, বাকী ৭৫ ভাগ ভারতীয়।

সামান্য অষ্ট্রেলিয়ান সৈন্যও আছে। ভারতীয় সৈন্যেরা যুদ্ধবিদ্যায় জাপানীদের তুলনায় মোটেই হীন নহে। সমান অস্ত্র ও সমান সংখ্যার অভাবেই তাহারা আজ ক্লান্ত দেহে ক্রমাগত পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইতেছে, এবং জাপানীরা সিঙ্গাপুরের ১০০ মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে। ইহা দুঃসংবাদ সন্দেহ নাই, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত এই তিক্ত অবস্থার সম্মুখীন হওয়া ছাড়া উপায় কি?

জাপানীরা সিঙ্গাপুরকে কেবল পশ্চাৎ দিক দিয়াই আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে না। জাভা, সুমাত্রা ও বোর্ণিওর উপরেও তাহারা নজর দিয়াছে। যদি এই দ্বীপগুলি তাহারা দখল করিতে পারে, তবে সিঙ্গাপুর চতুর্দ্দিক হইতে পরিবেষ্টিত হইবে এবং এই বেষ্টনী তাহারা ধীরে ধীরে ক্রমশঃ সিঙ্গাপুরের নৌদুর্গের চারিদিকে ঘনাইয়া আনিবে। একদিকে পরিবেষ্টন করিয়া তাহারা সিঙ্গাপুরকে যেমন অবরোধ (সামরিক ভাষায় investment বলে) করিবে, অন্যদিকে তেমনই তাহারা সমুদ্র পথের দূর পাল্লার কামানের সহিত মালয়ের বিমান ঘাঁটি হইতে সিঙ্গাপুরের উপর ছোঁমারা বিমান ব্যবহার করিবে। সম্ভবতঃ এই ছোঁমারা বিমানের সাহায্যে তাহারা সিঙ্গাপুরের gunposition অর্থাৎ শ্রেণীবদ্ধ কামানসমূহের উপর অবিশ্রান্ত বোমাবর্ষণের চেষ্টা করিবে। জহোর রাজ্য ও জহোর প্রণালী পার হইয়া যান্ত্রিকবাহিনী স্থলপথে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। মোট কথা সিঙ্গাপুরের চারিদিক বেষ্টন করিয়া জাপানীরা যুগপৎ স্থলে, জলে ও আকাশপথে আক্রমণ চালাইবে। এই ত্রিধারার যুদ্ধ তাহারা ফিলিপাইনে চালাইয়াছে এবং এভাবেই ম্যানিলা ও ফিলিপাইনের নৌঘাঁটি দখল করিয়াছে। ঠিক এই রণকৌশলই আরও প্রচণ্ড শক্তি ও নৃশংসতার সহিত তাহারা সিঙ্গাপুরেও কেন্দ্রীভূত করিতে পারে। দক্ষিণ মালয়ের যুদ্ধ সেই পরিণতির দিকেই দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

* *
*

১৯শে জানুয়ারী '৪২।

জাপানীরা সিঙ্গাপুরের দিকে ক্রমশঃ সমস্ত শক্তি অতি দ্রুত প্রয়োগের চেষ্টা করিতেছে। তাহারা প্রত্যহ যে গতিতে অগ্রসর হইতেছে, তাহা উদ্বেগজনক। গত এক সপ্তাহে তাহারা সিঙ্গাপুরের ২০০ মাইলের মধ্যে ছিল, তারপর ১৫০ মাইল, তারপর ১২০ মাইল, তারপর ১০০ মাইল এবং এক্ষণে প্রকাশ যে, তাহারা সিঙ্গাপুরের ৯০ মাইলের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। মালয়ের যে প্রধান রেলপথ ও রাস্তা দক্ষিণাভিমুখী সিঙ্গাপুরের দিকে চলিয়া গিয়াছে,সেই দিক দিয়াই জাপানীরা প্রধান যান্ত্রিক ও পদাতিকবাহিনী পাঠাইতেছে। ইহা ছাড়া মালয়ের পশ্চিম ও পূর্ব্ব তীর ধরিয়াও তাহারা অগ্রসর হইবে। প্রকাশ যে, দক্ষিণাভিমুখী রাজপথের অবস্থাও আদৌ আশাপ্রদ নয়। তাহারা নৌকা ও বজরা যোগে মুয়ার নদীর দক্ষিণে অবতরণ করিয়াছে। মুয়ার নদী দক্ষিণ মালয়ে এবং এখানে প্রচুর সংখ্যক জাপ সৈন্য অবতরণ করায় বৃটিশ সৈন্যেরা সংখ্যার দিক হইতে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। মুয়ার নদী হইতে জাপানীরা নাকি খেয়া পার হইতেছে! ইহা অত্যন্ত বিস্ময়ের কথা। কারণ, আধুনিক বোমারু বিমান, ট্যাঙ্ক ও বড় কামানের যুগে নৌকা ও বজরাযোগে শত্রু সৈন্যের অগ্রগতি, আমাদের মত অ-সামরিক জনগণের নিকট অত্যন্ত অভিনব বলিয়া মনে হইতেছে। অপর দিকে জাপানীরা মালাক্কা প্রণালীতেও কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। মালাক্কা ও মুয়ার নদী হইতে জাপানীরা সাম্রাজ্যবাহিনীর পার্শ্বদেশ বিপন্ন করিতে পারিবে এবং মালাক্কা প্রণালীতে জাপানীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা হইলে সিঙ্গাপুরের নৌপথ অবরুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা। এদিকে বাটাভিয়ার

সংবাদে প্রকাশ যে, জাপানীরা প্রথমতঃ ওলন্দাজ পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের পূর্ব্বাংশ দখলের চেষ্টা করিবে এবং তারপর সিঙ্গাপুরকে চারিদিক দিয়া বেষ্টন করিবে। জাপানীদের প্ল্যান সেই ভাবেই অগ্রসর হইতেছে।

সিঙ্গাপুর অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে জাপানীরা ব্রহ্মদেশ সম্পর্কেও আদৌ উদাসীন নহে। রেঙ্গুণে ও মৌলমেনে তাহারা বার বার বোমাবর্ষণের পর এক্ষণে স্থলপথে আক্রমণ সুরু করিয়াছে। তাহারা ২৫ মাইল পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়াছে। দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্মের শেষাংশ ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট তাহারা আগেই দখল করিয়াছে। এক্ষণে টাভয় জেলার দিকে তাহারা অভিযান করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে এই দক্ষিণ ভাগ মালয়ের সহিত স্থল-পথে সংযুক্ত এবং ইহাকে মালয় যুদ্ধেরই ক্রমবিস্তৃতি বলিয়া ধরা যাইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্মদেশে স্থলপথে আক্রমণের পক্ষে প্রকাণ্ড বাধা হইতেছে জঙ্গল ও পাহাড় এবং উপযুক্ত সংখ্যক রাস্তাঘাটের অভাব। খুব প্রকাণ্ড সেনাদল ব্রহ্মের দুর্গম সীমান্ত ভেদ করিতে পারিবে কিনা সেই বিষয়ে নিশ্চয়ই সংশয় আছে। তবে বর্ত্তমান যুদ্ধের অন্যতম ঘাঁটি ব্রহ্মদেশ এবং উহার রাজধানী রেঙ্গুণ। প্রচুর সংখ্যক চীনা ও ভারতীয় সৈন্য এখানে সম্মিলিত হইয়াছে এবং শ্যাম ও ব্রহ্মের সীমান্তের যে কয়েকটি প্রবেশ-পথ আছে, সেখানে তাহারা সতর্ক পাহারায় রত। আত্মরক্ষাকারীদের সুবিধা এই যে, রাস্তার সংখ্যা কম থাকায় আক্রমণকারীর প্রবেশপথ ও গতিবিধি অপেক্ষাকৃত সহজে জানা যাইবে। এই সমস্ত পথে যদি উপযুক্ত সংখ্যক সৈন্য এবং ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন ইত্যাদির সমাবেশ করা যায়, তবে, চীনা ও ভারতীয় সৈন্যদের সহিত স্থলযুদ্ধে জাপান দ্রুত জয়লাভ করিতে পারিবে না। কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে সৈন্য সংখ্যার ও অস্ত্রের পরিমাণের। মালয়ের যুদ্ধে যে শোচনীয় অবস্থার কথা প্রকাশ পাইয়াছে, ব্রহ্মেও যদি তেমন ঘটে, তবে উদ্বেগের কথা।

তৃতীয় অধ্যায়

—•—

(৬)

পুর্ব্বে না পশ্চিমে ?

২১শে জানুয়ারী '৪২।

ব্রহ্ম ও সিঙ্গাপুরের দিকে জাপানীরা অতি দ্রুত অগ্রসর হইতেছে। দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্মের টেনাসারিম বিভাগের ৪টি জেলার মধ্যে টাভয় অন্যতম। মাত্র ২৪ ঘণ্টা আগে সংবাদ আসিয়াছিল যে, জাপানীরা টাভয়ের দিকে অভিযান করিয়াছে এবং পর মুহূর্ত্তেই সংবাদ আসিয়াছে যে, টাভয়ের পতন হইয়াছে, সাম্রাজ্যবাহিনী পিছু হটিয়াছে এবং টাভয় বিমান ঘাঁটি জাপানীরা অধিকার করিয়াছে। সিঙ্গাপুরের সংবাদও প্রত্যহই খারাপ এবং সেখানে জাপানীরা আরও কয়েক মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। বোধ হয় আর অল্প দিনের মধ্যে জাপানীরা সিঙ্গাপুরের সীমানায় পৌঁছিবে।

ক্রমাগত এই পরাজয় এবং জাপানীদের দ্রুত অগ্রগতি দেখিয়া কেহ কেহ সন্দেহ করিয়াছেন যে, ওয়াশিংটনে মিত্রপক্ষীয় সৈনানীমণ্ডলীর বৈঠকে হয়তো পূর্ব্ব (এশিয়া) ও পশ্চিম (ইউরোপ) রণাঙ্গন লইয়া মতভেদ হইয়াছে এবং যাঁহারা পশ্চিম রণাঙ্গনের পক্ষপাতী তাঁহারাই সম্ভবতঃ নিজেদের অভিমত গ্রহণ করাইতে পারিয়াছেন। এই সন্দেহ নিশ্চয়ই ভিত্তিহীন নহে। কারণ, চীনের রাজধানী চুংকিংয়ের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, লণ্ডনে এবং ওয়াশিংটনে যে সমস্ত বিবৃতি বাহির হইয়াছে, সেগুলিতে প্রশান্ত মহাসাগরীয় যুদ্ধের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয় নাই। ইহাতে চীনের সরকারী মহল অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। চীনের সরকারী মুখপত্র 'সেন্ট্রাল ডেইলী নিউজ' বলিতেছেন যে, ইউরোপে মিত্রশক্তিবর্গ ভূমধ্যসাগরে ও অতলান্তিক মহাসাগরে প্রভুত্ব অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন। ইহাতে পরিণামে জার্ম্মাণীর পরাজয় হইবে। অপর পক্ষে জাপান দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে সম্পূর্ণ একাধিপত্য অর্জ্জন করিয়াছে। যদি অবস্থা এই ভাবেই চলিতে থাকে, তবে কেবল সিঙ্গাপুরের অদৃষ্টই সংশয়াচ্ছন্ন হইবে না, মিত্রশক্তি ব্রহ্মদেশ ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ রক্ষা করিতে পারিবে কিনা, তাহাও একান্ত সন্দেহজনক। বৃটেন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে পুনরায় আধিপত্য লাভ করিতে পারে—শুধু তাহারা ইহা চাহে কিনা এবং ইহাকে নিজেদের রণনীতির পক্ষে অত্যাবশ্যক মনে করে কিনা, উহাই জিজ্ঞাস্য। অদূর ভবিষ্যতে জার্ম্মাণী বড় রকমের কোন আক্রমণ আরম্ভ করিতে পারিবে না। যদি এইরূপ আক্রমণ হয়, তথাপি বৃটেন তাহা প্রতিহত করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম। জার্ম্মাণীকে পরাজিত করিতে হইলে মিত্রপক্ষের বিরাট স্থলবাহিনী থাকা দরকার। রাতারাতি এরূপ সেনাদল গঠন করা যায় না। কিন্তু জাপানের বিরুদ্ধে মিত্রপক্ষের

আক্রমণ চালাইবার সেইরূপ কোন অসুবিধা নাই। জাপানকে যদি প্রশান্ত মহাসাগরের প্রধান প্রধান গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলি দখল করিতে এবং সেগুলি হাতে রাখিতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে সে আরও আক্রমণ রোধ করিতে এবং সঙ্গে সঙ্গে নূতনলব্ধ স্থানগুলিতে শক্তি বৃদ্ধি করিয়া আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। যদি জাপান একবার শক্ত হইয়া বসিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে পরাজিত করিতে হইলে কেবল যে বিরাট নৌ ও বিমানবাহিনীর প্রয়োজন হইবে, তাহাই নহে, প্রকাণ্ড স্থলসেনাদলেরও দরকার হইবে। এরূপ ক্ষেত্রে মিত্রপক্ষকে দুই বিশাল রণাঙ্গনে ব্যাপক স্থলযুদ্ধ চালাইতে হইবে।

সামরিক দিক হইতে চীনা সংবাদপত্রের এই মতামত অত্যন্ত সারবান এবং যুক্তিপূর্ণ। ওয়াশিংটনের বৈঠকে যে 'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটিজি'র পরিকল্পনা হইয়াছে, উহার ফলে মোটামুটি দুইটি নীতি গৃহীত হইয়াছে। প্রথমতঃ জেনারেল চিয়াংকাইসেকের নেতৃত্ব এবং দ্বিতীয়তঃ জেনারেল ওয়াভেলের নেতৃত্ব। জেনারেল চিয়াংকাইসেক খাস চীন এলাকায় এবং ইন্দোচীন, শ্যাম ও ব্রহ্মের সীমা পর্য্যন্ত সংগ্রাম পরিচালনা করিবেন। আর জেনারেল ওয়াভেল মালয়, ব্রহ্মদেশ, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনের যুদ্ধ পরিচালনা করিবেন। আমেরিকা ও বৃটেন এই দুই সেনাপতির সহিত তাহাদের সৈন্য ও সমরসম্ভার দিয়া সহযোগিতা করিবেন এবং চীনা সৈন্যেরাও আবার ব্রহ্মদেশে ও অন্যত্র বৃটেনের সহিত সহযোগিতা করিবেন। মোটামুটি ইহাই ওয়াশিংটন বৈঠকের রণনৈতিক পরিকল্পনা। কিন্তু এই পরিকল্পনা তখনই সার্থক হইতে পারে, যখন ইহাকে কার্য্যে খাটাইবার জন্য উপযুক্ত রণকৌশল অবলম্বিত হইবে। এই রণকৌশল বা tactics আবার নির্ভর করিতেছে উপযুক্ত অস্ত্র অর্থাৎ ট্যাঙ্ক এরোপ্লেন ও যুদ্ধজাহাজের উপর। বিশেষভাবে নৌবহরই জাপানের

বিরুদ্ধে সর্ব্বাধিক প্রয়োজনীয়। কারণ, জাপ যুদ্ধের সঙ্গে সমুদ্র ও স্থল-পথের নিবিড় সংযোগ এবং এই যুদ্ধের রণনৈতিক বৈশিষ্ট্য হইতেছে distance বা দূরত্ব। এই দূরত্ব অতিক্রম করিয়া যুদ্ধে জয়লাভ করিতে হইলে বিশেষভাবে বিমানবহর ও নৌবহর ছাড়া উপায় নাই। বর্ত্তমানে জাপানের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম চলিতেছে, তাহার উপর চোখ বুলাইলেই দেখা যাইবে যে, বিমানবহর ও নৌবহরের একান্ত অভাব। চীনের সরকারী সংবাদপত্রের তীক্ষ্ণ সমালোচনার সহজ অর্থ এই যে, বৃটিশ ও মার্কিণ কর্ত্তারা দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসমুদ্রে উপযুক্ত নৌবহর ও বিমানবহর দিতে ততখানি ইচ্ছুক নহেন। কারণ, তাঁহারা এশিয়ার যুদ্ধ অপেক্ষা ইউরোপের যুদ্ধকে অনেক বেশী গুরুত্ব দিতেছেন। ফলে grand strategy মার খাইতেছে grand tacticsএর অভাবে এবং এই grand tactics কখনও দানা বাঁধিতে পারে না, যদি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধকে রণনৈতিক গুরুত্ব (strategical importance) না দেওয়া হয়। বোধ হয় একারণেই মার্কিণ নৌবিভাগের বড়কর্ত্তা কর্ণেল নক্স কয়েক দিন আগে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের আসল শত্রু হিটলার। হিটলারের বিরুদ্ধে আগে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া তাহাকে সাবাড় করিতে হইবে এবং আসল শত্রু এভাবে শেষ হইলে নকল শত্রু জাপান আপনা হইতেই ধরাশায়ী হইবে! এতবড় রণনৈতিক সমস্যার একেবারে জলবৎ মীমাংসা! কিন্তু নক্স সাহেবের এই গ্রাণ্ড নক্সার চমৎকার জবাব দিয়াছেন 'সেন্ট্রাল ডেলী নিউজ'। পত্রিকাটি বলিতেছেন যে, জাপান যদি সমগ্র দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসমুদ্রের উপর আধিপত্য কায়েম রাখিয়া ব্রহ্ম দেশ, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনে একবার শক্ত হইয়া বসিতে পারে, তাহা হইলে তাহাকে হটাইতে গেলে কেবল প্রকাণ্ড নৌবহর ও বিমানবহরের প্রয়োজনই

ঘটিবে না, স্থলপথে প্রকাণ্ড সৈন্যদল পাঠাইতে হইবে এবং মিত্রশক্তি দুইটি বিশাল রণাঙ্গনে অর্থাৎ ইউরোপে ও এশিয়ায় একসঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইবেন। সোজা কথায় একদিকে জার্ম্মাণী ও আর একদিকে জাপানের বিরুদ্ধে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে একই সঙ্গে যুদ্ধ চালাইতে হইবে, যাহা একান্ত দুঃসাধ্য। সুতরাং সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমানের কার্য্য হইতেছে জাপানের বিরুদ্ধে অবিলম্বে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ। কারণ, ইউরোপে প্রচণ্ড শীত ও রুশ রণাঙ্গনে জার্ম্মাণীর অচল অবস্থার জন্য হিটলারের পক্ষে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে কোন বড় রকমের অভিযান চালানো সম্ভব নহে। জার্ম্মাণীর এই নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে জাপানকে প্রচণ্ড আঘাত দেওয়া উচিত এবং এই আঘাত হানিতে হইলে নৌবহর ও বিমানবহরের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগের দরকার। কিন্তু চার্চ্চিল ও রুজভেল্ট কি তেমন কোন পন্থা অবলম্বন করিবেন কিম্বা জাপানকে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে দেখিয়াও কেবল 'পশ্চাদপসরণে'র সংবাদেই শান্ত থাকিবেন?

গত ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে যখন পরিখা সংগ্রামের অচল অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল, তখন সেই অচল অবস্থা ভাঙ্গিবার জন্য 'পূর্ব্ব ও পশ্চিম রণাঙ্গনের' সমস্যা লইয়া মতভেদ দেখা দেয়। একদল বলেন যে, পশ্চিম রণাঙ্গনে যখন জার্ম্মাণীকে কাবু করা যাইতেছে না, তখন পূর্ব্বদিকে (প্রকৃত পক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে) অর্থাৎ তুরস্ককে আক্রমণ করা হউক। তুরস্ক ও অষ্ট্রিয়ার ভিতর দিয়া জার্ম্মাণীকে অপেক্ষাকৃত সহজে কাবু করা যাইবে। মিত্রপক্ষের সেনানীমণ্ডলীতে ইহা লইয়া ঘোরতর ঝগড়া বাধে। শেষ পর্য্যন্ত আপোষরফা হিসাবে স্যালোনিকা বা দার্দ্দানেলিসের অভিযানে জেনারেল হ্যামিল্টনকে পাঠানো হইয়াছিল। কিন্তু সেই অভিযান শোচনীয় ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়। এবারের সমস্যা অনুরূপ নহে। কারণ, এখানে পূর্ব্ব রণাঙ্গন বলিতে দূরবর্ত্তী দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া

বুঝাইতেছে। এবার জার্ম্মাণী মিত্রশক্তিকে ইউরোপের ভূভাগ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করিয়াছে। একমাত্র প্রত্যক্ষ যুদ্ধ চলিতেছে সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত এবং রাশিয়া কার্য্যতঃ একক সংগ্রাম চালাইতেছে জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে। সুতরাং চার্চ্চিল বা রুজভেল্ট যদি এমন যুক্তির আশ্রয় লন যে, তাঁহারা জার্ম্মাণীকে কাবু করিবার জন্যই সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতেছেন এবং সেই জন্যই দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ায় ততখানি মন দিতেছেন না, তবে বলিতে হইবে তাঁহারা অত্যন্ত ভুল হিসাব করিতেছেন। প্রকৃতপক্ষে শত্রু জার্ম্মাণী এবং জাপান উভয়েই; সামরিক দিক দিয়া ইহারা অত্যন্ত শক্তিশালী, সুতরাং উভয়কেই সমান আঘাত দিতে হইবে। জার্ম্মাণ জুজুর নাম করিয়া ইংলণ্ডে ৩০ লক্ষ বৃটিশ সৈন্যকে ঘরে বসাইয়া রাখা যেমন বুদ্ধির কাজ নহে, তেমনই প্রশান্ত মহাসাগরে অবিলম্বে প্রচুর বিমানবহর ও নৌবহর সম্মিলিত না করাও বুদ্ধি বা দূরদৃষ্টির পরিচায়ক নহে।

চতুর্থ অধ্যায়

সিঙ্গাপুরের পতন

(১)

দুই সমুদ্রের দুর্গদ্বার

২৪শে জানুয়ারী '৪২।

সমস্ত পৃথিবীর দৃষ্টি আজ একটি কেন্দ্রে সীমাবদ্ধ। এই কেন্দ্রের নাম সিঙ্গাপুর। আধুনিক কালের ইতিহাসে ইহা প্রচুর খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। বিগত শতাব্দীতে ১৮১৮০ সালে স্যার ষ্টামফোর্ড র‍্যাফ্‌লার নামক জনৈক ইংরাজ যখন এই ম্যালেরিয়া আধ্যুষিত দ্বীপে সিঙ্গাপুর সহরের পত্তন করেন, তখন বোধ হয় তিনি কল্পনাও করেন নাই যে, একদা ভাবীকালে পৃথিবীর প্রধান প্রধান রাষ্ট্রশক্তিগুলি এই সিঙ্গাপুরে মহাযুদ্ধের সিঙ্গা বাজাইবে! প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও ভারত মহাসমুদ্র, এই দুই মহাসাগরের নৌ-দুর্গ সিঙ্গাপুর। বৃটেনের প্রাচ্য সাম্রাজ্যের নৌ-সংগ্রামের রণনীতি এই দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এই
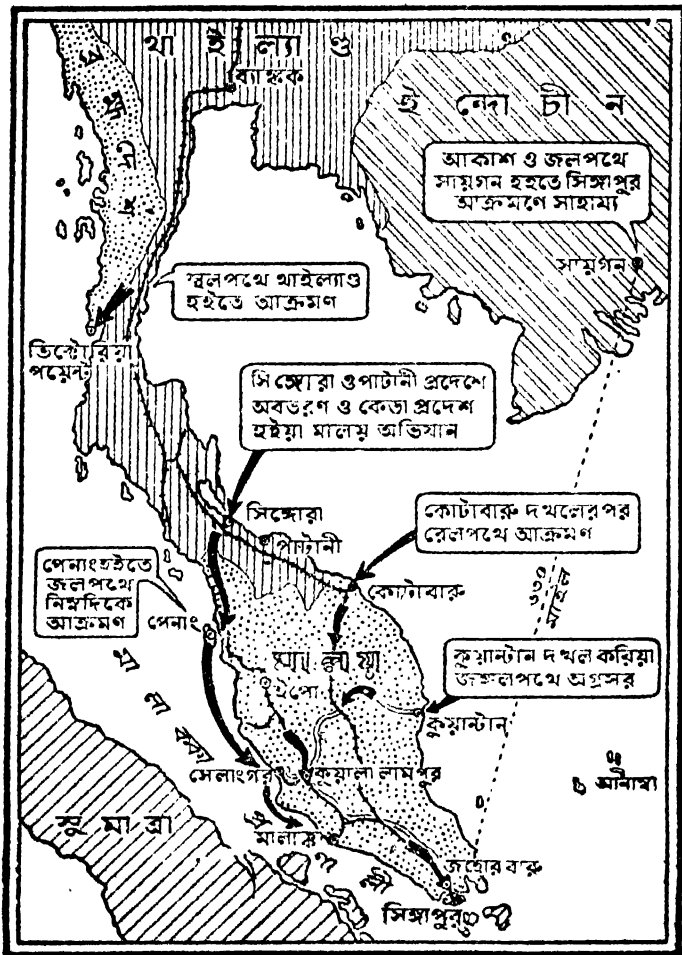
মালয়ে জাপ আক্রমণের গতি

সহরের পত্তন একজন সাধারণ ব্যক্তির দ্বারা, কিন্তু অসাধারণ ঐশ্বর্য্যশালী ব্যবসায়িগণ ইহাকে বিলাসের খ্যাতি দিয়াছে। বিগত মহাযুদ্ধের আগে এবং কিছু পরেও ইহা ছিল রূপসীদের লীলাকেতন এবং উচ্ছৃঙ্খল ধনীদের আড্ডা। বহু ছায়াচিত্রে সিঙ্গাপুরের বন্দরে নাবিক ও নাগরিকদের বিলাস-রজনীর দৃশ্য দেখা গিয়াছে। টিন ও রবারের ব্যবসা করিয়া এখানকার ইউরোপীয়গণ প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন। যদিও শ্বেতাঙ্গের সংখ্যা এখানে মুষ্টিমেয়, তথাপি ইহাদের প্রত্যেকেই টাকার কুমীর। বাসিন্দাদের মধ্যে শতকরা ৭৫জন চীনা, ৮জন ভারতীয় এবং ১২জন মালয় দেশীয়। চীনাদের মধ্যে কয়েকজন বড়লোক আছেন, কিন্তু দেশীয়দের দুর্দ্দশা আমাদের ভারতবর্ষের সাধারণ লোকদের মতই, তাহারা দরিদ্র মজুর মাত্র। আজ জাপানের দৃষ্টি পড়িয়াছে এই সিঙ্গাপুরের উপর। কেবল সামরিক লাভের জন্যই নহে, অর্থনৈতিক সম্পদ এখানে অপরিমিত। জন্তু-জানোয়ার, অরণ্য এবং টিন ও রবারের ঐশ্বর্য্যে মালয় উপদ্বীপ যে কোন ধনিক রাষ্ট্রের পক্ষে লোভনীয়। বৃটেন ও আমেরিকার প্রায় সমস্ত রবার ও টিনই সিঙ্গাপুর হইতে সরবরাহ হইয়া থাকে। গত বৎসরের মাঝামাঝি সময়ে একমাত্র মার্কিণ গবর্ণমেণ্টই সিঙ্গাপুর হইতে ৭৫ হাজার টন টিন এবং ৩ লক্ষ ৩০ হাজার টন রবার সরবরাহের জন্য ফরমায়েস দিয়াছিলেন। ইহা হইতেই সিঙ্গাপুরের ঐশ্বর্য্য ও অর্থনৈতিক গুরুত্ব অনুভূত হইবে। সিঙ্গাপুরের পতনের দ্বারা সমস্ত রবার ও টিন সরবরাহ বন্ধ হইয়া যাইবে।

যুদ্ধের ইতিহাস পর্য্যবেক্ষণ করিলে দেখা যাইবে উহার মূলে একটা প্রকাণ্ড অর্থনৈতিক কারণ রহিয়াছে। প্রাচীনকালে উহার নাম ছিল লুণ্ঠন। ভারতবর্ষ মণিমাণিক্য ও মসলিনের দেশ বলিয়া বিখ্যাত ছিল। সুতরাং 'শক হুন দল পাঠান মোগল' হইতে ইংরাজ-ওলন্দাজ পর্য্যন্ত সকলেই

এক একবার এই ভারত ভূমিতে হানা দিয়াছেন। প্রাচীনকালে যাহা দস্যুতা ও লুণ্ঠন নামে অভিহিত হইত আজ উহারই ভদ্রনাম হইয়াছে economic expansion অর্থাৎ অর্থনৈতিক রাজ্যবিস্তার। বড় বড় বুলি ও তত্ত্বকথার আবিষ্কার হইয়াছে বটে, কিন্তু আসলে যুদ্ধের একটা বড় কারণ যে লুণ্ঠন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এই লুণ্ঠন যখন ভদ্রভাবে এবং সঙ্ঘবদ্ধ আকারে দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিতে থাকে, তখন রাজনৈতিক পরিভাষায় উহাই শোষণ নাম ধারণ করে। জাপানের বর্ত্তমান আক্রমণের পিছনে রহিয়াছে এই শোষণের সুযোগ লাভ। জার্ম্মাণ রণপণ্ডিত ক্লজউইজ এই তথ্য প্রচার করিয়াছিলেন যে, গরীব দেশ আক্রমণ করিয়া লাভ নাই, কারণ যুদ্ধের খরচ পোষায় না! অর্থাৎ আক্রমণ ও দখল করিতে হইলে ঐশ্বর্য্যশালী দেশের দিকে নজর দাও। কারণ, যুদ্ধের খরচও পোষাইবে এবং ভবিষ্যতে কুবেরের ভাণ্ডারও পূর্ণ হইবে। রণনীতিকে এই অর্থনীতির মানদণ্ডে বিচার করিলে ব্রহ্মদেশ, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ নিশ্চয়ই জাপানের লক্ষীভূত বলিয়া ধরা যায় এবং সিঙ্গাপুরের নৌ-দুর্গ ঠিক এই মর্ম্মকেন্দ্রে দণ্ডায়মান। সুতরাং উহার গুরুত্ব কে অস্বীকার করিবে?

এই দ্বীপদুর্গ নির্ম্মাণের কাহিনী অতি সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া বলিতে পারা যায় যে, সিঙ্গাপুর নৌঘাঁটির নির্ম্মাণ-কার্য্য আরম্ভ হয় ১৯২৩ সালে। ১৯২৪ সালে বিলাতে শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের আমলে নির্ম্মাণ-কার্য্য স্থগিত থাকে। তারপর রক্ষণশীল দল পুনরায় ক্ষমতা লাভ করিলে নির্ম্মাণ-কার্য্য পুনরারম্ভ হয়। একমাত্র নৌঘাঁটিটি নির্ম্মাণ করিতেই ১ কোটি ১২ লক্ষ ১০ হাজার পাউণ্ড খরচ হয়। এতদ্ব্যতীত পাকা গাথুনী, বিমানশালা প্রভৃতি নির্ম্মাণে যে খরচ হয় তাহা ধরিলে মোট খরচের পরিমাণ ১ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড দাঁড়ায়। ১৯৩৯ সালে নির্ম্মাণ-কার্য্য শেষ হয়।

ফিলিপাইন
দ্বীঃ পুঃ
আমেরিকার নিকটতম
নৌ ঘাঁটি পার্ল হারবার
৩৩১৮ মাইলের দূরত্ব
গুয়াম
কা রো লি ন দ্বীঃ পুঃ
পূর্বদিকে জাপানের
পূর্ণ প্রভুত্ব হইবে
সিডনি
যুগান্তর
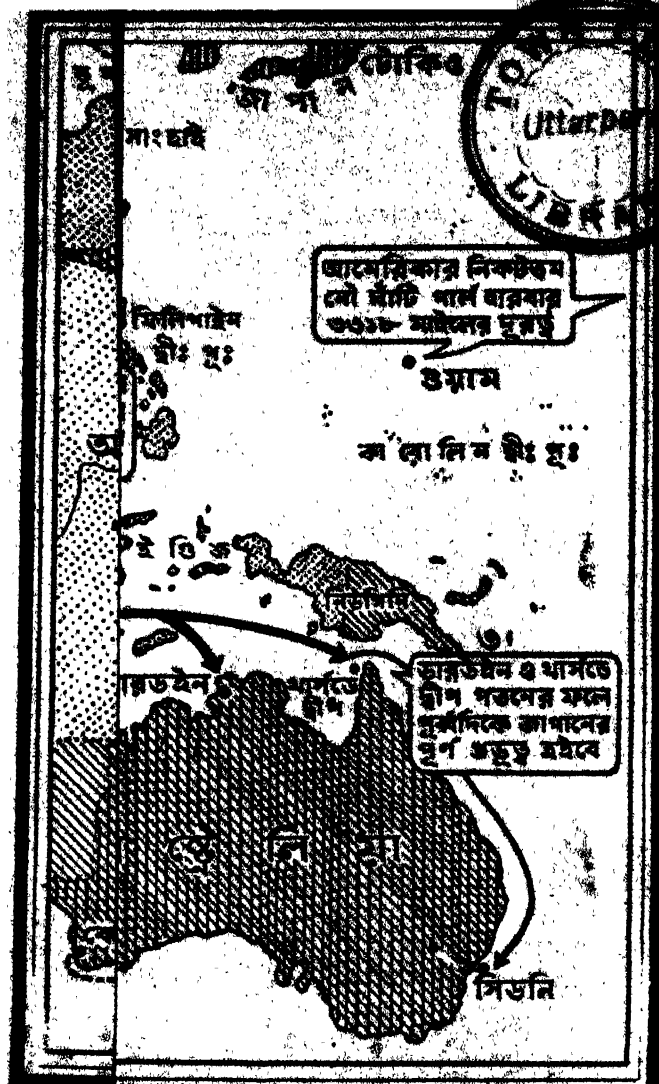
বৃটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে সিঙ্গাপুরের পোতাশ্রয়টির স্থান দ্বিতীয়। সর্ব্বাপেক্ষা বৃহত্তম পোতাশ্রয় হইতেছে স্যাদাম্পটনের কিং জর্জ দি ফিফ্‌থ পোতাশ্রয়। সিঙ্গাপুরের পোতাশ্রয়ে বৃহত্তম রণপোত আশ্রয় লইতে পারে। এখানে একটি ভসমান পোতাশ্রয় আছে, তাহাতে ৫০ হাজার টনের জাহাজ ধরে। উপকূলভাগে কামানশ্রেণীতে ১৫ ইঞ্চি ও ১৮ ইঞ্চি মুখের কামান আছে। এই কামানই পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম এখানে জাহাজ চালাইবার যে সমস্ত উপকরণ সংগৃহীত ছিল তাহাতে পৃথিবীর যে কোনও রণবহরের ছয় মাস চলিতে পারে। তৈলের ট্যাঙ্কগুলি অধিকাংশই মাটির তলায়। মাটির তলায় বহু অস্ত্র ভাণ্ডারও আছে। উপকূল ভাগস্থ অধিকাংশ পাহাড় কাঁটাতারের বেড়ায় ঘেরা। ১৯২৩ সালে সিঙ্গাপুর-জহোর সেতুটিও নির্ম্মিত হইয়াছিল।

সিঙ্গাপুরকে দুর্ভেদ্য নৌ-দুর্গরূপে গড়িয়া তুলিয়া বৃটেন প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরকে জাপ আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিবারই প্ল্যান করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল একটি মাত্র প্রকাণ্ড রকমের নৌঘাঁটি ও নৌদুর্গের দ্বারাই রণনৈতিক উদ্দেশ্য পূর্ণ করা যায় না। উহাকে কেন্দ্র করিয়া চারিদিকে যে সমস্ত নৌঘাঁটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সেই ঘাঁটিগুলিও যথেষ্ট পরিমাণ শক্তিশালী হওয়া দরকার এবং সেই ঘাঁটিগুলিকে রক্ষা করিবার জন্য উপযুক্ত নৌবহর ও বিমানবহরের প্রয়োজন। ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যাণ্ডে কতকগুলি ঘাঁটি আছে বটে, কিন্তু সেই ঘাঁটিগুলি জাপানের মত শক্তিশালী নৌ-যোদ্ধার আক্রমণ প্রতিহত করিতে পারে কিনা তাহাই বিচার্য্য। বৃটিশ রণনীতিবিদ্‌গণ সিঙ্গাপুরকে দুর্ভেদ্য নৌদুর্গে পরিণত করিয়া বুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন বটে, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সেই বুদ্ধি সর্ব্বত্র প্রসারিত হয় নাই। অর্থাৎ ভারতবর্ষকে কেবলমাত্র পরাধীন রাজ্যরূপে এবং অষ্ট্রেলিয়াকে কেবলমাত্র ডোমিনিয়ান

হিসাবে না দেখিয়া যদি প্রচুর যুদ্ধ-জাহাজ, বিমানবহর এবং অন্যান্য আধুনিক অস্ত্র ও যন্ত্রপাতিতে সুসজ্জিত করা হইত, তাহা হইলে অষ্ট্রেলিয়া ১০ হাজার মাইল ও ভারতবর্ষ ৬ হাজার মাইল দূর হইতে বৃটেনের নিকট কিম্বা ৮ হাজার মাইল দূরবর্ত্তী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নিকট করুণ আবেদনের জন্য অপেক্ষা করিত না। ডোমিনিয়ান ও সাম্রাজ্য চলিতেছে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং এই সাম্রাজ্য ও বাণিজ্য বৃদ্ধি আজ ধাক্কা খাইতেছে রণনীতির অদূরদর্শিতার মধ্যে। কেবল একটিমাত্র নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্রকে শক্তিশালী করিয়া বাকি অংশগুলিকে পরমুখাপেক্ষী করিয়া রাখিলে বিপদের গুরুত্ব সহজেই বাড়িয়া যায়। কারণ সেই একটিমাত্র কেন্দ্রের পতন হইলে বাকি অংশগুলি আপনা হইতে ভাঙ্গিয়া পড়ে। আধুনিক যুদ্ধের আক্রমণ চলে ঢেউয়ের পর ঢেউয়ের মত ক্রমাগত আঘাতের দ্বারা। এই রণকৌশলকে রোধ করিতে হইলে ঠিক পর পর আত্মরক্ষার কতকগুলি শক্তিশালী ঘাঁটির প্রয়োজন—কেবল একটি মাত্র দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রচারিত ঘাঁটির নহে! জলপথে যুদ্ধ-জাহাজের সহিত স্থলপথে ট্যাঙ্ক ও আকাশপথে এরোপ্লেন সম্মিলিত হওয়ায় ১৯১৪-১৮ সালের রণনৈতিক ধারণার প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কিন্তু এই প্রকাণ্ড পরিবর্ত্তনের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের রণনীতি প্রসারিত বা প্রাণপ্রদ হয় নাই। সুতরাং আজ সিঙ্গাপুরে প্রচণ্ড আঘাত হানিবার সঙ্গে সঙ্গে ভূকম্পের আলোড়নের মত অষ্ট্রেলিয়া, ব্রহ্মদেশ, ভারতবর্ষ, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনের মাটি কাঁপিয়া উঠিতেছে! অথচ অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট ডারুইন কিম্বা ভারতবর্ষের কলিকাতা সিঙ্গাপুর হইতে দেড় হাজার মাইল কিম্বা তাহারও অধিক দূরে! বৃটিশ রণনীতিবিদগণ কি পূর্ব্বে এই পরিণতির কল্পনা করিতে পারেন নাই? যদি সিঙ্গাপুরের পতন হয়, তবে জাপানী নৌবহর ও বিমানবহর অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে যেমন অল্প কয়েকদিনের
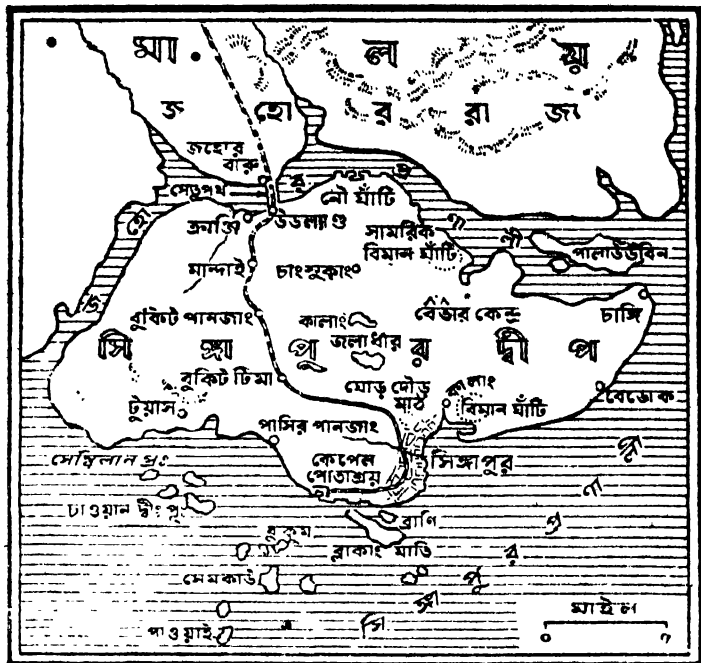
সিঙ্গাপুরের মানচিত্র

মধ্যেই উপস্থিত হইতে পারিবে, তেমনই প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবে এবং সুয়েজখাল ও এডেনের পর প্রাচ্য সীমানার সমগ্র নৌপথ জাপানীদের আওতায় আসিবে। ব্যবসায়-বাণিজ্য ও সমুদ্রপথের নির্ব্বিঘ্ন যোগাযোগের উপরেই স্াম্রাজ্যের ভিত্তি। সেই ভিত্তির মূলে আজ জাপান আঘাত হানিতেছে এবং সিঙ্গাপুর এই আঘাতের মর্ম্মকেন্দ্র। সুতরাং সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আজ এই নৌদুর্গের উপর।

চতুর্থ অধ্যায়

(২)

সিঙ্গাপুরের সংগ্রাম

৩১শে জানুয়ারী, '৪২।

জাপানীরা অতি দ্রুত সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রসর হইতেছে। জহোর রাজ্য ও সিঙ্গাপুর দ্বীপের মধ্যে যে সঙ্কীর্ণ প্রণালী আছে এবং যাহার উপর দিয়া একটি বাঁধানো রাস্তা চলিয়া গিয়াছে, একদিন আগে জাপবাহিনী সেই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তার মাত্র ১৮ মাইল দূরে ছিল। কিন্তু আজ সেই ব্যবধানও ঘুচিয়া গিয়াছে। সিঙ্গাপুরের বৃটিশ সেনাপতি ঘোষণা করিয়াছেন যে, মালয় ও জহোর রাজ্যের যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়াছে, এক্ষণে খাস সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ সুরু হইল। সিঙ্গাপুরের দ্বীপ ও দুর্গ এক্ষণে প্রত্যক্ষ স্থলপথের আক্রমণে রণক্ষেত্রে পরিণত হইল। 'পূর্ব্ব নির্দ্ধারিত পরিকল্পনা অনুসারে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনীকে দক্ষিণ জহোর হইতে সরাইয়া

সিঙ্গাপুর দ্বীপে আনা হইয়াছে। জহোর ও সিঙ্গাপুরের রাস্তা সাফল্যের সহিত ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। শত্রুপক্ষ ইহাতে কোন বাধা দেয় নাই। প্রায় দুই মাস ধরিয়া বৃটিশবাহিনী মালয়ে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছে। কিন্তু বিমানশক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং নৌপথে অবাধ গতির সুযোগ শত্রুকে যথেষ্ট সুবিধা দিয়াছে। এক্ষণে প্রাচ্যখণ্ডের এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধ অবরুদ্ধ সিঙ্গাপুর দ্বীপের দুর্গকেন্দ্রে আরম্ভ হইল। যতক্ষণ না আমরা অধিকতর সাহায্য পাই, ততক্ষণ শত্রুকে ঠেকাইয়া রাখাই আমাদের কর্ত্তব্য।'—ইহাই সিঙ্গাপুর হাই-কমাণ্ডের বাণী।

দক্ষিণ চীন সমুদ্র ও থাইল্যাণ্ড হইতে ৭ সপ্তাহ ধরিয়া জাপানীরা মালয়ের যুদ্ধ চালাইতেছে। সেখানকার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা এত দুর্ব্বল, ইহা আগে টের পাওয়া যায় নাই। সুতরাং যে সমস্ত বিশেষজ্ঞ অনুমান করিয়াছিলেন যে, টোকিও হইতে মালয় ও ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে ও শেষ করিতে দীর্ঘ সময় লাগিবে এবং ৬ মাস হইতে ১ বৎসরের আগে দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই সংগ্রাম শেষ হইবে না, তাঁহাদের সেই অনুমান আজ ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে। অনেক সময় পুঁথি-পত্র ও থিওরি ধরিয়া যুদ্ধ চলে না। সময় ও অবস্থার উপর ইহার গতি নির্ভর করে। জাপান যখন ডিসেম্বর মাসে অতর্কিত আক্রমণ আরম্ভ করে, তখন রণনীতির দিক্‌ হইতে জাপানের পক্ষে উহাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় ছিল। রাশিয়া ও বৃটেন বিব্রত এবং আমেরিকা অসতর্ক ছিল। জাপানী আক্রমণের আগে বিশেষজ্ঞগণ ধরিয়া লইয়াছিলেন যে, গুয়াম্, ওয়েক ও ফিলিপাইন দ্বীপ আমেরিকার হাতেই থাকিবে এবং সেখান হইতে মার্কিণ নৌবহর ও বিমানবহর দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে জাপানী শক্তির বিরুদ্ধে অবিলম্বে পাল্টা আক্রমণ চালাইয়া জাপনকে বিপদে ফেলিবে। ইতিমধ্যে সিঙ্গাপুর হইতে বৃটিশ নৌবহর হংকংয়ের

দিকে অগ্রসর হইয়া মার্কিণ নৌবহরের সহায়তায় জাপানকে ঘায়েল করিবে। থিওরী হিসাবে এই রণনৈতিক পরিকল্পনা চমৎকার ছিল। কিন্তু কার্য্যতঃ ইহার কিছুই ঘটিল না। জাপান এক সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে বৃটেন ও আমেরিকার সমস্ত ঘাঁটির উপর একযোগে এমন প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছে এবং এমন একটা মুহূর্ত্তে আঘাত হানিয়াছে যে, জাপানকে বাধা দেওয়ার সমস্ত দ্বীপ, ঘাঁটি ও বন্দর ইত্যাদি অতি দ্রুত হাতছাড়া হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে যুদ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী পরিকল্পনাও চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তবে, সমর বিশেষজ্ঞগণ যে সমস্ত সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন, তাহা আজ সত্য হইতে চলিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছিলেন, হংকং হাতছাড়া হইলে দক্ষিণ চীন-সমুদ্রে জাপ নৌবহরের আধিপত্য ঘটিবে। কারণ, এখান হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত ১৪০০ মাইল সমুদ্রপথ মুক্ত হইবে এবং ম্যানিলা, গুয়াম ও ওয়েক দ্বীপের পতন হইলে মার্কিণ নৌবহর অচল হইয়া পড়িবে। ইহার ফলে বৃটিশ ও মার্কিণ নৌবহর কোনও কেন্দ্রে পরস্পরের সহিত মিলিতে পারিবে না এবং জাপান তিন দিক হইতে সিঙ্গাপুর বেষ্টন করিবে। কিন্তু আজিকার অবস্থা এই পরিকল্পনার চেয়েও শোচনীয়। কারণ, সিঙ্গাপুরকে চারিদিক দিয়াই ঘিরিয়া ধরা হইতেছে এবং সর্ব্বাপেক্ষা বিপদের কারণ ঘটিয়াছে পশ্চাৎ হইতে আক্রমণের জন্য। রণনীতির জটিল তত্ত্বে প্রবেশ না করিয়াও সাধারণ বুদ্ধিতে এইটুকু বুঝা যায় যে, পশ্চাৎভাগ হইতে আক্রমণ সর্ব্বদাই ভয়াবহ। সিঙ্গাপুর নৌঘাঁটি ও নৌদুর্গ—উহা ম্যাজিনো লাইনের মত সুরক্ষিত বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা নৌযুদ্ধের নৌ-দুর্গকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছিল। উহার সম্মুখভাগ এবং দুই পার্শ্বের উপরই নজর রাখা হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরের তীরভূমিতে শ্রেণী-বদ্ধ দূর পাল্লার কামান, মেসিন গানের ঘাঁটি, বিমান ঘাঁটি, দুর্গের অবস্থান

এবং জলপথে মাইনের বেড়াজাল ইত্যাদি লক্ষ্য করিলেই এই তথ্য স্পষ্ট হইবে। কিন্তু মালয়ের ভিতর দিয়া ঢুকিয়া জহোর রাজ্য পার হইয়া পশ্চাৎ হইতে সিঙ্গাপুরকে স্থলপথের মারণযন্ত্রের দ্বারা আঘাত হানা হইবে, সিঙ্গাপুরের নৌযোদ্ধা ও নৌশিল্পীগণ এই ধারণা করেন নাই। ইহারই জন্য একখানি বিদেশী পত্রিকা মন্তব্য করিয়াছেন যে, মালয়ের ভিতর দিয়া সিঙ্গাপুরকে আক্রমণ যুদ্ধের ইতিহাসে একটা অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার হইবে। দুর্গ-প্রাকারের স্থিতিশীল যুদ্ধ আজ গতিশীল যান্ত্রিক সংগ্রামের পাল্লায় পড়িয়াছে।

লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, সিঙ্গাপুরের নিকট আজও জাপ নৌবহর সন্নিবেশের সংবাদ পাওয়া যায় নাই। অথচ সিঙ্গাপুর নৌদুর্গের অবস্থা ইতিমধ্যেই বিপন্ন হইয়াছে। ইহার কারণ কি? যে নৌ-রণনীতি কেন্দ্র করিয়া সিঙ্গাপুরকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া হইয়াছিল, তাহা নূতনতর যান্ত্রিক রণকৌশলের মুখে পড়িয়াছে এবং জাপানী রণপরিকল্পনা অগ্রসর হইয়াছে সিঙ্গাপুরের চারিদিকস্থ দ্বীপ, উপদ্বীপ, স্থলপথ ও জলপথ পরিবেষ্টনের দ্বারা। ইন্দোচীন জাপানের আওতায় যাইবার পরেই বৃটিশ কর্ত্তৃপক্ষের সচেতন হওয়া উচিত ছিল। তাঁহাদের বুঝা উচিত ছিল যে, বিপদের প্রথম সঙ্কেত ওখান হইতেই পাওয়া যাইতেছে। সেই সময় শ্যামদেশ বা থাইল্যাণ্ডের উপর বৃটিশ সামরিক কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হইলে আজ এত সহজে পশ্চাৎ হইতে সিঙ্গাপুর বিপন্ন হইত না। মালয়ের যুদ্ধে জাপানীরা মোটামুটি তিন দিক ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল। পূর্ব্ব ও পশ্চিমের দুই তীর এবং মধ্য মালয়ের মাঝামাঝি পথ। তীরভূমি, রেলওয়ে, রাস্তা, জঙ্গল ও নদী এইগুলি তাহাদের গতিপথে ছিল। আজ সিঙ্গাপুরের উপর তাহারা দক্ষিণ মালয় ও জহোরের তিন দিক ধরিয়াই আক্রমণ করিতেছে। পূর্ব্বতীরস্থ পন্টিয়ান বেসার হইতে কতকগুলি রাস্তা সিঙ্গাপুর

ও জহোরবারুর প্রধান সড়কের সঙ্গে মিলিয়াছে। একদল জাপবাহিনী এই দিক দিয়া অগ্রসর হইতেছে। আর একদল সৈন্য কুলাই হইতে জহোরবারু হইয়া জহোরবারু-সিঙ্গাপুরের উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি রাস্তা ধরিয়া আক্রমণ করিতেছে। তৃতীয় দল পশ্চিম দিকের রাস্তা ধরিয়া এবং যে রাস্তা জহোরবারুর দিকে গিয়াছে, সেখান দিয়া অগ্রসর হইতেছে। পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্য—এই তিন দিকের বাহিনী একত্রে সিঙ্গাপুরের দুর্গকে বল্লমের অগ্রভাগের মত বিদ্ধ করিতে চাহিতেছে। শত্রু যখন এত দ্রুত এত নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে এবং আত্মরক্ষাকারী সমস্ত সাম্রাজ্য-বাহিনী খাস সিঙ্গাপুরে সরাইয়া আনা হইয়াছে, তখন বাধ্য হইয়াই অবরোধ যুদ্ধ চালাইতে হইবে। যতক্ষণ প্রচুর সৈন্য, সমরোপকরণ ও যন্ত্র ইত্যাদি আসিয়া না পৌছিতেছে, ততক্ষণ এই অবরোধের মধ্যে থাকিয়া আত্মরক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নাই। মিঃ চার্চ্চিল ঘোষণা করিয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের প্রতি ইঞ্চি জমিতে জাপানকে শেষ রক্তবিন্দু দিয়া বাধা দেওয়া হইবে। এজন্য যথোপযুক্ত সাহায্যও প্রেরণ করা হইতেছে। আজ সমগ্র পৃথিবী ইহার ফলাফল দেখিবার জন্য উৎকণ্ঠিত।

চতুর্থ অধ্যায়

(৩)

সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষা

৪ঠা ফেব্রুয়ারী, '৪১।

আদিম মানুষকে গিরিগুহাতে আশ্রয় লইতে হইত জন্তু-জানোয়ার এবং শীত গ্রীষ্ম, ঝড়-বৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক 'শত্রু'র হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য। বাহির হইতে আক্রমণ এবং ভিতর হইতে আত্মরক্ষা, এই মূল নীতিরই ক্রমবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে মানুষের সহিত মানুষের লড়াইয়ে। আক্রমণ করিতে গেলেও সর্ব্বাগ্রে দরকার আত্মরক্ষা, অর্থাৎ নিজের বাঁচিয়া থাকা প্রয়োজন। আবার আত্মরক্ষার জন্যও শেষ পর্য্যন্ত দরকার হয় পাল্টা আক্রমণেরই! এই সহজ সূত্র ধরিয়াই যুগে যুগে রণনীতির জটিলতর পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন ঘটিয়াছে এবং ইহার সঙ্গে রাশি রাশি অজস্র রকমের অস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় যুদ্ধের সমস্যা গভীরতররূপ ধারণ করিয়াছে। আত্মরক্ষার যে স্বাভাবিক

বুদ্ধি হইতে আদিম মানুষ গিরিগুহাতে আশ্রয় লইত, সেই বুদ্ধিই ক্রমশঃ রণনীতির দিক দিয়া কেল্লা ও দুর্গের মধ্যে প্রসারিত হইয়াছে। ইতিহাসে এমন ঘটনা বহু আছে, যখন দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ এবং মাসের পর মাস দুর্গের মধ্যে থাকিয়া সৈন্যেরা আত্মরক্ষা করিয়াছে এবং শত্রুর অবরোধ বেষ্টনীকে ভাঙ্গিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিয়াছে। আগেকার দিনে পাথরের তৈয়ারী দুর্গগুলিকে ভাঙ্গা সহজ ছিল না, সেদিনের অস্ত্র সহজে পাথর ভাঙ্গিতে পারিত না। এজন্য শত্রুপক্ষ সর্ব্বদাই দুর্গদ্বারের উপর আক্রমণের এবং উহা ভাঙ্গিবার চেষ্টা করিত। কিন্তু বারুদ ও গোলাগুলির আবিষ্কারের ফলে কেবল দুর্গদ্বার নহে, সমগ্র দুর্গই চূর্ণ হইবার আশঙ্কা দেখা দিল। আবার এই গোলাগুলিকে রোধ করিবার জন্য ইস্পাত, লোহা, কংক্রীট ইত্যাদি বহু প্রকার দ্রব্য ও মালমশলা ক্রমে দুর্গগুলিকে আরও শক্ত এবং দৃঢ় করিয়া তুলিল। দুর্গপ্রাকার ও কেল্লার গাঁথুনি ইত্যাদি কি পরিমাণ পুরু করিলে কত ওজনের গোলাবর্ষণ রোধ করিতে পারিবে—রণনীতির নিকট এমন অনেক সমস্যা দেখা দিল। অর্থাৎ আঘাতের প্রচণ্ডতা এবং আত্মরক্ষার সহনশীলতা এই দুইয়ের ক্রমদ্বন্দ্ব চলিতেছে। সৈন্যের পক্ষে যেমন ইহা সত্য, দুর্গের পক্ষেও ইহা তেমন সত্য। এই দ্বন্দ্বের চরম পরীক্ষা গিয়াছে ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধে। মেসিনগানের অজস্র গুলিবর্ষণ এবং বড় বড় কামানের প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ—পরিখা ও কেল্লার পরীক্ষা হইয়াছে এই দুইয়ের দ্বারা। এই অভিজ্ঞতা হইতে যুদ্ধের পরবর্ত্তীকালে ফ্রান্সে ম্যাজিনো লাইন তৈয়ারী হইয়াছিল। বোমা ও গোলাবর্ষণের হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য এই নূতনতম দুর্গশ্রেণীকে পাতালপুরীর কেল্লায় পরিণত করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য যে, ১৯১৪-১৮ সালে যান্ত্রিক যুদ্ধের বীজ মাত্র অঙ্কুরিত হইয়াছিল, আজিকার

দিনে উহার যে ভয়াবহ পরিণতি ঘটিয়াছে, তাহা তখন অনেকের কল্পনায়ই ছিল না।* ফলে দুর্গগুলির পশ্চাতে যে স্থিতিশীল যুদ্ধের নীতি ও ধারণা বহু যুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাই বজায় ছিল। কিন্তু ১৯৪০ সালে হিটলারের দুর্দ্ধর্ষ যান্ত্রিক বাহিনী এই স্থিতিশীল যুদ্ধের স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দেয় এবং ইতিহাস-প্রসিদ্ধ সেডানে তাহারা ফ্রান্সের আত্মরক্ষার ব্যূহ অতি দ্রুত চূর্ণ করিয়া ফেলে। বোমারু বিমানেব অগ্রগতিব জন্য বড় বড় যুদ্ধ-জাহাজের মূল্য কতটুকু, ইহা যেমন সমর-বিশেষজ্ঞদের গবেষণার বিষয়, তেমনই আধুনিক গতিশীল যান্ত্রিক যুদ্ধের যুগে বড় বড় দুর্গ ও কেল্লার প্রয়োজন কতখানি, তাহাও বিতর্কের বিষয়।

কিন্তু সিঙ্গাপুরের সমস্যা কেবলমাত্র দুর্গের নহে, উহার সহিত সমুদ্র সংযুক্ত থাকায় এই প্রশ্নটি কিঞ্চিৎ অভিনব ও জটিল। ফলে এখানবার স্থলপথে যেমন তেমনই বিমানপথে ও জলপথেও প্রচণ্ড সংগ্রামের কাহিনী আমরা পাইব। সাধারণতঃ দুর্গের সংগ্রাম চলে অবরোধ যুদ্ধকে কেন্দ্র করিয়া এবং ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুরে অবরোধ আরম্ভ হইয়াছে। জাপানীরা কি পরিমাণ ট্যাঙ্ক দক্ষিণ মালয়ে আমদানী করিতে পারিয়াছে এবং ট্যাঙ্ক যুদ্ধের কতটা অবসর আছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে, বিমানবহর ও নৌবহরের শ্রেষ্ঠতা তাহাদের অনস্বীকার্য্য। কিন্তু অবরোধ যুদ্ধ কেবল বেষ্টনী হইতে প্রত্যক্ষ আক্রমণ কেন্দ্র করিয়াই চলে না, উহার অন্যতর কৌশল হইতেছে বাহির হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য প্রাপ্তির পথ বন্ধ করা। ইহার মধ্যে জল ও খাদ্যদ্রব্য একটি মস্ত বড় প্রশ্ন। ইতিমধ্যেই সিঙ্গাপুরে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে—প্রচুর জল ও প্রচুর খাদ্য পাওয়া যাইবে তো? ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক দুর্গের পতন হইয়াছে শুধু এই পানীয় জল ও খাদ্যের অভাবে। সর্ব্বপ্রকার অস্ত্রশস্ত্র এবং সৈন্যদের সংগ্রাম শক্তি অটুট থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র সরবরাহের অভাবে বহু

দুর্বিপাক আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদলের ঘটিয়াছে। প্রায় প্রত্যেক দেশের ইতিহাস খুঁজিলেই এমন দৃষ্টান্ত অনেক পাওয়া যাইবে। এই সেদিন হংকংয়ের পতনের মূলেও পানীয় জলের অভাবের উপর জোর দেওয়া হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরের জহোর প্রণালীর সেতুপথটি ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় জল সরবরাহের পাইপ নষ্ট হইয়াছে। এজন্য কর্তৃপক্ষ উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন। প্রকাশ যে, এই সামস্যা মিটিয়াছে যথোপযুক্ত কূপ খননের দ্বারা। খাদ্য দ্রব্যও নাকি প্রচুর মজুত হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের অবরোধ এই যান্ত্রিক যুগে দীর্ঘকাল চলিবে বলিয়া মনে হয় না। এখানকার রণনৈতিক প্রশ্ন দুইটি বিষয়ের উপর নির্ভর করিতেছে—জাপান কি পরিমাণ শক্তি লইয়া কত দ্রুত সিঙ্গাপুরের উপর প্রচণ্ড আঘাত হানিতে পারিবে এবং বৃটেন কতকাল সেই আঘাত সহ্য করিয়া নূতন অস্ত্র, নূতন সৈন্য ও নূতন মাল মশলা আমদানি করিতে পারিবে? বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার কর্তৃপক্ষ অবশ্য প্রতিশ্রুতি ও ভরসা দিয়াছেন যে, অতি দ্রুত সর্ব্বপ্রকারের সাহায্য সিঙ্গাপুরে পৌছিতেছে। সিঙ্গাপুরে মিত্রপক্ষ পরাজয় স্বীকার করিবেন না, ইহাই তাঁহাদের পণ। কারণ, সিঙ্গাপুরের পতন হইলে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানের যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে এবং যে শক্তি জাপান অর্জ্জন করিবে, তাহাতে আগামী দীর্ঘকাল জাপান অপরাজেয় থাকিবে। সুতরাং সমগ্র জগৎ প্রত্যাশা করিতেছে যে, মিত্রপক্ষ সিঙ্গাপুরকে শেষ পর্য্যন্ত অজেয় রাখিবেন।

চতুর্থ অধ্যায়

(৪)

সিঙ্গাপুরে অবতরণ

৬ই ফেব্রুয়ারী, '৪২।

•

পূর্ব্বদিকে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে ব্রহ্মদেশ যেমন বাহিরের ঘাঁটি এবং সেই ঘাঁটির পতন হইলে ভারতবর্ষের বিপদ যেমন অনিবার্য্য, তেমনই জলপথে সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার বহির্ঘাঁটি ছিল হংকং। রণনীতিবিদ্‌গণ বরাবর বলিয়া আসিয়াছেন যে, হংকংয়ের পতন হইলে বৃটিশ নৌবহরকে দক্ষিণ চীন-সমুদ্র হইতে হটিয়া আসিতে হইবে এবং দূর হইতে জাপ নৌবহরকে বাধা দেওয়ার যে সুযোগ তাহাও বিনষ্ট হইবে। ইহার সঙ্গে স্থলপথে আক্রান্ত হওয়ার ফলে সিঙ্গাপুরের বিপদ চতুর্গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। এক একং স্থানের রণনীতি ও রণ-কৌশল সেই স্থানের অবস্থা (local conditions) ভিত্তি করিয়া গড়িয়া উঠে।

সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ছিল সম্মুখের দিকে অর্থাৎ সমুদ্রের দিকে। এই ঘাঁটি নৌপথের আক্রমণ ও আত্মরক্ষাকে লক্ষ্য রাখিয়াই তৈয়ার করা হইয়াছিল। কিন্তু শত্রু আজ আসিয়াছে স্থলপথে এবং একথা বলাই বাহুল্য যে, জলপথেও শত্রুপক্ষ প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিবে। অবস্থার গুরুত্ব আরেক দিক দিয়াও লক্ষ্য করিবার মত। সিঙ্গাপুর একটা বড় দ্বীপ নহে, উহা দৈর্ঘ্যে ২৭ মাইল এবং প্রস্থে ১৪ মাইল মাত্র। এই ছোট ভূমির উপর শত্রুপক্ষ সহজেই তাহাদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করিতে পারিবে। এই যুদ্ধ অত্যন্ত হিংস্র ও ভয়াবহ হইবে। অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র রণক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত প্রচণ্ড আক্রমণ ও তীব্র প্রতিরোধ যুদ্ধ চলিবে।

সিঙ্গাপুরের অল্প পরিসর ভূখণ্ডের পশ্চাতে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে জাপ স্থলবাহিনী। জাপানীরা দাবী করিতেছে যে, সিঙ্গাপুরের উপর তাহাদের সর্ব্বপ্রকার আক্রমণ একযোগে আরম্ভ হইয়াছে এবং কিছু কিছু জাপ সৈন্যও নাকি অবতরণ করিয়াছে। আর একটি প্রশ্ন লক্ষ্য করিবার এই যে, সিঙ্গাপুরে যে তিনটি বিমান ঘাঁটি ছিল, সেগুলি কোন কাজেই লাগিতেছে না। কারণ, যে জহোর প্রণালী মাত্র দুই মাইল চওড়া, শত্রু তাহারই অপর পারে। শত্রুর এই নিকটবর্ত্তিতার জন্য সিঙ্গাপুরের তিনটি বিমান ঘাঁটির একটিও ব্যবহার করা যাইতেছে না। ঘাঁটিগুলি খোলা বা exposed, অর্থাৎ জাপানী গোলা বা বোমার ইহা সহজ লক্ষীভূত। অথচ ঘাঁটির সুবিধা না থাকিলে বিমানবহরের পক্ষেও উপযুক্ত আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কার্য্য চালানো কঠিন। অপর পক্ষে জাপানীরা দক্ষিণ মালয়ের বিমান ঘাঁটিগুলির সুবিধা পাইতেছে এবং তাহারা ক্রমাগত ছোঁ মারা বিমান ব্যবহার করিতেছে। তাহারা প্রচুর বিস্ফোরক বোমা ফেলিতেছে এবং নীচু দিয়া উড়িয়া গিয়া মেসিনগান চালাইতেছে। সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলাই ইহার উদ্দেশ্য এবং এই

উদ্দেশ্যে কেবল বিমান নহে, কামানের ব্যবহারও চলিতেছে প্রচুর। উভয় পক্ষের গোলন্দাজবাহিনী সক্রিয় হইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের মহাযুদ্ধ গিয়াছে প্রধানতঃ গোলাগুলির যুদ্ধ। পদাতিকবাহিনীর আক্রমণ ও অগ্রগতির আগে বড় বড় কামান হইতে প্রচুর গোলাবর্ষণ করা হইত এবং সেই গোলাবর্ষণের আড়াল ধরিয়া সৈন্যদল অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিত। সেবারের মহাযুদ্ধে এক একটি রণক্ষেত্রে এমনও দেখা গিয়াছে যে, ক্রমাগত ৭ দিন ধরিয়া অজস্র কামানের গোলা দিনরাত্রি বর্ষিত হইয়াছে। হাজার হাজার টন গোলা এক একটি রণক্ষেত্রে নিঃশেষিত হইয়াছে। এই গোলাবর্ষণই পদাতিক দলের আক্রমণকে আসন্ন বলিয়া ঘোষণা করিত। এবারের মহাযুদ্ধে এই রণকৌশলের যথেষ্ট পরিবর্ত্তন হইয়াছে। বোমারু বিমানের অগ্রগতিই এই পরিবর্ত্তনের কারণ। অনেক সময় গোলাবর্ষণের দ্বারা যে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়, বোমাবর্ষণের দ্বারাও তাহা চরিতার্থ হইয়া থাকে। দ্রুত এবং ক্ষিপ্র আক্রমণের পক্ষে কামান অপেক্ষা বিমানের উপযোগিতা অনেক বেশী। বিশেষতঃ দূরত্বের ব্যবধান ঘুচাইয়াছে আধুনিক বিমান। পূর্ব্বে দীর্ঘতম দূর পাল্লার কামান যে কাজ করিত আজ সেই কাজ করিতেছে বোমারু বিমান। এই কারণে এবারের যুদ্ধে অগ্রবর্ত্তী গোলন্দাজবাহিনীর কার্য্য করিতেছে বোমারু বিমানের ঝাঁক। তাহারা আগুনে-বোমা ও বিস্ফোরক-বোমা ফেলিয়া এবং উপর হইতে মেসিনগান চালাইয়া প্রতিপক্ষের মধ্যে বিহ্বলতা সৃষ্টি করে, আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনে। কিন্তু জহোর বারু হইতে সমগ্র সিঙ্গাপুর দ্বীপ একান্তরূপে কামানের পাল্লার মধ্যে। বোমাবর্ষী বিমানের সঙ্গে গোলাবর্ষী কামানের সহযোগিতা চলিতেছে। এই অবস্থার মধ্যে যাহারা আজ সিঙ্গাপুর দ্বীপ রক্ষা করিতেছে, তাহাদের ধৈর্য্য, সাহস ও বীরত্ব অপরিসীম। জাপ সমর-শক্তির সমগ্র প্রচণ্ডতার মুখে সিঙ্গাপুর-রক্ষাকারিগণ দণ্ডায়মান। এই

অবরোধ যুদ্ধ পৃথিবীর ইতিহাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করিবে। যদি আত্মরক্ষাকারিগণ এই সঙ্কটজনক অবস্থা সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিতে পারে, তবে রণনীতির দিক দিয়া তাহারা অশেষ কীর্ত্তি অর্জ্জন করিবে।

* *

*

১০ই ফেব্রুয়ারী '৪২।

সিঙ্গাপুরের উপর স্থলপথে প্রত্যক্ষ আক্রমণ সুরু হইয়াছে। জাপানী সৈন্যেরা সিঙ্গাপুর দ্বীপের পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কিম্বা উত্তর-পূর্ব্বে ও উত্তর-পশ্চিমে রাত্রির অন্ধকারে অবতরণ করিয়াছে। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী আকাশ যখন নক্ষত্রখচিত এবং অন্ধকার যখন গাঢ় ছিল, তখন জাপ সৈন্যেরা নৌকাযোগে সিঙ্গাপুরের দুই প্রান্তিক অংশে অবতরণ করে। সিঙ্গাপুর দ্বীপের উত্তর-পূর্ব্ব প্রান্তে পুলাউ উবিন নামক ৫ মাইল লম্বা একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে। এই ছোট্ট দ্বীপটি সিঙ্গাপুর ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব-প্রান্তিক মালয়ের মধ্যবর্ত্তী কিম্বা জহোর প্রণালীর পূর্ব্ব দিকস্থ প্রবেশপথে অবস্থিত। পশ্চিম অংশে তাহারা ক্রানজিতে অবতরণ করিয়াছে, অর্থাৎ তাহারা জহোর প্রণালীকে পশ্চিম দিক দিয়া অতিক্রম করিয়াছে এবং এই অংশ জঙ্গল, জলাভূমি ও রবারের বনে সমাকীর্ণ। যে সমস্ত জাপানী সৈন্য সিঙ্গাপুর-ভূমিতে নামিয়াছে, তাহাদের সংখ্যা জানা যায় নাই। তবে প্রকাশ যে, তাহারা ট্যাঙ্ক লইয়া আসিয়াছে। ট্যাঙ্কের মত ভারী জিনিষ নৌকাযোগে আনা সহজ ব্যাপার নহে, এইজন্য সংবাদদাতাগণ এই খবরে বিস্ময় প্রকাশ করিয়াছেন। নৌকাগুলিও আবার সাধারণ নহে, সাম্রাজ্যবাহিনীর গুলি বর্ষণকে উপেক্ষা

করিয়াই নৌকাগুলি তীরভূমিতে পৌঁছিয়াছে। নৌকাগুলি নাকি বর্ম্মের দ্বারা সুরক্ষিত। জাপানীদের পক্ষে জহোর প্রণালী অতিক্রম করিতে পারা অত্যন্ত দুঃসংবাদ। কারণ, তীরবর্ত্তী আত্মরক্ষার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া না পড়িলে অথবা তীরভূমি হইতে পশ্চাদপসরণে বাধ্য না হইলে শত্রুর পক্ষে সিঙ্গাপুরে অবতরণ সম্ভব হইত না। ইহার উপকূলভাগে ১৫ ইঞ্চি ও ১৮ ইঞ্চি মুখের কামান শ্রেণী সজ্জিত আছে, ইহা ছাড়া মেসিনগানের ব্যূহ তো আছেই। এই সমস্ত কামান পৃথিবীর বৃহত্তম কামানগুলির অন্যতম। ইহা সত্ত্বেও ক্ষুদ্র সিঙ্গাপুর দ্বীপে নৌকাযোগে জহোর প্রণালী পার হইয়া জাপানীদের দুই দিকে আক্রমণ অত্যন্ত অভিনব সন্দেহ নাই। জাপানীরা পূর্ব্ব দিকে যেখানে অবতরণ করিয়াছে, সেই অংশ ও জহোর প্রণালীর সেতুপথের প্রায় মাঝামাঝি স্থানে সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত নৌঘাঁটি। কিন্তু এই ঘাঁটি আজ যুদ্ধ-জাহাজের দ্বারা পরিত্যক্ত। কারণ, শত্রুর এত নিকটে জাহাজ থাকিলে বোমা বা গোলা দিয়া সহজেই সেগুলিকে তাহারা ধ্বংস করিতে পারিত। সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত ভাসমান ডক বা পোতাশ্রয়, যাহাতে পৃথিবীর বৃহত্তম যুদ্ধ-জাহাজ আশ্রয় লইতে পারে, সেই ডকটি জলে ডুবাইয়া দেওয়া হইয়াছে। শত্রুর হাতে পড়িবার সম্ভাবনাতেই ডকটি নষ্ট করিতে হইল। একমাত্র খাস ইংলণ্ড ছাড়া পূর্ব্ব এশিয়ায় আর এত বড় পোতাশ্রয় ছিল না। অবশ্য যেখানে নৌবহর নাই সেখানে নৌঘাঁটির মূল্য সামান্য, আবার যেখানে নৌঘাঁটি নাই, সেখানে নৌবহরের মূল্যও সামান্য। আজ সিঙ্গাপুরের যে অবস্থা তাহাতে এই বহু মূল্যবান ডকের জন্য আপশোষ করিয়া লাভ নাই। কারণ, সিঙ্গাপুর দুর্গ সামরিক দিক হইতে জীবন-মৃত্যুর সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়াছে; কতকাল আত্মরক্ষা সম্ভব, আজিকার দিনে ইহাই একমাত্র প্রশ্ন।

সিঙ্গাপুরের দুই অংশে জাপানীরা অবতরণ করিয়াছে, ইহার উদ্দেশ্য

সিঙ্গাপুরকে দুই পার্শ্ব হইতে ঘিরিয়া ধরা। কোনও বড় রকমের ঘাঁটি আক্রমণ করিতে হইলে কেবল একটিমাত্র বিন্দু হইতেই আঘাত হানিলে চলিবে না। কয়েকটি স্থান হইতে একযোগে আক্রমণ চালাইতে হইবে। যে দুই অংশ হইতে জাপানীরা আক্রমণ চালাইতেছে উহার মধ্যবর্ত্তী দূরত্ব বোধ হয় ১০ মাইলের বেশী নহে। যদি ইহাকে দুই বাহুরূপে কল্পনা করা যায়, তবে স্বীকার করিতে হইবে যে, এই দুই বাহুর পরস্পর বিচ্ছেদ-সীমা অতি সামান্য। সিঙ্গাপুর দ্বীপ ক্ষুদ্র বলিয়াই ইহার উপর দুই পার্শ্বদেশের চাপ এত ঘন ও নিকটবর্ত্তী হইয়াছে। কেবল পূর্ব্বে ও পশ্চিমে জাপানীরা অবতরণ ও আক্রমণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, তাহারা উত্তরাংশে—ইহাকে আমরা মধ্যবর্ত্তী অংশ বা সম্মুখভাগ বলিয়া ধরিতে পারি—প্রবল ও প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়াছে। সিঙ্গাপুরের এই অংশের আত্মরক্ষাকারিগণ ইতিমধ্যেই পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা সম্ভবতঃ আরও দক্ষিণে হটিয়া সমুদ্রতট হইতে কিছু দূরে দাঁড়াইয়া জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করিবে। কিন্তু এই প্রতিরোধ ততক্ষণ শক্তিশালী থাকিবে যতক্ষণ মালাক্কা প্রণালীর উপর বৃটেনের পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে। প্রকাশ যে, সুমাত্রায় বৃটেনের বিমান ঘাঁটির জন্য মালাক্কা প্রণালীতে আজও জাপান প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে নাই। ইহা কিঞ্চিৎ আশার কথা। যদি জাপানীরা মালাক্কাতেও অবিলম্বে কর্ত্তৃত্ব খাটাইতে পারে, তবে সিঙ্গাপুরের পশ্চাতের পার্শ্বদেশও বিপন্ন হইবে এবং তাহা মারাত্মক হইবে। জাপ নৌবহর সিঙ্গাপুরের পূর্ব্বদিকস্থ জলপথে পৌঁছিলেও অনুরূপ বিপদ দেখা দিতে পারে। তবে, এই অঞ্চলে জাপ নৌবহরের বিশেষ কোন তৎপরতার সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না। সিঙ্গাপুরকে রক্ষার জন্য অভূতপূর্ব্ব আয়োজন হইয়াছে এবং একটি পিপালিকাও উহাতে ঢুকিতে পারিবে না, এমন বিজ্ঞাপন দীর্ঘকাল

প্রচারিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরের গঠন প্রণালী নৌ-যুদ্ধের উপযোগী, স্থলপথের আক্রমণের কোন কল্পনা ইহাতে ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, যান্ত্রিক সংগ্রামের যুগে এত অল্প পরিসর ভূমিতে কেবল ইট, পাথর, ইস্পাত ও কংক্রীটের আড়ালে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালানো কঠিন। কেহ কেহ এই প্রসঙ্গে অবশ্য লেনিনগ্রাদ, মস্কো ও তোব্রুকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু এই স্থানগুলির সঙ্গে সিঙ্গাপুরের তুলনা হয় কিনা, আমরা জানি না। তোব্রুককে ঘিরিয়া রাখিয়া এবং ডিঙ্গাইয়াই জার্ম্মাণবাহিনী লিবিয়ার পূর্ব্ব সীমানায় পৌঁছিয়াছিল। সিঙ্গাপুরের উপর জাপ আক্রমণ-পদ্ধতি তোব্রুকের মত নহে এবং তোব্রুকে জার্ম্মাণীর আক্রমণ জাপানের মত এত প্রচণ্ড হয় নাই। উহার সমারিক ও ভৌগোলিক অবস্থা অন্য ধরণের। আর লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর চারিদিকে সিঙ্গাপুরের তুলনায় অনেক বেশী বিস্তৃত ভূমিখণ্ড ছিল; ক্ষুদ্র অপেক্ষা বিস্তৃততর ভূমিতে সৈন্য চালনা ও সৈন্য খেলাইবার অনেক বেশী সুবিধা পাওয়া যায়। বিশেষতঃ লেনিনগ্রাদ ও মস্কো রক্ষায় সোভিয়েট রাষ্ট্রের যে পরিমাণ শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল, সিঙ্গাপুরে তাহার একান্ত অভাব। ইহার অর্থ এই নহে যে, সিঙ্গাপুর রক্ষাকারিগণ যথেষ্ট দৃঢ়তা, সাহস বা নৈপুণ্যের সহিত লড়িতেছেন না। ইহার সহজ অর্থ লেনিনগ্রাদ ও মস্কো রক্ষায় যে পরিমাণ সৈন্য, কামান, বন্দুক, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ইত্যাদি নিয়োজিত হইয়াছিল, সিঙ্গাপুরে ততখানি সংখ্যা ও পরিমাণের শক্তি সমাবেশ করিতে পারা যায় নাই। ক্রীটের মত সিঙ্গাপুরেও বিমানশক্তির অভাব এবং আধুনিক যুদ্ধে এরোপ্লেনের প্রচুর সহযোগিতা না পাইলে যুদ্ধ স্বভাবতঃই অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল হইয়া উঠে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে, জহোর প্রণালীর দুই তীরে উভয় পক্ষের গোলন্দাজবাহিনী সক্রিয় হইয়াছে এবং জাপ গোলন্দাজের সহিত

বিমানবহর সহযোগিতা করিতেছে। গোলা ও বোমার এই প্রচণ্ড বর্ষণকে আড়াল করিয়াই জাপ সৈন্যেরা প্রণালী পার হইতে ও সিঙ্গাপুরের মাটিতে পৌঁছিতে চেষ্টা করিবে। সরকারীভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, অবিশ্রান্ত প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ করিয়া জাপানী সৈন্যরা রাত্রিবেলা সিঙ্গাপুরে অবতরণ করিয়াছে। এই গোলাবর্ষণ এত ভয়াবহ হইয়াছে যে, বিগত মহাযুদ্ধের পশ্চিম রণাঙ্গনের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালে কামানের গোলাবর্ষণই ছিল পদাতিক দলের অগ্রগতি ও আক্রমণের সঙ্কেত। এবারের যুদ্ধে সেই ভূমিকায় নামিয়াছে বোমারু বিমান। কিন্তু সর্ব্বত্র একমাত্র বোমারু বিমানের দ্বারা একই প্রকারের ফল লাভ করা যায় না। বিশেষতঃ লক্ষ্যবস্তু যখন ৮।১০ বা ১৫ মাইলের মধ্যে, তখন উহা একান্তরূপে কামানের পাল্লার অন্তর্গত। এত নিকট হইতে কামান দাগিয়া সমস্ত কিছু বিধ্বস্ত করার চেষ্টাই স্বাভাবিক এবং বোমারুর চেয়েও কামানই এই নিকটতর লক্ষ্যের পক্ষে সহায়ক। সিঙ্গাপুরের উপর এই প্রচণ্ড গোলাবর্ষণ বৃটিশবাহিনীকে ১৯১৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি তারিখ স্মরণ করাইয়া দিবে। পশ্চিম রণাঙ্গনে মাত্র ২৭ হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বরের মধ্যে বৃটিশবাহিনী ৬৫ হাজার টন পরিমাণ গোলাবারুদ নিঃশেষ করিয়াছিল! এবার সিঙ্গাপুরে কত টন গোলাগুলি নিঃশেষ হইবে, কে জানে? জাপানীরা সিঙ্গাপুরের উপর একযোগে কামনের গোলা, বোমারুব বোমা এবং মেসিনগানের গুলি বর্ষণ করিতেছে। সুতরাং একথা বলা অনাবশ্যক যে, সিঙ্গাপুরে অতি গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে এবং উভয় পক্ষে হিংস্র ও নির্ম্মম যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হইতেছে। এই গোলাগুলী হইতে আত্মরক্ষার জন্য সৈন্যগণ পরিখার নীচে আশ্রয় লইয়াছে এবং জাপানীরা এই পরিখা ভাঙ্গিবার জন্য 'মর্টার' ব্যবহার করিতেছে। মর্টার শ্রেণীর কামান সুরক্ষিত দুর্গ প্রাকার

ও পরিখা ধ্বংসের জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, জাপানীরা তাহাদের তূণীরের সমস্ত অস্ত্রই একে একে সিঙ্গাপুরের উপর চালাইতেছে। ইহার ফলাফল সারা পৃথিবীতে অপরিসীম কৌতূহল ও উদ্বেগ জাগাইবে

চতুর্থ অধ্যায়

—o—

(৫)

সিঙ্গাপুরের দুর্ভাগ্য

১২ই ফেব্রুয়ারী '৪২।

যাঁহারা মালয়ের সামরিক অবস্থা এবং সিঙ্গাপুর দ্বীপে জাপ আক্রমণের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সিঙ্গাপুরের পতন অপ্রত্যাশিত ছিল না। কিন্তু সেই পতন যে এত দ্রুত হইবে, ইহা কেহ অনুমান করেন নাই। অন্ততঃ দুই তিন সপ্তাহ সিঙ্গাপুরে প্রচণ্ড ও ভয়াবহ সংগ্রাম চলিবে, এমন অনুমান অনেকেই করিয়াছিলেন। কিন্তু বিস্ময়ের কথা এই যে, মাত্র ৩।৪ দিনের মধ্যেই সিঙ্গাপুরের দুর্ভাগ্য ঘনাইয়া আসিল। সিঙ্গাপুরের নৌদুর্গ যেমন সামরিক জগতে এক অভূতপূর্ব্ব বিস্ময় বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, তেমনি এই দুর্গের এত আকস্মিক পতনও সামরিক ইতিহাসে বিস্ময়কর বলিয়া বিবেচিত হইবে। মালয়ে জাপ আক্রমণ

ও অগ্রগতির লক্ষণ দেখিয়া একথা অনুমান করা গিয়াছিল যে, সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত নৌঘাঁটি ফ্রান্সের সুবিখ্যাত ম্যাজিনো লাইনের মতই শেষ পর্য্যন্ত অকেজো বলিয়া প্রমাণিত হইবে। অবশ্য সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ এখনও শেষ হয় নাই, কিন্তু উহার অবসানে আর বিলম্ব নাই। কোটি কোটি টাকা খরচ করিয়া যে সুবৃহৎ নৌঘাঁটি তৈয়ার করা হইয়াছিল এবং যেখানে বৃহত্তম যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব্ ওয়েল্স' ও 'রিপালস্' আসিয়া মাত্র ৭ দিন অবস্থান করিয়াছিল, সেই ঘাঁটি আজ বৃটিশবাহিনী স্বেচ্ছায় নিজ হাতে ধ্বংস করিয়া দিয়াছে। মজুত খাদ্যদ্রব্য, যন্ত্রপাতি ও সামরিক দিক হইতে অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষ নষ্ট করিয়া ফেলা হইয়াছে। যাহাতে শত্রুর হাতে কোন মূল্যবান জিনিষ না পড়ে, সেজন্য 'পোড়া মাটি'-নীতি অনুসৃত হইয়াছে। এই দুর্গের বিপন্ন সৈন্য ও আনুষঙ্গিক জিনিষপত্র জাহাজযোগে অন্যত্র সরাইয়া ফেলা হইতেছে। সম্ভবতঃ জাভা, সুমাত্রা বা দূরবর্ত্তী অষ্ট্রেলিয়ার দিকে প্রস্থান করিতে হইবে। ইহা ছাড়া গত্যন্তর নাই। হংকং দখলের আগে জাপানীরা উহার আত্মসমর্পণের দাবী করিয়াছিল এবং হংকংয়ের পানীয় জলাধার বিপন্ন হইয়াছিল। সিঙ্গাপুরেও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে। বিনাসর্ত্তে সমগ্র বাহিনীর আত্মসমর্পণ দাবী করা হইয়াছে এবং পানীয় জলের যে দুইটি প্রকাণ্ড আধার ছিল, অন্ততঃ উহার একটি জাপানীদের হাতে পড়িয়াছে। জহোর প্রণালীর সেতুপথ যখন ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, তখনই সিঙ্গাপুরে জলকষ্ট দেখা দিবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল। আজ সমস্ত দিক দিয়াই সিঙ্গাপুরের দুর্ভাগ্য পরিস্ফুট।

সিঙ্গাপুরের পশ্চিম ও উত্তর দিকে (মধ্যবর্ত্তী) ধরিয়া যে সমস্ত জাপ সৈন্য অবতরণ করিয়াছে, তাহারাই সিঙ্গাপুর সহরকে বিপন্ন করিয়াছে। এই দুই অংশে বাধা দেওয়া হইয়াছে প্রচুর। কিন্তু জাপানীরা কামান,

মেসিনগান, ট্যাঙ্ক ও বিমান একযোগে ব্যবহার করিয়া আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদলকে হটাইয়া দিয়াছে এবং সহরের একাংশে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তর দিকে নৌঘাঁটি হইতে ঘোড়দৌড়ের মাঠ দিয়া পাসির পানজাং পর্য্যন্ত রেখা টানিলে যে লাইন পাওয়া যাইবে সাম্রাজ্যবাহিনী সেই রেখা ধরিয়া জাপানীদিগকে বাধা দিতে চাহিয়াছিল। জাপানীরা জহোর প্রণালীর ভগ্ন সেতুর পুনরায় নির্ম্মাণ করিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। কারণ, লণ্ডন হইতে স্বীকার করা হইয়াছে যে, জাপ সৈন্যেরা ঐ সেতু পথ আংশিকভাবে ব্যবহার করিতে পারিতেছে। আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধে ইস্পাত ও কংক্রীটে সুরক্ষিত ঘাঁটি যে আর দুর্ভেদ্য থাকিতেছে না এবং দুর্গ প্রাকারের স্থিতিশীল যুদ্ধ যে গতিশীল সংগ্রামের পাল্লায় পড়িয়া ব্যর্থ হইতে বসিয়াছে, রণনীতির এই তথ্যের উপর বহুবার জোর দেওয়া হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের দ্রুত পতনের মূলে এই রহস্য রহিয়াছে। এই রহস্য বিশ্লেষণ করিলে কয়েকটি সূত্র পাওয়া যাইবে—(১) সিঙ্গাপুর মূলতঃ নৌঘাঁটি ও নৌদুর্গ বা নৌযুদ্ধের উপযোগী, কিন্তু আক্রমণ ঘটিয়াছে স্থল-পথে। (২) সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষার ও আক্রমণের ব্যবস্থা সম্মুখভাগে কিম্বা সমুদ্রের দিকে। আক্রমণ ঘটিয়াছে একান্তরূপে পশ্চাৎ দিক হইতে যাহা স্বভাবতঃই রণকৌশলের দিক হইতে বিপজ্জনক। (৩) কেল্লা বা দুর্গের যুদ্ধ স্থিতিশীল (war of position), আধুনিক যুদ্ধ একান্তরূপে যান্ত্রিক ও গতিশীল, অর্থাৎ বিপরীত রণনীতির পাল্লায় ইহা পড়িয়াছে। এই ধরণের রণকৌশলের বিরুদ্ধে লড়িবার জন্য গভীরতর ও বিস্তৃততর ব্যূহের প্রয়োজন (defence in depth) এবং সেই ব্যূহের মধ্যে গতিশীল পাল্টা আক্রমণের ব্যবস্থা থাকা দরকার। (৪) গোলাগুলি ও অস্ত্রবলে (fire power) জাপানীরা শ্রেষ্ঠ, বিশেষভাবে বিমানশক্তিতে জাপানীরা সিঙ্গাপুরে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কোন প্রকার বিমান সাহায্য ও নৌবহরের সাহায্য

সিঙ্গাপুরে পৌঁছিতে পারে নাই এবং জাপ আক্রমণ এত দ্রুত ও দুর্দ্ধর্ষ হইয়াছে যে, মিত্রপক্ষকে কোন প্রকার অবসরও দেওয়া হয় নাই। এই সমস্ত কারণে সিঙ্গাপুরের সাম্রাজ্যবাহিনী দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াও জাপানকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। যে নৌদুর্গ পৃথিবীর বিস্ময়রূপে গড়িয়া উঠিয়াছিল, উহা অধিকতর বিস্ময় ও বেদনা বহন করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িল!

* *

*

নৌদুর্গ জয়ে জাপানীদের একটা বৈশিষ্ট্য আছে। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে রুশ-জাপান যুদ্ধে পোর্ট আর্থার বন্দর আক্রমণ ও জয় সামরিক ইতিহাসে প্রসিদ্ধ হইয়া আছে। ইহার সহিত সিঙ্গাপুর নৌদুর্গের ইতিহাস যুক্ত হইল। কিন্তু পোর্ট আর্থার দখলের দ্বারা রুশ-জাপান যুদ্ধের অবসান হইয়া থাকিলেও সিঙ্গাপুরের সাফল্যের দ্বারা ইঙ্গ-মার্কিণ-জাপ যুদ্ধের অবসান হইবে না। বর্ত্তমান রাশিয়ার দক্ষিণ রণাঙ্গন বা উক্রাইনের সহিত কতকটা তুলনা দিয়া বলা যায় যে, কিয়েভ, ওডেসা, খারকোভ, রষ্টোভ, ক্রিমিয়া ইত্যাদি একে একে সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি দখল করিয়াও জার্ম্মাণী যেমন দক্ষিণ রণাঙ্গনের সংগ্রাম শেষ করিতে পারে নাই, উহাকে আরও দূরে ককেশাস ও ইরাণ পর্য্যন্ত অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিতে হইয়াছিল, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সংগ্রাম সম্পর্কেও এমন কথা বলা যায়। হংকং মালয়, সিঙ্গাপুর ইত্যাদি রণক্ষেত্রেই এই সংগ্রামের চূড়ান্ত মীমাংসা হইতেছে না। জাপানকে আরও অগ্রসর হইতে হইবে। সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ ইত্যাদি দেশের দিকে হাত বাড়াইতে হইবে এবং রণক্ষেত্র ক্রমশঃ বিস্তৃততর হইবে। সুতরাং জাপানের যুদ্ধ সিঙ্গাপুরের সীমায়ই শেষ হইতেছে না।

চতুর্থ অধ্যায়

—— ০ ——

(৬)

সিঙ্গাপুরের আত্মসমর্পণ

১৬ই ফেব্রুয়ারী '৪২।

মিত্রশক্তি ও ভারতবর্ষের পক্ষে সিঙ্গাপুরের পতন সংবাদ গভীরতর বেদনা ও উদ্বেগ বহন করিয়া আনিতেছে। যদিও সিঙ্গাপুরের পতন অপ্রত্যাশিত ছিল না এবং উহার অনিবার্য্যতা সম্পর্কে পূর্ব্বেই আভাষ দেওয়া হইয়াছিল, তথাপি এইটুকু ক্ষীণ আশা ছিল যে, সিঙ্গাপুর রক্ষার জন্য মিত্রশক্তি তাঁহাদের সর্ব্বপ্রকার শক্তি প্রয়োগ করিবেন। দুই কারণে তাহা সম্ভব হয় নাই। প্রথমতঃ জাপানীরা অতি দ্রুত এমন কৌশলে অগ্রসর হইয়াছে যে, অধিকতর সাহায্য পাঠাইবার সুযোগ ও সুবিধা ছিল না। সিঙ্গাপুরের উপর জাপ বিমান ও কামানের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় জাহাজযোগে সিঙ্গাপুরে পৌছানো সম্ভব ছিল না।

দ্বিতীয়তঃ সিঙ্গাপুরের অবস্থা সঙ্কটপূর্ণ হওয়ায় মিত্রপক্ষ উহার আশা ছাড়িয়া দিয়া তাঁহাদের শক্তি সম্ভবতঃ ব্রহ্মদেশ রক্ষায় নিয়োগ করিয়াছেন। কারণ, ব্রহ্মদেশের সহিত চীন ও ভারতবর্ষের ভাগ্যসূত্র জড়িত। সিঙ্গাপুর সংগ্রামের সামরিক বৈশিষ্ট্য লইয়া আগে আমরা বহু আলোচনা করিয়াছি, এখানে উহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। শেষের ৩।৪ দিন সিঙ্গাপুরের আত্মরক্ষাকারিগণ অত্যন্ত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার সহিত লড়িয়াছেন। জাপানীদের দুর্দ্ধর্ষ আক্রমণের মুখে তাঁহারা যথাসম্ভব বীরত্ব ও ধৈর্য্যের সহিত বাধা দিয়াছেন। কিছু কিছু ট্যাঙ্কও তাঁহারা আমদানী করিয়াছিলেন এবং যুদ্ধ-জাহাজের সাহায্যও কিছু পাইয়াছিলেন। ইহা দ্বারা শেষরক্ষা হয় নাই, জাপানীদের শক্তি সমস্ত দিক দিয়াই অত্যন্ত বেশী ছিল। জাপ কামানগুলি যখন পোতাশ্রয়ের উপর গোলাবর্ষণ ও আধিপত্য বিস্তার করে তখনই সিঙ্গাপুরে আর সাহায্য পাঠানো সম্ভব ছিল না। কারণ জাহাজগুলি তীরে ভিড়িতে কিম্বা ঘাঁটির অভাবে সৈন্য ও মাল মশলা নামাইতে পারিত না। অন্তিম মুহূর্ত্তে সিঙ্গাপুরের কর্ত্তৃপক্ষ যে সমস্ত সংবাদ পাঠাইলেন, তাহাতে জানা যায় যে, জল, খাদ্য, গোলাবারুদ ও পেট্রোলের অভাবের দরুণ আর প্রতিরোধ চালানো সম্ভব হয় নাই। সাড়ে তিন মাইল স্থানের মধ্যে ১০ লক্ষ লোক আসিয়া জড়ো হইয়াছিল এবং জল সরবরাহ ব্যবস্থা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল যে, আর ২৪ ঘণ্টার বেশী টিকিয়া থাকার সম্ভাবনা ছিল না। সিঙ্গাপুরের সেনাপতি লেঃ জেনারেল পার্সিভ্যাল আর যুদ্ধ চালানো অসম্ভব বিবেচনা করিয়া জাপানীদের নিকট বিনাসর্ত্তে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। সিঙ্গাপুরের গবর্ণর স্যার সেন্টন টমাসও সস্ত্রীক বন্দী হইয়াছেন। ফোর্ডের মোটর কারখানায় বসিয়া আত্মসমর্পণের আলোচনা চলিয়াছিল। হংকং হইতে যেমন সমস্ত সৈন্য ও সেনাপতিসহ পশ্চাৎ অপসরণ সম্ভব ছিল না,

সিঙ্গাপুরেও তেমন অবস্থারই সৃষ্টি হইয়াছিল। খাস সিঙ্গাপুর দ্বীপে মাত্র ৭ দিন যুদ্ধ হইয়াছে। কত সৈন্য ও সমরোপকরণ জাপানীদের হাতে ধরা পড়িয়াছে, তাহা জানা যায় নাই। তবে জাপানীদের মতে সিঙ্গাপুরে ১৫ হাজার বৃটিশ, ১৩ হাজার অষ্ট্রেলিয়ান ও ৩২ হাজার ভারতীয় সৈন্য ছিল। ১৬ই ফেব্রুয়ারী সোমবার সকাল ৮ ঘটিকায় ট্যাঙ্ক বাহিনীকে সম্মুখে রাখিয়া জাপানী সেনাপতি লেঃ জেনারেল ইয়ামাসিটা সিঙ্গাপুর সহরে প্রবেশ করেন এবং প্রত্যেকটি অট্টালিকায় উদীয়মান সূর্য্যের (জাপানী জাতীয় পতাকা) পতাকা উড়ানো হয়।

প্রায় ২০ বৎসর ধরিয়া সিঙ্গাপুর ঐতিহাসিক দুর্গরূপে দুর্ভেদ্য বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। এই দুর্গ নির্ম্মাণের জন্য বৃটেনের প্রতি জাপানের সন্দেহ ও আক্রোশের অন্ত ছিল না। ইহারই উপর নির্ভর করিয়া রক্ষণশীল বৃটিশ রণনীতিবিদ্‌গণ পূর্ব্ব এশিয়া ও ভারতবর্ষের নিরাপত্তা সম্পর্কে দিবাস্বপ্ন রচনা করিয়াছিলেন। আজ সেই স্বপ্ন একান্ত রূঢ় ও প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! ১৯০৪ সালের পোর্ট আর্থারের মত ১৯৪২ সালের সিঙ্গাপুর নৌদুর্গের গর্ব্ব ও মহিমা প্রচার করিতেছিল। পোর্ট আর্থারের পতন ঘটে দুর্দ্ধর্ষ ও নিপুণ নৌযুদ্ধের দ্বারা, আর সিঙ্গাপুরের বিপদ ঘটিল প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত ধারায়! অদৃষ্টের বিড়ম্বনায় সিঙ্গাপুর হাত ছাড়া হইয়া গেল আকাশ ও স্থল পথের আক্রমণের দ্বারা। এই তথ্য হইতেই বৃটিশ রণনীতির ত্রুটি, শৈথিল্য ও দুর্ব্বলতা ধরা পড়িবে। স্পষ্টবক্তা মিঃ চার্চ্চিল সিঙ্গাপুরের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই সমগ্র পৃথিবীর উদ্দেশ্যে ঐক বেতার বক্তৃতা দিয়া নিজেদের পরাজয় ও দুর্ভাগ্য অকপটে স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার বাগ্মিতা চমৎকার। কিন্তু রণনীতি ও বাগ্মিতা এক বস্তু নহে। মিঃ চার্চ্চিল বলিতেছেন যে, তিনি যুক্তির দ্বারা একথা বিশ্বাস করিতে পারেন নাই যে, জাপান ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির

বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণায় সাহসী হইবে। অথচ এই বক্তৃতার অন্যত্র তিনিই উল্লেখ করিয়াছেন যে, গত ২০ বৎসর ধরিয়া দুর্দ্ধর্ষ জাপ সমর-নীতিবিদ্‌গণ এই সুযোগই খুঁজিতেছিলেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া তাঁহারা প্রচণ্ড ও ব্যাপক যুদ্ধ যাত্রার আয়োজন করিতেছিলেন এবং মিঃ চার্চ্চিলের মতে জাপানীরা অসাধারণ যোদ্ধা, অমিতবিক্রমশীল—জলে, স্থলে, আকাশে তাহাদের শক্তি অভূতপূর্ব্ব। তাহারা নৃশংস, বেপরোয়া, বিশ্বাসঘাতক ও নিপুণ এবং এশিয়ায় তাহারা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা। শত্রুর এই শক্তি যাহাতে আমরা হীন না ভাবি, সেইজন্য তিনি সতর্ক করিয়া দিয়া বলিতেছেন :—

No one must underrate any more the gravity and efficiency of the Japanese war machine. Whether in the air or upon the sea or man to man on land they have already proved themselves to be the most formidable, deadly and I am sorry to say, barbarous antagonists.

মিঃ চার্চ্চিলের মুখে এই ভাষা! ইহার আগে তিনি বলিয়াছেন যে, প্রশান্ত মহাসমুদ্রে ইঙ্গ-মার্কিণ বাঁধ ভাঙ্গিয়া জাপানী শক্তি যেন বন্যার মত সমস্ত কিছু ভাসাইয়া দিয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, কিম্বা পর্ব্বতগাত্র হইতে যেন ভয়াবহ তুষারস্তূপ চারিদিকে ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে! আজ হংকং, মালয় ও সিঙ্গাপুরে বিদ্যুৎগতি পরাজয়ের পর মিঃ চার্চ্চিল ও তাঁহার সেনাপতিগণ জাপ সমরশক্তির ক্রূরতা সম্পর্কে সচেতন হইয়াছেন এবং সিঙ্গাপুরের এই শোচনীয় দুর্ভাগ্য সম্পর্কে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া কেবল জাপানীশক্তির ভয়াবহতার বিজ্ঞাপন দিয়াছেন! কিন্তু ইহা কি যুক্তি ও দূরদৃষ্টির কথা? তাঁহার এই বক্তৃতা বিশ্লেষণ করিলে মোটামুটি তিনটি বিষয় পাওয়া যায়—(১) জাপ সমর শক্তির প্রচণ্ডতা সম্পর্কে বৃটেনের অজ্ঞতা ও অবিশ্বাস, (২) নানা রণক্ষেত্রে ও বিভিন্ন সমুদ্রে বৃটিশ শক্তির বিক্ষিপ্ততা এবং (৩) বিশাল মার্কিণ

যুক্তরাষ্ট্রের ভাবী সংগ্রামশীলতার উপর নির্ভরতা। ধাপে ধাপে এই প্রশ্নগুলির বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, মিঃ চার্চ্চিলের বক্তৃতায় ভরসা পাওয়ার মত বস্তু সামান্যই আছে। তিনি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন যে, আগামী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত (১৯৪৩সাল পর্য্যন্ত তো বটেই) বহু লাঞ্ছনা, বহু পরাজয় এবং বহু প্রকার দুর্গতি আমাদের ঘটিবে। মিঃ চার্চ্চিল সেই শ্রেণীর নিপুণ চিকিৎসক, যিনি ঘড়ি ধরিয়া বলিয়া দিতে পারেন রোগীর আয়ু আর কতক্ষণ আছে! কিন্তু ব্যাধি ও যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা কেবল আয়ুর মিয়াদই জানিতে চাহি না, কিভাবে আমরা বাঁচিতে পারিব, তাহা জানাই আমাদের আসল লক্ষ্য। কেন পরাজয় হইয়াছে এবং আরও কত পরাজয় আমাদের অদৃষ্টে আছে, এই তথ্য জানা নিশ্চয়ই আমাদের উচিত। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা এবং একমাত্র কথা এই যে, আমরা জাপানকে কিভাবে হারাইতে পারিব? মিঃ চার্চ্চিল আমেরিকার দোহাই দিয়াছেন এবং ভবিষ্যতের উপর ভরসা রাখিয়াছেন। কিন্তু যে রণনীতিবিদ্‌গণ গত ২০ বৎসর ধরিয়া জাপানী সমরায়োজনের তথ্য জানা সত্ত্বেও সিঙ্গাপুর, হংকং ও মালয়কে এমন অরক্ষিত অবস্থায় রাখিতে পারেন এবং যে সেনাপতিগণ উপযুক্ত বিমানবহরের সাহায্য ছাড়া দুইখানি বৃহত্তম রণতরীকে বোমারুর মুখে ঠেলিয়া দেন, যাঁহারা নৌবহর ও বিমানবহরের সমাবেশ ছাড়া এই যান্ত্রিক সংগ্রামের যুগে কেবল পদাতিকবাহিনী পাঠাইয়া আত্মরক্ষার আত্মপ্রসাদ অনুভব করেন, তাঁহাদের হিসাব যে ভবিষ্যতেও সত্য ও নিখুঁত বলিয়া প্রমাণিত হইবে, এতখানি ভরসা আমরা কিভাবে পাইব? বৃটেনের যাঁহারা যুদ্ধ চালনা করিতেছেন, তাঁহাদের কৈফিয়ৎ নানাস্থানে নানা যুক্তি খাটাইতেছে। লিবিয়া সম্পর্কে তাঁহারা আবহাওয়ার দোষ দিতেছেন, ডোভার প্রণালী সম্পর্কে মেঘ ও বৃষ্টির উপর দায়িত্ব চাপাইয়াছেন, আর হংকং-সিঙ্গাপুরের

যুদ্ধ সম্পর্কে নিজেদের আয়োজনহীনতার অপরাধ স্বীকার করিতেছেন এবং ইউরোপ-এশিয়ার সমগ্র রণাঙ্গনের প্রত্যেকটি সম্পর্কে অন্য রণাঙ্গনে সাহায্য পাঠাইবার যুক্তি দেখাইতেছেন! দূরদর্শী রাজনীতিক ও রণনীতিক আমরা তাঁহাকেই বলিব, যিনি শত্রুপক্ষের সমগ্র শক্তি ও আয়োজন সম্পর্কে সচেতন এবং সেই অবস্থানুযায়ী সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা যথা-সময়ে অবলম্বন করেন। কিন্তু এই মানদণ্ডের বিচারে মিঃ চার্চ্চিলের মন্ত্রিসভার যোগ্যতা কতটুকু এবং ১৯৩৯ সাল হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মন্ত্রিসভা কয়টি রণক্ষেত্রের জয় দাবী করিতে পারেন? অথচ বিস্ময়ের কথা মিঃ চার্চ্চিলই ভাবী যুদ্ধের বিভীষিকা সম্পর্কে মিঃ বল্‌ডুইনের আমল হইতে চীৎকার করিয়া আসিতেছেন।......

*　*
*

সিঙ্গাপুরের পতনের পর পৃথিবীর সর্ব্বত্র নিদারুণ উৎকণ্ঠা ও গবেষণা দেখা দেয়। মালয়ে ও জাভায় প্রত্যক্ষদর্শী যাঁহারা ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ উহার পতনের কারণ লইয়া নানা মতামত প্রকাশ করেন। পাঠকদের সুবিধার জন্য এখানে 'রয়টারে'র বিশেষ সংবাদ-দাতার একটি মনোজ্ঞ বিশ্লেষণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বাটাভিয়া হইতে 'রয়টারে'র বিশেষ সংবাদদাতা লিখিতেছেন :—

"বৃটিশ সৈন্যগণ এবং বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যগণ সিঙ্গাপুর দ্বীপে যে বীরত্ব সহকারে শত্রুকে প্রতিরোধ করিতেছিল তাহাতে দুই দিন আগে সামান্য একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল। অকস্মাৎ সেই আশা চূর্ণ হইয়া গেল এবং সেই জন্যই সিঙ্গাপুরের ক্ষতিটা আরও বেদনাদায়ক।

জাপানীরা বোর্ণিও হইতে সোজাসুজি সুমাত্রায় পালেম্বাংয়ে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সিঙ্গাপুর একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। কাজে কাজেই ডানকার্ক, গ্রীস এবং ক্রীট হইতে যে ভাবে সৈন্য ও সমরসম্ভার সরাইয়া আনা হইয়াছিল সিঙ্গাপুরের বেলায় তাহা করা সম্ভব হয় নাই। বিমান বিভাগের অধিকাংশ পাইলট এবং কর্ম্মচারীই পলাইয়া আসিয়াছে; কিন্তু স্থল-সৈন্য বিভাগের লোকক্ষয় এবং রণসম্ভার ক্ষয় নিশ্চয়ই খুব বেশী হইয়াছে। নৌ-বিভাগের কিছু কিছু মজুদ দ্রব্যসম্ভারও বিনষ্ট হইয়াছে।

দৃঢ়তার সহিত বলা হইতেছে বটে যে, সিঙ্গাপুরে যতদূর সম্ভব সবই ছারখার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি জাপানীরা যে সিঙ্গাপুরে বেশ ভাল রকমের অগ্রবর্ত্তী নৌ ও বিমানঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহা করার পর জাপানীরা সেখানে বসিয়া উত্তর সুমাত্রা এবং মালাক্কা প্রণালীর উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে ও অবাধে ভারত মহাসাগরে ও জলপথে রেঙ্গুণে যাতায়াত করিতে পারিবে। বর্ত্তমানে সিংহল ও অষ্ট্রেলিয়ার মাঝামাঝি একমাত্র যবদ্বীপেই ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডলের যাহা কিছু অবশিষ্ট আছে। সিঙ্গাপুর হাতে পাওয়ায় জাপানীদের এখন যবদ্বীপ আক্রমণের খুবই সুবিধা হইবে।

সিঙ্গাপুরের রক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা প্রচার করা হইয়াছে সত্য। কিন্তু সামরিক দিক হইতে বিচার করিয়া দেখিতে গেলে উহা কোন কালেই একটা দুর্গ স্বরূপ ছিল না। উহা একটি চমৎকার নৌ-ঘাঁটি ছিল মাত্র। পুরাণে শক্ত বাড়ীর বর্ণনায় পাথরের উপর নির্ম্মিত বাড়ীর কথা আছে। সিঙ্গাপুর তাহার বিপরীত উদাহরণ। উহা পাথরের উপর নির্ম্মিত বাড়ী নহে। এখানকার মাটির তলায় পাথর নাই। ভিত্তি করিবার মত অন্যান্য কোন শক্ত পদার্থ নাই। শক্ত মাটির উপর সামরিক

রক্ষা ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা সম্ভব হয় নাই। সেগুলিকে জলাভূমির উপর গড়িয়া তুলিতে হইয়াছিল। সেগুলি বিমান আক্রমণের পক্ষে একেবারে খোলা ছিল। এখানে জিব্রালটারের এবং করিজিডরের মত আত্মরক্ষার প্রাকৃতিক কোন সুবিধা ছিল না। সিঙ্গাপুরকে রক্ষা করার মত বিমানের সহায়তারও অভাব ছিল। কাজেই ইংরাজদের চৌকীগুলি বোমার ধাক্কায় একেবারে উড়িয়া যায়। ইংরাজ পক্ষের সৈন্যদিগকে যখন সিঙ্গাপুরে সরাইয়া আনা হয়, তখন ওয়াকেফহাল সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, দুই তিন দিনের মধ্যেই সিঙ্গাপুরের পতন অবধারিত। বৃটিশ সাম্রাজ্যের সৈন্যেরা যে দ্বীপটি এতদিন রক্ষা করিতে পারিয়াছে তাহাই বিস্ময়ের বলিয়া মনে হয়!

তথাপি একটা কথা এখনও বুঝা যাইতেছে না। জাপানীরা আট সপ্তাহের মধ্যে ছয় শত মাইল কি ভাবে জয় করিয়া মালয়ের প্রধান ভূখণ্ডে আসিয়া উপস্থিত হইল?

ইহার পিছনে ৪টি কারণ আছে বলিয়া মনে হয়—

(১) ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডলের সমর উপকরণের, বিশেষ করিয়া জঙ্গী বিমান ও বিমান মারা কামানের অভাব ছিল।

(২) মহাসাগরের উপর, এমন কি সঙ্কীর্ণ প্রণালীগুলির উপর ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডল হীনপ্রভ হইয়া পড়িয়াছিল।

(৩) চতুর্দ্দিক হইতে যে সমস্ত জাপানী আসিতেছিল ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডল তাহা বন্ধ করিবার মত কোনও কার্য্যকরী উপায় উদ্ভাবন করিতে পারে নাই।

(৪) এশিয়ার শ্রমিকদিগকে এরূপভাবে সংহত করা যায় নাই যে, গোলাবর্ষণের সময় এবং গোলাবর্ষণের পরও রসদ সরবরাহের কেন্দ্রগুলির কাজ চলিতে পারে।

একথা অবশ্যই ঠিক যে, ইঙ্গ-মিত্রমণ্ডলের বিমানবলহীনতা এবং

নৌবলহীনতাই এই দুর্গতির প্রধান কারণ। তথাপি অপর দুইটি বিষয় যদি ঠিক ঠিক পরিচালিত হইত, তবে জাপানীদের অগ্রগতিতে বিলম্ব হইত এবং সেই অবসরে বিমান ও রণতরীর সাহায্য পৌঁছিতে পারিত।"

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অতিরিক্ত বিজ্ঞাপনের জোরই সিঙ্গাপুরের সামরিক শক্তির সর্ব্বপ্রধান ভরসা ছিল! প্রকৃতপক্ষে কোন প্রচণ্ড যুদ্ধের আয়োজন এবং নিখুঁত কোন রণ-পরিকল্পনা ও সেই রণ-পরিকল্পনা অনুযায়ী কোন সুনির্দ্দিষ্ট রণকৌশল অনুসৃত হয় নাই।

* *

*

সিঙ্গাপুর দখলের পর জেনারেল তোজো বলিয়াছেন যে, সিঙ্গাপুরের পতনের দ্বারা জাপানী যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায় কোথায় সুরু হইয়া কোথায় শেষ হইবে, আজিকার দিনে তাহাই সর্ব্বত্র প্রবল গবেষণা উদ্রেক করিয়াছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম লক্ষ্য রেঙ্গুণ এবং দ্বিতীয় লক্ষ্য সুমাত্রা ও জাভা। কিন্তু রেঙ্গুণের দ্বারা যেমন ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম কতকাংশে চরম মীমাংসার দিকে যাইবে, জাভা ও সুমাত্রার দ্বারা উহা তেমন চরম মীমাংসা আনিবে না। কারণ, জাভা ও সুমাত্রা দখলের আশু উদ্দেশ্য হইতেছে এখানকার প্রণালীগুলি করায়ত্ত করিয়া ভারত মহাসাগরে যাতায়াতের পথসমূহ জাপানী প্রভুত্বের মধ্যে আনা। যদি সিঙ্গাপুরে নূতন ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়া জাপান নিকটবর্ত্তী দ্বীপ ও প্রণালীগুলি অধিকার করিতে পারে, তবে ভারত মহাসাগরে বৃটেন ও অষ্ট্রেলিয়ার বাণিজ্যিক যোগাযোগ এবং সামরিক সরবরাহের পথ একান্তরূপে বিপন্ন হইবে। তথাপি জাভা ও সুমাত্রার যুদ্ধ কেবল সেই সেই স্থানেই শেষ হইতেছে না। এদিকের অভিযানের আসল লক্ষ্য হইতেছে অষ্ট্রেলিয়া, যেমন রেঙ্গুণ অভিযানের আসল লক্ষ্য

হইতেছে বর্ম্মা রোড। ব্রহ্মের সড়ক দখলের দ্বারা চীন বিচ্ছিন্ন ও বিপর্য্যস্ত হইবে, সুমাত্রা ও জাভার পর অষ্ট্রেলিয়া দখলের দ্বারা ভারতবর্ষ অধিকতর বিপন্ন হইবে। কিন্তু জাপানীরা সত্য সত্যই অষ্ট্রেলিয়া দখল করিবে, কিম্বা আকাশ ও স্থলপথে শুধু ধ্বংসকর আক্রমণ চালাইবে তাহা বলা শক্ত। যতদূর অনুমান করা যাইতেছে তাহাতে মনে হয় যে, ভারতবর্ষের দিকে অভিযানের আগে জাপান পশ্চাৎ বা পার্শ্ববর্ত্তী চীন ও অষ্ট্রেলিয়াকে অটুট রাখিয়া আসিবে না। কারণ, ভবিষ্যতে যদি মার্কিণ নৌবহরকে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগর পাড়ি দিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড হইয়া অষ্ট্রেলিয়ায় পৌছিতে হয়, তাহা হইলে জাপানের পক্ষে ভারতবর্ষ অপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজন অষ্ট্রেলিয়া। অপর দিকে স্থলপথে যাহাতে চীন ব্রহ্ম-যুদ্ধের পর পুনরায় জাপানকে আক্রমণ করিতে না পারে, এজন্য চীনের দিকে যাওয়াও একান্ত সম্ভব। কিন্তু জলপথে গোটা অষ্ট্রেলিয়া দখল না করিয়াও জাপানীদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। যদি যুদ্ধ-জাহাজ ও বোমারু বিমানযোগে অষ্ট্রেলিয়ার সমস্ত নৌঘাঁটি এবং নৌঘাঁটির সংলগ্ন বিমান ঘাঁটিসমূহ বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিতে পারে, তাহা হইলে জাপ নৌবহর. অনেকটা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবে। ঘাঁটির আশ্রয় ছাড়া নৌবহর বা বিমানবহর দূর পাল্লার অভিযানে বাহির হইতে পারে না। যদি অষ্ট্রেলিয়ার ঘাঁটিগুলি ধ্বংস হইয়া যায়, তবে অনতিদূর ভবিষ্যতে মার্কিণ নৌবহরের পক্ষে ভারত মহাসাগরের প্রান্ত সীমায় আসা সম্ভব হইবে না. এবং যদি মার্কিণ নৌবহরের আগমন কার্য্যতঃ সম্ভব না হয়, তবে নৌরণে পটু জাপানকে ভারত মহাসাগরে বা বঙ্গোপসাগরে একা বৃটেন কতখানি বাধা দিতে পারিবে, তাহা বিতর্কের বিষয়।

পঞ্চম অধ্যায়

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের পতন

(১)

'দ্বীপময় ভারতের' দিকে

ফেব্রুয়ারী '৪২।

এবার 'বৃহত্তর ভারতবর্ষের' দিকে তাকানো যাউক—যেখানে ষোড়শ শতাব্দীর আগে হিন্দু রাজারা রাজত্ব করিতেন দ্বীপে উপদ্বীপে ও সমুদ্র-পথে। সুনীল সিন্ধুধৌত তিনটি দেশ এই বৃহত্তর ভারতের কল্পনাকে নাড়া দিয়াছিল—যবদ্বীপ, বলিদ্বীপ ও সুমাত্রার এই দূরবর্ত্তী দেশগুলির সহিত শ্যাম, ব্রহ্ম ও মালয়ের ভিতর দিয়া যেমন যোগাযোগ ছিল, তেমনই একদা প্রাচীন ভারতের অর্ণবপোত এই মহাসমুদ্রে বিচরণ করিয়াছিল। হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রসার ঘটিয়াছিল এই দ্বীপগুলিতে। আজও প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক হিন্দুর গর্ব্ব-গরিমা খুঁজিয়া বেড়ান এখানকার মন্দির গাত্রে, প্রস্তর খণ্ডে, রাজদরবারের বিস্মৃত

কাহিনীর মধ্যে—আর রসিকজন নৃত্যকলার সন্ধান করেন কোমল দেহা তরুণীদের লীলাচপল ভঙ্গীতে। ভারতবর্ষে যেমন হিন্দু রাজত্বের অবসান ঘটে বৈদেশিক আক্রমণে—বহিঃশত্রুর দুর্দ্দান্ত অভিযানে, বৃহত্তর ভারতবর্ষের বেলাও তাহাই। ইউরোপীয় জাতিগুলি দুঃসাহসিক অভিযানের ইতিহাসে একটা বিস্ময়ের মত। কত শতাব্দী পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজ, ওলন্দাজ, দিনেমার প্রভৃতি জাতিগুলি অজ্ঞাত পরিচয় মহাসমুদ্রের হাজার হাজার মাইল অতিক্রম করিয়া অতলান্তিক হইতে প্রশান্ত মহাসাগরে হানা দিয়াছিল। ইউরোপীয়দের নিকট প্রাচ্যের ভূমিখণ্ড স্বপ্নময় ও স্বর্ণময় দেশ বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাদের জাহাজগুলি কেবল ভারতবর্ষের তীরেই ভিড়িল না, ভারতবর্ষ ডিঙ্গাইয়া তাহারা চলিয়া গেল আরও দূরে—যেখানে সুরু হইল দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া এবং ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরের সীমান্তবর্ত্তী দ্বীপমালা। পর্ত্তুগীজদিগকে তাড়াইয়া হল্যাণ্ড হইতে আগত 'ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' (ইংলণ্ডের অনুকরণে এই কোম্পানীর হুজুগ তখন ইউরোপে সাড়া জাগাইয়াছিল) এই দ্বীপমালা দখল করিয়া বসিল। ১৬০২ খৃষ্টাব্দ হইতেই ক্রমে ক্রমে ওলন্দাজদের অধিকারে আসিল জাভা, সুভাত্রা, সুন্দা, মালক্কা, সেলিবিস, বোর্ণিও, নিউগিনি প্রভৃতি। হল্যাণ্ডের বিশাল ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়িয়া উঠিল সুদূর প্রাচ্যে। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজত্ব শেষ হইয়া গেল এবং হল্যাণ্ডের রাষ্ট্রশক্তি নিজ হাতে উহার শাসনভার গ্রহণ করিয়া এই সমস্ত ঔপনিবেশিক রাজ্যের জন্য একজন গবর্ণর-জেনারেল নিযুক্ত করেন। (ভারতবর্ষ ও বৃহত্তর ভারতবর্ষের অদৃষ্ট একই) ইতিমধ্যে ইংরাজেরা এই নয়ালব্ধ সাম্রাজ্যের কোন কোন অংশ হাত করিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু ওলন্দাজদের সহিত তাহারা পারিয়া উঠিল না। আজ চারিশত বৎসর পর সেই বিশাল সম্পত্তি, যাহা ডাচ ইষ্ট

ইণ্ডিজ বা পূর্ব্ব ভারতীয় ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ নামে পরিচিত, তাহা ইংরাজেরও নহে, দেশীয় বাসিন্দাগণেরও নহে, আর একটি বিদেশী শক্তি অর্থাৎ জাপানের হাতে গেল। এই সম্পত্তির স্থলভাগের আয়তন ৭ লক্ষ ৩৫ হাজার বর্গ মাইল, এবং অধিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটি ১৮ লক্ষের বেশী (১৯২৭ সালের হিসাবে), আর অর্থনৈতিক সম্পদের দিক দিয়া ইহার তুলনা খুব কম দ্বীপ ও উপদ্বীপের সহিতই মিলিবে। সোণা, লোহা, কয়লা, টিন, পেট্রোল ইত্যাদি খনিজ সম্পদ, চা, চিনি কাফি, চাউল, তামাক ইত্যাদি উৎপন্ন দ্রব্য, কর্পূর, লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি ইত্যাদি মশলা, সেগুন, লোহাকাঠ, ওক, ইত্যাদি বৃক্ষ ও কাষ্ঠ সম্পদ এবং বিশাল অরণ্যের হস্তি, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, হরিণ, ভল্লুক, বানর ইত্যাদি অসংখ্য প্রকার জন্তু-জানোয়ারের ঐশ্বর্য্যে এই দেশগুলি স্বর্ণপ্রসূ হইয়া রহিয়াছে। ইহা ছাড়া এইগুলির সামরিক গুরুত্ব তো (Strategical importance) আছেই—সেই গুরুত্ব একদিকে সিঙ্গাপুর, ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ এবং আর একদিকে অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের জন্য। প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরে নৌ-আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষার পক্ষে ওলন্দাজ দ্বীপগুলি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। যেখানে অর্থ-নীতির ঐশ্বর্য্য ও সমরনীতির সৌভাগ্য একত্রিত হয়, সেই মণি-কাঞ্চন সংযোগ ক্ষেত্রে কোন্ সাম্রাজ্যলোভী না হাত বাড়াইবে? কাজেই জাপানী ক্ষুধা অস্বাভাবিক নহে।

দ্বীপ ও উপদ্বীপে এই অঞ্চল এত সমাকীর্ণ যে, কেহ কেহ ইহাকে 'দ্বীপময় ভারত' নাম দিয়াছেন। এই ওলন্দাজ সাম্রাজ্যের প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল জাভার রাজধানী বাটাভিয়ায় এবং ইহার প্রধান নৌ-ঘাঁটি ছিল সুরাবায়া। গত ডিসেম্বর মাসে চার্চ্চিল-রুজভেল্টের ওয়াশিংটন বৈঠকে দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামের যে রণ-পরিকল্পনা
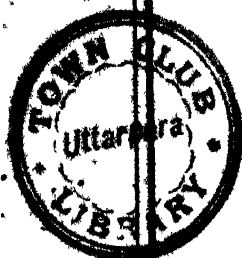
মেরিয়ানাস বা
লাড্রোনিস দ্বীঃ পুঃ
সাইপান
গুয়াম
লাইন দ্বীঃ পুঃ
সা গ র
ষুবরেখা
নিউ আয়র্ল্যাণ্ড
রবাউল
গিনি
পপুয়া
নিউবৃটেন
সুলোমন
দ্বীঃ পুঃ
পোর্ট
মোরসবি
বুনা
প্রবাল সাগর

স্থির হইয়াছিল, জেনারেল ওয়াভেল নিযুক্ত হইলেন উহার সর্ব্বপ্রধান সেনাপতি এবং এই সেনাপতি তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন সুরাবায়া নৌঘাঁটিতে। জাপানীরা প্রায় একযোগে আক্রমণ চালাইল বোর্ণিও, জাভা, সুমাত্রা, টাইমুর, নিউগিনি ইত্যাদির উপর। তাহাদের আক্রমণ পরিকল্পনা যেন পাখার মত ছড়াইয়া পড়িল দ্বীপ হইতে উপদ্বীপে, দেশ হইতে দেশান্তরে, সমুদ্র হইতে প্রণালীপথে এবং প্রণালী হইতে তীরভূমিতে—জাহাজ ও এরোপ্লেন হইল ইহার প্রধান সহায়। ম্যানিলা হইতে সুরাবায়া, ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট হইতে পোর্ট মোর্সবি—এই বিশাল দ্বীপময় সামুদ্রিক দেশে জাপানী সমরশক্তি প্রথমতঃ আকাশ হইতে নামিয়া আসিল একটা প্রকাণ্ড ঝড়ের মত। তারপর সেই ঝড় রণতরী, সৈন্য এবং গোলাগুলীর আশ্রয় করিয়া সমগ্র তীরভূমি ও স্থলভাগ আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিল অতি দ্রুত—বজ্র ও বিদ্যুতের মত ইহা ফাটিয়া পড়িল সমগ্র ওলন্দাজ সাম্রাজ্যে। ৩১শে জানুয়ারী বাটাভিয়া হইতে সংবাদ আসিল, আর বিলম্ব নাই—

যবদ্বীপের যুদ্ধ ক্রমশঃই আসন্ন হইয়া উঠিতেছে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় সংগ্রামে ইহা এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া বিবেচিত হইবে। দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরে জাপ অভিযান নিম্নোক্ত প্রকারে অগ্রসর হইতেছে :—

(১) সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রগতি, এখানে বৃটিশবাহিনী আত্মরক্ষাত্মক যুদ্ধে লিপ্ত রহিয়াছে।

(২) পশ্চিম বোর্ণিওতে অবতরণ ; অতঃপর সারাওয়াক হইতে আক্রমণ।

(৩) মাকাসার প্রণালী দিয়া আক্রমণ।

(৪) নিউগিনির উত্তর দিকে মিনাহাসা দখল করিয়া লইয়া কেণ্ডারীতে আক্রমণ।

(৫) নিউগিনি এবং অষ্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান। আম্বয়নাতে বর্ত্তমান বিমান আক্রমণ উহারই অপরিহার্য্য অংশ। •

(৬) পশ্চিম বোর্ণিওর সমস্ত বিমানঘাঁটি জাপানীদের হস্তগত হইলে জাভায় ব্যাপকভাবে বিমান আক্রমণের আশঙ্কা রহিয়াছে। জাভা আক্রমণের পর জাপানীরা বাণ্ডের মাসিনে ঘাঁটি সকল হস্তগত করিবার চেষ্টা করিবে। •

(৭) অষ্ট্রেলিয়ার সহিত মিত্রশক্তির সরবরাহ রক্ষা করিবার কার্য্যে টাইমুর দ্বীপ এক বিশেষ স্থান জুড়িয়া রহিয়াছে। উহাও আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা রহিয়াছে।

কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যের মত এই দ্বীপময় সমুদ্রে পাঠকবর্গের পক্ষে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করা কঠিন। মালয়ের শেষ প্রান্ত হইতে ক্রমশঃ দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকের জলপথ ধরিয়া অগ্রসর হইলে একে একে বামে ও দক্ষিণে সুমাত্রা, জাভা, বালি, লম্বক, সুম্বা ইত্যাদি এবং বোর্ণিও, সেলিবিস মলাক্কা ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জের সারি দুই হাত দিয়া ঠেলিয়া দিলে পাওয়া যাইবে আম্বয়না। আম্বয়না মলাক্কা দ্বীপপুঞ্জের একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ। কিন্তু দ্বীপটি ক্ষুদ্র হইলেও ডাচ ইষ্ট ইণ্ডিজের ইহা দ্বিতীয় নৌঘাঁটি। এখানে একটি চমৎকার বিমান ঘাঁটিও আছে। (এই সহরের বাসিন্দার সংখ্যা ২ লক্ষ ৭০ হাজার) ওলন্দাজ সাম্রাজ্যকে দ্রুত ঘিরিয়া ধরিবার জন্য ইহার প্রান্তবর্ত্তী নৌ ও বিমান ঘাঁটি আগে দখলের দরকার। সুতরাং বহির্জগতের নিকট স্বল্প পরিচিত এবং ক্ষুদ্র আম্বয়না জাপানী আক্রমণের লক্ষীভূত হইল। ৩০শে জানুয়ারী শুক্রবার সকালে বিমান আক্রমণ আরম্ভ হয়। দুই ঘণ্টা ধরিয়া জাপ বোমাবর্ষী বিমান-সমূহ জঙ্গী বিমানের সহায়তায় সহরে বোমা ফেলে ও মেসিনগান চালায়। একটি গীর্জ্জা ও একটি স্কুল ভবন ধ্বংস হয় এবং রেডিয়ো

ষ্টেশনের ক্ষতি হয়। বেলা ১টার সময় আম্বয়না হইতে একটি শত্রুপক্ষীয় সমরোপকরণবাহী জাহাজ দৃষ্টিগোচর হয়। সন্ধ্যাকালে শত্রুপক্ষের আসল আক্রমণ আরম্ভ হয়। উপকূলের কয়েকস্থানে শত্রুপক্ষীয় ক্রুজার, ডেষ্ট্রয়ার ও সমরোপকরণবাহী জাহাজসমূহ দাঁড়াইয়া থাকে। পরদিন সকাল ৬-২০ মিনিটের সময়ও বিভিন্ন স্থানে আগুন জলিতে দেখা যায়। এই সময় শত্রু জাহাজ ও বিমানগুলি দ্বীপের উপর গোলা ও বোমাবর্ষণ করিতেছিল ও সর্ব্বত্র যুদ্ধ চলিতেছিল।.........

শনিবার সকাল বেলা আম্বয়না দ্বীপে জাপানীরা কিছু স্থল সৈন্য নামাইবার চেষ্টা করে এবং ঐস্থান হইতে কিছুদূরে জাপানীদের ৩খানা ক্রুজার, ৬খানা ডেষ্ট্রয়ার, ৪খানা সৈন্য ও রসদবাহী জাহাজ দেখা যায়। দুই দিনের মধ্যেই আম্বয়নার সহিত বাটাভিয়ার সংযোগ ছিন্ন হইয়া যায়। ওলন্দাজ দ্বীপ-পুঞ্জের গবর্ণর-জেনারেল এক বেতার বক্তৃতায় ইহা প্রচার করেন এবং বলেন যে, আম্বয়নার সহিত সংযোগ নষ্ট হইলেও ওলন্দাজবাহিনী সংগ্রাম করিতেছে—অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই লড়াই চলিতেছে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আম্বয়না ওলন্দাজদিগের হাত ছাড়া হইয়া যায়।

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে জাপানীদের ব্যাপক অভিযান আরম্ভ হইল। প্রথমতঃ বিমানযোগে আক্রমণ, তারপর সৈন্যবাহী ও রসদবাহী জাহাজসহ নৌবহরের আক্রমণ, জাহাজ হইতে প্রচুর গোলাবর্ষণ এবং সেই গোলাবর্ষণের আড়াল ধরিয়া সৈন্যদলের অবতরণ, তারপর তীরভূমিতে উভয় পক্ষের লড়াই—সংক্ষেপে ইহাই জাপানীদের রণকৌশল, দ্বীপগুলিতে তাহারা এই কৌশলই খাটাইয়াছে।

পঞ্চম অধ্যায়

(২)

সুমাত্রা ও বোর্ণিও দখল

ফেব্রুয়ারী, '৪২।

অষ্ট্রেলিয়া ও নিউগিনির পর বোর্ণিও সারা পৃথিবীর মধ্যে তৃতীয় বৃহত্তম দ্বীপ। দৈর্ঘ্যে ইহা ৮৫০ এবং প্রস্থে ৬০০ মাইল, লোকের সংখ্যা ২৫ লক্ষের বেশী হইবে। ইহার খনিজ সম্পদ, শস্য ও অরণ্য সম্পদ অতুলনীয়। তামা, লোহা, টিন, রূপা, সোণা ও হীরা বোর্ণিওতে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ইহার সঙ্গে কয়লা, রবার ও পেট্রোল তো আছেই। যদিও বোর্ণিও দ্বীপের অধিকাংশের মালিক ওলন্দাজ গবর্ণমেণ্ট, তথাপি ইংরাজদের এখানে কিছু অংশ আছে। উত্তর বোর্ণিও, ইহা নর্থ বৃটিশ বোর্ণিও নামে পরিচিত এবং সারাওয়াক। এখানকার মালিক একজন 'রাজা' উপাধিধারী ইংরাজ, যেমন আমাদের দেশে

রাজা উপাধিধারী অনেক ভূমধ্যকারী আছেন। তবে, ইংরাজদের মধ্যে এই ধরণের 'রাজা' আর কেহই নাই। ইহা ছাড়া ব্রুনিতে একজন সুলতান আছেন, তবে ব্রুনিও বৃটেনেরই আশ্রিত। বোর্ণিওর আর বাকী অংশ সমস্তই হল্যাণ্ডের। ওলন্দাজ দ্বীপের ঐশ্বর্য্য যেমন লোভনীয় সামরিক দিক দিয়াও উহার গুরুত্ব যথেষ্ট। সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ চীন-সাগর ও সুন্দা দ্বীপে নৌ-আধিপত্য বিস্তার ও রক্ষার জন্য বোর্ণিও দীর্ঘকাল ধরিয়া জাপানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। এখানকার ব্রুনি ও সারাওয়াকে যে চমৎকার পোতাশ্রয় আছে, নৌবহরের ব্যবহারের পক্ষে তাহা মূল্যবান। পেট্রোল, রবার ও কয়লা, যাহা আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে নিতান্ত অপরিহার্য্য, তাহাও এই অঞ্চল অধিকারের দ্বারা জাপানের করতলগত হইবে। লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারু লিখিয়াছিলেন—

The excellent harbours of Brunei and Sarwak could be available for use as bases for Japan's war of attrition in the Greater and Lesser Sunda Isles and for the Fleet covering her expedition to Singapur. The problems of obtaining oil fuel and supplying it to the fleet during its operations in the South China sea, and of obtaining rubber for the munition factories in Japan, would be simplified. কাজেই বোর্ণিও দখল করিতে হইবে, অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা। জাপানী রণনীতিবিদ সেই আক্রমণের একটা নক্সাও দিলেন—একদা কোনও সেপ্টেম্বরের ভোর বেলা ৬খানা ১০ হাজার টনের ক্রুজার এবং কতকগুলি ডেষ্ট্রয়ার সৈন্যভর্ত্তি জাহাজগুলিকে লইয়া বৃটিশ বোর্ণিওর অদূরে দেখা দিবে। ইহারা দুই দলে ভাগ হইয়া যাইবে—একদল যাইবে ব্রুনি উপসাগরের দিকে এবং আর একদল সারাওয়াকে। রণতরী হইতে বোমারুর দল উড়িয়া গিয়া পোতাশ্রয়ে

বোমাবর্ষণ করিবে। তারপর মাইনঝাটানো জাহাজগুলি আগে পাঠাইয়া পিছনে অনুসরণ করিবে ডেষ্ট্রয়ারসমূহ। এই ডেষ্ট্রয়ারগুলিতে থাকিবে প্রথম নৌ-অভিযাত্রী দল। তাহারা অতি দ্রুত অবতরণ করিয়া তীরভূমিতে ছুটিয়া যাইবে। ইতিমধ্যে দেখা দিবে সৈন্যবাহী পোতগুলি, এক হাজার করিয়া সৈন্য দুই স্থানে নামিবে এবং তাহারা তৎক্ষণাৎ সহরের দিকে অগ্রসর হইবে। সারাওয়াক বা ব্রুনিতে আত্মরক্ষাকারী সৈন্য কিছুই নাই—আছে কিছু পাহারাদার শাস্ত্রী। সুতরাং বাঁশঝাড় কাটিবার মত জাপানী সৈন্যেরা প্রায় বিনা বাধায় অগ্রসর হইবে। রাত্রি ঘনাইয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থান দুইটী জাপানীদের করতলগত হইবে। ১৯৩৬ সাল হইতে এই প্ল্যান। ৬ বৎসর পর মোটামুটি ইহা কার্য্যকরী হইয়াছে। কেবল বৃটিশ বোর্ণিও নহে, গোটা বোর্ণিও দ্বীপই জাপানীরা অল্প কয়েকদিনের মধ্যে কাড়িয়া

জানুয়ারী মাসের মাঝামাঝি সময় জাপানীরা উত্তর বোর্ণিওর পূর্ব্ব তীরস্থ তারাকান এবং সেলিবিস দ্বীপে আক্রমণ ও অবতরণ করে। সেলিবিসে তাহারা প্যারাসুট সৈন্য নামাইয়াছিল, তারপর তিন সপ্তাহের মধ্যে তাহারা সানডাকান, ব্রুনি, সারাওয়াক, বালিকপাপান, বাঞ্জের মাসিন, কুচিন ও রাজধানী পন্টিয়ানাক অর্থাৎ চারিদিক হইতে সমস্ত বোর্ণিও ছাইয়া ফেলে। বিমানযোগে আক্রমণ ও জাহাজযোগে অবতরণ ইহাই এখানকার রণনীতির বৈশিষ্ট্য। বালিকপাপানে ওলন্দাজ সেনাপতি কয়েক দিন বাধা দিয়াছিলেন, কিন্তু জাপানীশক্তি সমস্ত দিক দিয়াই অনেক শ্রেষ্ঠ ছিল। ওলন্দাজ বিমান ও নৌবহরও কিছু ছিল বটে, তথাপি সত্যকারের যুদ্ধ সম্ভবতঃ এক সপ্তাহের বেশী হয় নাই।

তবে, জঙ্গলের দিকে হটিয়া গিয়া ওলন্দাজ সৈন্যেরা কিছুকাল গরিলা যুদ্ধ চালাইয়াছিল।

* *
*

সুমাত্রা দখল

মানচিত্রের দিকে তাকাইলে মনে হইবে মালয় বা সিঙ্গাপুর হইতে পা বাড়াইলেই সুমাত্রা দ্বীপে পৌছানো যায়—কেবল মাঝখানে মালাক্কা প্রণালীর একটা সরু গলি ডিঙ্গাইতে হইবে। বোর্ণিওর মত এই দ্বীপটি ছড়ানো নহে, অভিনব লম্বা আকৃতির। উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে দক্ষিণ-পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহা লম্বায় ১১০০ মাইল, আর চওড়ায় মাত্র ১০০ এবং কোথাও কোথাও ২৪০ মাইল। লোক সংখ্যা বোর্ণিওর চেয়ে আড়াই গুণ বেশী। ১৯২৭ সালে এখানে অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ৬২ লক্ষ ১৯ হাজার। ইহার প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ বোর্ণিওর মতই লোভনীয়। জাপানীদের সুমাত্রা আক্রমণের উদ্দেশ্য হইল একদিকে সিঙ্গাপুর ও মালয়কে বিচ্ছিন্ন করা এবং অন্যদিকে ওলন্দাজদের আত্মরক্ষার আসল ঘাঁটি জাভাকে বিচ্ছিন্ন করা। সুমাত্রা এই দুইয়ের মধ্যবর্ত্তী। এখানকার যুদ্ধে জাপানীরা গোড়াতেই প্যারাসুট সৈন্যের কৃতিত্ব দেখাইয়াছে। এত ব্যাপকভাবে প্যারাসুট সৈন্যসহ আক্রমণ জাপানীরা আর কোথায়ও করে নাই। জাপানীদের বিমানবাহিনী ও বিমানবহর সম্পর্কে পূর্ব্বে মিত্রশক্তিবর্গের যে ধারণা ছিল, তাহা এই সমস্ত দ্বীপের যুদ্ধে সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। এই আধুনিক কায়দার লড়াইয়ে জাপানীরা জার্ম্মাণ রণকৌশল অনুসরণ করিয়াছে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী বাটাভিয়া হইতে সংবাদ আসে—

গতকল্য (শনিবার) পালেম্বাংয়ে জাপ প্যারাসুট সৈন্যদের অবতরণের

পর অদ্য জাপানী সৈন্যগণ জাহাজ হইতে ব্যাপকভাবে অবতরণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষের বিজ্ঞপ্তিতে এই সংবাদ ঘোষণার পর বলা হইয়াছে যে, এই গুরুত্বপূর্ণ তৈলকেন্দ্রের কলকারখানা ধ্বংসের কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে। বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা মালয়ের পূর্ব্বে অবস্থিত আনাম্বা দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়াছে। দক্ষিণ সেলিবিসে যুদ্ধ চলিতেছে। মাকাসারের নিকট ওলন্দাজ সৈন্যগণ দৃঢ়ভাবে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতেছে।

বাটাভিয়া হইতে 'রয়টারের' বিশেষ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন যে, পালেম্বাংয়ের নিকট জাহাজ হইতে বহু সংখ্যক জাপ সৈন্য অবতরণের সঙ্গে সঙ্গে অদ্য (রবিবার) জাপানীরা সুমাত্রায় পুরাদমে আক্রমণ আরম্ভ করিয়াছে। গতকল্য সাত শত প্যারাসুট সৈন্য অবতরণ করিয়াছিল বলিয়া জানা গিয়াছে। জাপানীরা ব্যাপকভাবে পালেম্বাং আক্রমণ করিতেছে। ইহা পৃথিবীর একটি বৃহৎ তৈলকেন্দ্র। এখানে একটি বিমান ঘাঁটিও আছে। তৈল শোধনাগার, যন্ত্রপাতি ও তৈলখনিগুলি ধ্বংস করা হইলে ইহা পৃথিবীর ইতিহাসে স্বেচ্ছায় বৃহত্তম সম্পত্তির ধ্বংস কার্য্য বলিয়া পরিগণিত হইবে। পালেম্বাংয়ে প্রতি বৎসর সাড়ে ৪২ লক্ষ টন তৈল উৎপন্ন হয়। পালেম্বাংয়ের পতন হইলে বাংকা দ্বীপেও জাপ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পূর্ণ সম্ভাবনা রহিয়াছে। বাংকা অধিকৃত হইলে দক্ষিণ দিক হইতে সিঙ্গাপুরে প্রবেশের পথ বন্ধ হইয়া যাইবে এবং তাহার ফলে সিঙ্গাপুর দ্বীপ সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হইয়া পরিবে।......

ওলন্দাজ সেনাদপ্তরের একটি বিজ্ঞপ্তিতে বলা হইয়াছে, 'শনিবার অনেক জাপ প্যারাসুট সৈন্য পালেম্বাংয়ের নিকটে অবতরণ করিয়া আক্রমণ চালায়। একটি জাপ বোমারু বিমান ধ্বংস করা হয়। মোটামুটি হিসাবে জানা গিয়াছে যে, তিনটি স্থানে কয়েক শত প্যারাসুট সৈন্য

অবতরণ করে। তাহাদের নিকট 'টমিগান' ও 'ট্রেঞ্চ মর্টার' ছিল। তৈল শোধনাগারের দিকেই আক্রমণ চালান হয়; কিন্তু শত্রুপক্ষ তাহা দখল করিতে পারে নাই। আমাদের সৈন্যগণ আক্রমণকারী সৈন্যদিগকে ধ্বংস করিতে থাকে। আক্রান্ত দুইটি স্থানে প্যারাসুট সৈন্যদিগকে নিশ্চিহ্ন করা হয়। তৃতীয় স্থানেও আমরা আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করি। সেখানে একশতেরও কম প্যারাসুট সৈন্য জীবিত ছিল। ব্যাপকভাবে সৈন্য অবতরণের আশঙ্কায় শনিবার রাত্রিতে আমরা পালেম্বাংয়ের নিকটস্থ গুরুত্বপূর্ণ কলকারখানাগুলি ধ্বংস করিতে আরম্ভ করি। অদ্য (রবিবার) বহু সংখ্যক শত্রু সৈন্য অবতরণ করিতেছে। অদ্য প্রাতে ওলন্দাজ বোমারু বিমানসমূহ বাংকা দ্বীপে মাণ্টাকের নিকট তিনটি জাপ সমরোপকরণবাহী জাহাজের ঠিক উপরে বোমা ফেলিয়াছে। দক্ষিণ সেলিবিসে যুদ্ধ চলিতেছে। মাকাসারের নিকটে ওলন্দাজ সৈন্যগণ দৃঢ়ভাবে প্রতিরোধ চালাইতেছে। জাপানীরা মালয়ের পূর্ব্বে আনাম্বাস দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করিয়াছে। বহিঃপ্রদেশগুলিতে শত্রুপক্ষের অধিকতর তৎপরতার সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। ঐদিনই ওলন্দাজ সমর দপ্তরের আর একটি ইস্তাহারে প্রকাশ:—শনিবার সকালে জাপানীরা প্যারাসুট সৈন্য লইয়া পালেম্বাংয়ে আক্রমণ করিয়াছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নাই। শত্রুপক্ষ সুমাত্রার বহু স্থানে পর্য্যবেক্ষণ কার্য্য চালাইয়াছে। কয়েক জায়গায় তাহারা আক্রমণও করিয়াছে। সুমাত্রা ও বোর্ণিও দ্বীপের মধ্যে অবস্থিত টিনশিল্প প্রধান বিলিটন দ্বীপের রাজধানী টাঞ্জং পাণ্ডাংয়ে কয়েকটি বোমা বর্ষিত হইয়াছে। দুইটি জাপ জঙ্গী বিলিটন দ্বীপের বিমান ময়দানে মেশিনগান হইতে গুলীবর্ষণ করে।

জাপানীরা যে সমস্ত দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে, সেখানে তাহারা বিপুল

বাধা পাইতেছে। সুমাত্রায় জাপ সৈন্য অবতরণে এক বিরাট সংগ্রামের সূচনা হইয়াছে।

ওলন্দাজ কর্ত্তৃপক্ষ যদিও এক বিরাট সংগ্রামের সূচনা দেখিয়াছিলেন তথাপি উহা সূচনাতেই রহিয়া গেল। উভয় পক্ষে বিরাট সংগ্রাম বাধিল না। জাপানীরা পরের দিন অর্থাৎ ১৬ই তারিখ পালেম্বাং দখল করিয়া লয়। প্রথমতঃ ওখানে তাহারা প্যারাসুট সৈন্য নামাইয়া দেয়। তারপর তাহারা বহু সংখ্যক জাহাজ লইয়া উপস্থিত হয় এবং সেই সমস্ত জাহাজ হইতে বহু সহস্র সৈন্য পালেম্বাংয়ে অবতরণ করে। বাংকা প্রণালীতে জাপানীদের ৫খানা সৈন্যবাহী জাহাজ ও ২খানা ক্রুজারের উপর মিত্রপক্ষীয় বিমান বোমাবর্ষণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু ঐগুলি ডুবিয়াছে কিনা জানা যায় নাই।

* *

*

ইহার পরেও সুমাত্রার কোন কোন অঞ্চলে যুদ্ধ চলিয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। প্যারাসুট সৈন্যের যুদ্ধ সর্ব্বদাই বিপজ্জনক। খুব দক্ষ, সাহসী এবং মৃত্যুভয়জয়ী সৈন্য ছাড়া প্যারাসুট-বাহিনী গঠন করা কঠিন। প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ক্ষিপ্রতা এবং দুর্দ্দান্ত সাহস তো চাইই, অধিকন্তু দক্ষ বৈমানিকের যে সমস্ত গুণ থাকা প্রয়োজন তাহাও চাই। দীর্ঘকালের উৎকৃষ্ট ট্রেণিং এই সমস্ত সৈন্যের প্রয়োজন। ১৯৪০ সালে হল্যাণ্ড, বেলজিয়াম ও ফ্রান্সে জার্ম্মাণী যে নূতন কায়দায় লড়াই করিয়াছিল, তাহাতে ব্যাপকভাবে প্যারাসুট সৈন্যের ব্যবহার হইয়াছিল। বোধহয় ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে রাশিয়াও ইহার প্রয়োগ করিয়াছিল। কিন্তু প্যারাসুট সৈন্যের নির্ম্মম যুদ্ধের আসল পরিচয় পাওয়া গিয়াছে ১৯৪১ সালের ক্রীটে। এই প্রকার সংগ্রাম সামরিক ইতিহাসে

অভূতপূর্ব্ব। পর পর কয়েক দিন ধরিয়া হাজারে হাজারে প্যারাস্যুট সৈন্য আকাশ হইতে নামিয়াছিল জীবন হাতে করিয়া। পাথরে মাথা ঠুকিয়া মরিবার মত প্যারাস্যুট সৈন্যদিগকে আত্মবলি দিতে হইয়াছিল ক্রীটে। তথাপি বৃটিশবাহিনী এই দুর্দ্দান্ত আক্রমণে পরাজিত এবং ক্রীট দ্বীপ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিল। তারপর ইউরোপের পূর্ব্ব রণাঙ্গনে প্যারাস্যুট সৈন্যের সংগ্রামের কিছু কিছু সংবাদ আসিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা ব্যাপক আকারের নহে। সুমাত্রা দ্বীপে জাপানের আক্রমণ ব্যাপক আকারে ঘটিয়াছে এবং তাহা মূতলঃ প্যারাস্যুট সৈন্যের সাহায্যে। নৌ-বাহিনী ও স্থলবাহিনী পরে আসিয়া হাজির হয় দলে দলে। প্যারাস্যুট সৈন্যেরা নিজেরা যেমন ভয়াবহ বিপদ ঘাড়ে করিয়া মাটিতে নামে, তেমনিই আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদলও গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হয়। সাধাবণতঃ তাহারা প্রতিপক্ষের একান্ত পশ্চাতে অবতরণ করে এবং যত্রতত্র অবতরণ করিয়া ও সঙ্গে সঙ্গে হাল্কা মেশিনগান হইতে অজস্র গুলী বর্ষণ করিয়া অপবিমিত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে। তাহারা প্রতিপক্ষের মূল ঘাঁটির সহিত পশ্চাতের যোগাযোগ কাটিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। পিছন হইতে এভাবে আক্রান্ত হওয়ার ফলে আত্মরক্ষাকারী সৈন্যেরা স্বভাবতঃই বিষম বিপদে পড়ে। কারণ, পশ্চাতের এই আক্রমণের সঙ্গে সম্মুখ বা দুই পার্শ্ব দিয়াও শত্রুর স্থল সৈন্য আধুনিক মারণাস্ত্র লইয়া অগ্রসর হইতে থাকে। এই অবস্থার সম্মুখীন হইবার জন্য যদি পূর্ব্ব হইতে প্রচুর আয়োজন না থাকে, তবে উভয় সঙ্কটে পড়িয়া আত্মরক্ষাকারী সৈন্যদল বেশীক্ষণ টিকিতে পারে না। সুমাত্রায়ও সম্ভবতঃ ইহাই ঘটিয়াছিল। (বিস্তৃত কোন বিবরণ পাওয়া যায় নাই)। ক্রীটের প্যারাস্যুট সৈন্যের আক্রমণে জার্ম্মাণী গ্রীসের দক্ষিণ প্রান্ত ভূভাগের সহায়তা পাইয়াছিল। ক্রীট হইতে উহার দূরত্ব ৬০ মাইলের

বেশী ছিল না। কিন্তু জাপানী বিমান সৈন্যেরা সুমাত্রা আক্রমণে কোন স্থলবর্ত্তী বিমান ঘাঁটির সাহায্য পাইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই। অবশ্য পূর্ব্বাহ্ণে বোর্ণিও দখল করায় তাহাদের যথেষ্ট সুবিধা হইয়াছিল, কিন্তু বোর্ণিও হইতে সুমাত্রা আকাশ পথে কয়েক শত মাইল হইবে। সুতরাং প্যারাসুট সৈন্যেরা বোধহয় সেখান হইতে আসে নাই। তাহারা আসিয়াছে বিমানবাহী জাহাজ ও যুদ্ধ-জাহাজ হইতে। এই জাহাজগুলিকেই তাহারা ঘাঁটির মত ব্যবহার করিয়া সুমাত্রার আকাশে পাখীর ঝাঁকের মত উড়িয়াছিল। কার্পাস তুলা আকাশে ফাটিয়া ছড়াইয়া গেলে যেমন দৃশ্যের অবতারণা হয়, শত শত বিমান-ছত্রীর (প্যারাসুট সৈন্য) একযোগে আকাশ হইতে অবতরণের চেষ্টা নিশ্চয়ই অনুরূপ দৃশ্যের সূচনা করিয়াছিল। সুমাত্রায় আত্মরক্ষার কোন ব্যাপক আয়োজন ছিল না। স্থলপথে, আকাশপথে ও সমুদ্রপথে জাপানের ত্রিধারার আক্রমণকে রোধ করিতে পারে, এমন ব্যবস্থার সম্ভব ছিল না। একথা মনে রাখা দরকার ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের আসল শক্তির উৎস হল্যাণ্ড। কিন্তু ১৯৪০ সালেই হল্যাণ্ড জার্ম্মাণী কর্ত্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হইয়াছিল। যেখানে মাতৃভূমি অপরের করতলগত, সেখানে উহার ঔপনিবেশিক 'সন্তান রাষ্ট্রের' পক্ষে এতবড় যুদ্ধ চালানো স্বভাবতঃই সম্ভব নহে। অপরপক্ষে মিত্রশক্তিপুঞ্জও জাপানের ব্যাপক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং বোর্ণিও, সুমাত্রা ইত্যাদি দ্বীপের দ্রুত পতনে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

(৩)

বালি ও জাভার পথে

ফেব্রুয়ারী '৪২।

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে বলি দ্বীপ ও যবদ্বীপ কিম্বা বালি ও জাভা ভারতবর্ষের নিকট অনেকটা পরিচিত। কয়েক বৎসর আগে বাঙ্গলা দেশের শিক্ষিত সমাজে বৃহত্তর ভারতের যে আন্দোলন চলিয়াছিল তাহাতে এই দ্বীপের কথা যথেষ্ট আলোচিত হইয়াছিল। কবি রবীন্দ্রনাথের 'দ্বীপময় ভারত' ভ্রমণের পর হইতে বালি ও জাভার সঙ্গে ভারতবর্ষের যেন একটা নিয়মিত যোগ সৃষ্টি হইয়াছিল। বালি, জাভা ও মাদুরার স্থাপত্যশিল্প এবং নৃত্য অত্যন্ত প্রসিদ্ধ। পৃথিবীর মধ্যে কোথাও বোধহয় বলি দ্বীপের মত এত বেশী মন্দির নাই। ভ্রমণকারী ও শিল্পীদের নিকট বলিদ্বীপ তীর্থস্থানীয়। দ্বীপটি অতি ঘন বসতিপূর্ণ এবং ক্ষুদ্র,

এখানে ধান জন্মে প্রচুর। জাভার ইহা একান্ত নিকটবর্ত্তী। মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ ও অগভীর বলি প্রণালী ছাড়া আর কোন ব্যবধান নাই। বস্তুতঃ বলি দ্বীপের উপকূল হইতে যবদ্বীপের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি এবং বেতার কেন্দ্রের দূরত্ব দেড় মাইলেরও কম। এই দ্বীপের অধিবাসীর সংখ্যা ১০ লক্ষ হইবে। বোর্ণিও ও সুমাত্রার পরেই জাভা প্রকাণ্ড দ্বীপ। সুমাত্রা ও জাভা কাছাকাছি, মনে হয় একটি দ্বীপই মধ্যপথে সুন্দা প্রণালীর দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে। বোর্ণিও ও যবদ্বীপের মধ্যে জাভা সাগর, ইহাও সুমাত্রার মত লম্বা আকৃতির, দৈর্ঘ্যে ৬৩২ মাইল এবং প্রস্থে ৩৫ হইতে ১২১ মাইল। মাদুরা দ্বীপসহ ইহার লোক সংখ্যা ৩ কোটি ৬৪ লক্ষ। ইহাও প্রাকৃতিক সম্পদে উন্নত। এই দ্বীপের ভিতরের দিকটা পাহাড়ে আচ্ছন্ন, তবে উত্তর উপকূলে অনেকগুলি উপসাগর থাকায় বন্দর ও পোতাশ্রয়ের পক্ষে এই দিকটা উৎকৃষ্ট। ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নৌঘাঁটি সুরাবায়া এবং রাজধানী বাটাভিয়া—এইগুলি উত্তরবর্ত্তী উপকূলে। ইহা ছাড়া দক্ষিণে জেলিয়াৎজাপ নামেও একটি ঘাঁটি আছে। সিঙ্গাপুরের পর সুরাবায়াই দক্ষিণ পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে মিত্রশক্তির একমাত্র বড় ঘাঁটি ছিল। এই ঘাঁটিগুলির উপর জাপানী আক্রমণ সুরু হয় ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে।

ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের প্রাণকেন্দ্র জাভা। সুতরাং জাভাকে প্রাণপণ শক্তিতে রক্ষা করা হইবে এবং সেখানে উপযুক্ত আয়োজন আছে, সিঙ্গাপুরের পতনের পর একথা বার বার ঘোষিত হইয়াছিল। একজন বিশেষজ্ঞ ১৩ই ফেব্রুয়ারী তারিখ জানাইলেন :—

'সিঙ্গাপুরের শোচনীয় দুর্গতি এবং বোর্ণিও অঞ্চলে জাপানীদের অগ্রগতি সত্ত্বেও ওলন্দাজদের সমর প্রবৃত্তি অটল রহিয়াছে। জাপানীরা যবদ্বীপ জয় করিতে পারিবে এ ধারণা তাহারা মনের কোণেও স্থান দেয় না। অন্য কোন দেশ টের পাইবার আগেই ওলন্দাজরা জাপানীদের

অভিসন্ধির কথা টের পাইয়াছিল। তিনি সরকারকে বাধ্য করিয়া জাপানীরা যখন ইন্দোচীনের উত্তর খণ্ড অধিকার করিয়া লইয়াছিল তখন হইতেই ওলন্দাজরা পূর্ব্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ রক্ষার ব্যবস্থায় মনোনিবেশ করে। তাহারা আমেরিকাতে দুই কোটি পাউণ্ড মূল্যের বিমান এবং অন্যান্য সমরোপকরণের অর্ডার দেয়। তাহারা জঙ্গলের মধ্যে এমন কতকগুলি বিমান ময়দান গড়িয়া তোলে যে, অজানা লোকের পক্ষে সেগুলি আকাশ হইতে খুঁজিয়া বাহির করা অসম্ভব। যবদ্বীপে রাস্তাঘাটগুলি অতি চমৎকার। যে কোন স্থানেই বিপদ দেখা দেউক না কেন ঐ সমস্ত পথ দিয়া ত্বরায় সৈন্য পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। ওলন্দাজদের নৌ-বহর ইতিমধ্যেই তাহাদের রণশক্তির প্রমাণ দিয়াছে। গতকল্য জাপানীরা একটি প্রবল বিমানবহর লইয়া সুরাবায়া আক্রমণ করিতে যাইয়া যেরূপ নাজেহাল হইয়া আসিয়াছে, তাহাতেই ওলন্দাজ বৈমানিকদের শৌর্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন হইয়াছে। সিঙ্গাপুরের জন্য যে সমস্ত রণবল প্রেরিত হইতেছিল সেই সমস্ত রণবলের সুবিধাও তাহারা পাইবে। যবদ্বীপীরা কোনপ্রকার ত্যাগ স্বীকারেই কুণ্ঠিত হইবে না। প্রতি পর্ব্বত কন্দর, গহন অরণ্য এবং গ্রাম হইতে তাহারা যুদ্ধ করিবে। যবদ্বীপ শত্রুহস্তে সমর্পণ করা হইবে না, যবদ্বীপ পরিত্যাগ করা হইবে না, ইহাই তাহাদের দৃঢ় পণ। আর্থিক তথা রণনীতি উভয়দিক হইতেই পূর্ব্ব এশিয়াতে যবদ্বীপ একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান। স্থানটির আয়তন ছোট হইলেও এখানে এমন কতকগুলি জিনিষ প্রভূত পরিমাণে রহিয়াছে জাপানের যাহা একান্ত অভাব। তদুপরি এই স্থানটি প্রশান্ত মহাসাগরে প্রবেশের প্রধান দ্বার।'

একথা সত্য যে, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের মধ্যে এক মাত্র যবদ্বীপ বা

জাভাতেই জাপানীরা অপেক্ষাকৃত প্রবল বাধার সম্মুখীন হইয়াছিল এবং ওলন্দাজ সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ বিশেষ দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছিলেন।

২০শে ফেব্রুয়ারী '৪২।

জাভা ও বালির উপর জাপানীরা প্রায় একই সঙ্গে আক্রমণ চালায়। সুরাবায়ার নৌঘাঁটির উপর প্রথমতঃ বিমান আক্রমণের পর, তাহারা নৌবহরযোগে অগ্রসর হয়। জাভা সাগরে প্রকাণ্ড নৌ-সংগ্রামের সূচনা হয়। কিন্তু প্রথম দিনের সংবাদেই দেখা যায় জাপানীরা বলি দ্বীপে সৈন্য নামাইয়া দিয়াছে এবং বলি দ্বীপ দখলের লড়াই আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। বালিতে জাপানীদের আক্রমণ দেখিয়া মনে হয় যে, পূর্ব্ব যবদ্বীপে ও সুরাবায়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালাইবার আয়োজনও সম্পূর্ণ হইয়া আসিতেছে। ওদিকে সুমাত্রার অধিকাংশ জাপানীদের হস্তগত হওয়ায় তাহারা সেখান হইতেও পশ্চিম যবদ্বীপে আক্রমণ চালাইতে পারিবে।

* *

*

জাভা সাগরে নৌ-যুদ্ধ

২১শে ফেব্রুয়ারী। জাপ আক্রমণ পরিকল্পনা ক্রমশঃ স্পষ্টতর হইতেছে। তাহারা চারিটি তীক্ষ্ণধার ফলকের আকারে যবদ্বীপের উপর আক্রমণ চালাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে। পশ্চিম দিকে সুমাত্রা হইতে, উত্তর দিকে বোর্ণিও ও সেলিবিস হইতে এবং পূর্ব্ব দিকে বলি দ্বীপ হইতে আক্রমণ চলিতেছে। জাপানীরা বলি দ্বীপ আক্রমণ করার পূর্ব্বেই অনুমিত হইয়াছিল যে, চতুর্দ্দিক হইতে যবদ্বীপকে ঘিরিয়া ধরিবার

আয়োজন হইয়াছে। স্থলপথে ও জলপথে মিত্রবাহিনী ও নৌবহর তাহাদিগকে প্রবল ভাবে বাধা দিতেছে।

শুক্রবার সমস্ত রাত্রি ও আজ সমস্ত দিন বলি দ্বীপ দখলের জন্ত যুদ্ধ চলিয়াছে। যুদ্ধের সাধারণ অবস্থা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা হয় নাই, তবে শনিবার সন্ধ্যাকালে নৌ-দপ্তর জানাইতেছেন যে, বৃহস্পতিবার রাত্রিতে মার্কিণ ও ওলন্দাজ যুদ্ধ-জাহাজের আক্রমণে দুইখানি জাপানী ক্রুজার ও দুইখানি জাপানী ডেষ্ট্রয়ার গুরুতর ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে। একখানি জাপানী ক্রুজার বিস্ফোরিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু উহা ক্ষতিগ্রস্ত ক্রুজার, অথবা অপর কোন জাহাজ তাহা বুঝিতে পারা যায় নাই। প্রকাশ, মিত্রবাহিনী সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইতেছে। মিত্রপক্ষীয় বিমানবহর দিবাভাগে তাহাদিগকে সাহায্য করে। বর্ত্তমান যুদ্ধ যে বিরাট আকারে আরম্ভ হইয়াছে, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই। ম্যাকাসার প্রণালীর যুদ্ধের তুলনায় বলি দ্বীপের নিকটে অনেক বড় যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। উক্ত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হইয়াছে যে, টর্পেডো লাগিয়া শত্রুর একখানা ক্রুজারে আগুন ধরে ও আধ ঘণ্টা পরে উহা ফাটিয়া যায়। এইবার সর্ব্বপ্রথম ওলন্দাজ ক্রুজারগুলি আক্রমণ করিয়াছে। ইহার পূর্ব্বে উহাদিগকে ভিন্নরূপ কার্য্যে নিযুক্ত করা হইয়াছিল।

প্রকৃত পক্ষে সুরাবায়া ও যবদ্বীপের পূর্ব্ব অঞ্চল দখলের যুদ্ধে ইহাই প্রথম পর্য্যায়। বলি দ্বীপের চতুস্পার্শ্ববর্ত্তী সমুদ্রে খরস্রোত বহিয়া থাকে; সমুদ্রের মধ্যে বহু প্রবাল চূড়া আছে—উত্তাল তরঙ্গ উহার উপর প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে। সর্ব্বোপরি ঐ অঞ্চলে হিংস্র হাঙ্গরগুলি ঘোরা-ফেরা করে। কেবলমাত্র অগভীর খোলের জাহাজই উপকূলের নিকটে যাইতে পারে। সুতরাং অবতরণ করিতে হইলে জাপানী সৈন্যদিগকে

উপকূল হইতে যথেষ্ট দূরে জাহাজ রাখিয়া নৌকায় চড়িতে হইবে। তারপর তাহাদিগকে বহুদূর গিয়া ডাঙ্গায় নামিতে হইবে ; নৌকায় যতক্ষণ থাকিবে ততক্ষণ তাহাদিগকে রক্ষা করার বিশেষ কোন ব্যবস্থা থাকিবে না। অবশ্য প্রবাল চূড়ার জন্য মিত্রপক্ষীয় সাবমেরিণগুলিও ঐ অঞ্চলে যাইতে পারিবে না। সুতরাং উভয় পক্ষেই বিঘ্নের প্রশ্ন আছে।

জেনারেল ওয়াভেলের দপ্তর হইতে প্রকাশ যে, মিত্রপক্ষীয় বিমান-বহর শত্রু জাহাজের উপর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইয়াছে। বলি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্বদিকে বোমারু বিমানগুলি শত্রু সৈন্যবাহী একখানা বড় জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছে এবং কয়েকখানি ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারের উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে। আর দুইখানি ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারের উপর আক্রমণকালে শত্রু জাহাজের উপর কতকগুলি বোমা পড়িতে দেখা যায়। বলি দ্বীপের গেস আসর নামক স্থানে সৈন্য নামাইতে নিযুক্ত শত্রু জাহাজের উপর মিত্রপক্ষীয় ছোঁমারা বিমানগুলি আক্রমণ চালাইয়াছিল। ৪খানি শত্রু জাহাজের উপর কতকগুলি বোমা পড়িতে দেখা যায়।

মুসা নদীতে শত্রু বাণিজ্য-জাহাজের উপর আমাদের বিমানবহর সাফল্যের সহিত আক্রমণ চালাইয়াছে। ৮ হাজার টনের ১ খানি শত্রু জাহাজের উপর বোমা পড়ে, ৫ হাজার টনের একখানি জাহাজের কাপ্তেনের সেতুর উপর বোমা পড়ে, ৮ হাজার টনের আর একখানি জাহাজের অতি নিকটে বোমা পড়িয়াছিল।

বাংকা প্রণালীতে একখানি সৈন্যবাহী জাহাজের উপরও বোমা পড়িয়াছিল। ৫ হাজার টনের আর একখানা বাণিজ্য জাহাজের উপরও বোমা পড়িয়াছিল।

বলি দ্বীপের অদূরে মিত্রপক্ষীয় নৌবহরের আক্রমণকালে শত্রুর একখানা ক্রুজার ও একখানা ডেষ্ট্রয়ারে টর্পেডো লাগিয়াছে, আর একখানা

ক্রুজারে টর্পেডো দ্বারা আঘাতের পরে আগুন ধরিয়া গিয়াছে। উহার মধ্যে একখানা জাহাজ খণ্ডখণ্ড হইয়া গিয়াছে।

* *
*

২২শে ফেব্রুয়ারী '৪২।

মিত্রপক্ষ দাবী করিতেছেন যে, বলি দ্বীপের নিকট জাভা সাগরের প্রচণ্ড নৌযুদ্ধে জাপানীদের মোট ৪১টি জাহাজ বিনষ্ট ও ১৫টি জাহাজ জখম হইয়াছে। তৎসত্ত্বেও জাপানীরা বলি দ্বীপে অবতরণ করিয়া উহার অংশবিশেষ, এমন কি বিমান ঘাঁটি দখল করিয়া ফেলিয়াছে।

জাভা সাগরের নৌযুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিণ সমর বিভাগ জানাইতেছে—'বলি দ্বীপের উপকূলের নিকটে জাপ নৌবহরের উপর আক্রমণ চালাইবার সময় ওলন্দাজ বিমানসমূহও যোগদান করিয়াছিল। জাপ নৌবহরে দুইটি ক্রুজার, চারিটি অথবা পাঁচটি ডেষ্ট্রয়ার ও চারিটি সৈন্য-বাহী জাহাজ ছিল। নৌবহরটিকে বলি দ্বীপের দক্ষিণ-পূর্ব্ব উপকূলের নিকটে দেখা যায়। বড় বড় মার্কিণ বোমারু ও ছোঁমারা বিমান উহার উপর আক্রমণ চালায়। বোমারুগুলি ক্রুজারগুলির উপর সরাসরি তিনটি কিংবা ততোধিক বোমা নিক্ষেপ করে। সৈন্যবাহী জাহাজগুলির উপর দুইটি বোমা সরাসরি গিয়া পড়ে। মার্কিণ ছোঁমারা বিমান হইতে নিক্ষিপ্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার বোমা একটি ক্রুজার ও একটি সৈন্যবাহী জাহাজের গায়ে লাগে। চারিটি জাপ-জঙ্গী গুলীর আঘাতে পড়িয়া গিয়াছে। এই আক্রমণে কোন মার্কিণ বিমানের ক্ষতি হয় নাই। ইহার পর ১৬খানা জঙ্গীর সাহায্যে ৭খানা মার্কিণ ছোঁমারা বিমান পুনরায় জাপ জাহাজগুলির উপর হানা দেয়। এই সংগ্রামে একটি জাপ ক্রুজার গুরুতরভাবে জখম হয়। দুইটি মার্কিণ জঙ্গী ও দুইটি ছোঁমারা বিমান বিনষ্ট হইয়াছে।

আর একবার বলি দ্বীপের নিকটে তিনটি বড় বড় মার্কিণ বোমারু আর একটি জাপ ক্রুজারের উপর আক্রমণ চালায় এবং উহার উপর তিনটি বোমা ফেলে। ইহার পর আর এক বার 'উড্ডীয়মান দুর্গ' শ্রেণীর তিনটি মার্কিণ বোমারু জাপ জাহাজসমূহের উপর হানা দেয়। কিন্তু এই শেষোক্ত আক্রমণের ফল কি হইয়াছে জানা যায় নাই। এই সম্পর্কে আর একটি চমকপ্রদ বর্ণনা এই যে, বলি দ্বীপের অদূরে ওলন্দাজ ও মার্কিণ রণপোত এবং বিমান এক যোগে জাপানী যুদ্ধ জাহাজ এবং পরাপারের জাহাজগুলির উপর আক্রমণ করিয়া তাহাদিগকে দারুণ শায়েস্তা করিয়াছে। ওলন্দাজরা বিস্ময়কর বদ্ধপরিকরতার সহিত যুদ্ধ করিয়া জাপানীদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছে যে, তাহাদের নিজেদের দাওয়াই কত তিতা! জাপানীদের ক্ষতির লেখাজোখা নাই। ভাইস-এডমিরাল হেলফ্রিস সবেমাত্র নৌবাহিনীর অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করিয়াছেন। এই পদ গ্রহণ করিয়াই তিনি তাঁহার কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। সকল দিক ভাল করিয়া হিসাব করিয়া তিনি এমন এক স্থানে জাপানী নৌবহর আক্রমণ করিয়া বসেন, যেথানে জাপানের পক্ষে তাহার প্রধান বহরের সাহায্য পাইবার সুবিধা নাই। জলভাগে ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ার এবং আকাশ পথে বিমানসহ তিনি জাপানীদের উপর হানা দেন। জাপানীদের যে ঠিক কত ক্ষতি হইয়াছে তাহার হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে তাহাদের অন্ততঃ ৪১টি জাহাজ যে বিনষ্ট এবং ১৫টি যে জখম হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। মিত্রপক্ষের মাত্র একটি ডেষ্ট্রয়ার মারা গিয়াছে। তারপর আরও একটা কথা আছে। আকাশ হইতে যেমন বোমা ফেলা হইয়াছে, যুদ্ধ-জাহাজ হইতে তেমনই টর্পেডো মারা হইয়াছে ও কামানের গোলা ছাড়া হইয়াছে। টর্পেডো ও কামানের গোলাগুলী সম্ভবতঃ আকাশ হইতে ফেলা বোমা অপেক্ষা অনেক বেশী মারাত্মক

হইয়াছে। কাজেই ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে যে, জখমী জাহাজগুলির কয়েকটি একেবারে অচল হইয়াই পড়িয়াছে। জাপানীরা সম্ভবতঃ মাকাসার প্রণালী ছাড়া অন্য কোথাও এতবড় মার খায় নাই।

* *
*

উপরে যে সমস্ত আশাব্যঞ্জক রোমাঞ্চকর বর্ণনা দেওয়া গেল, তাহা হইতে এমন ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, জাপানীরা সহজে জাভা দখল করিতে পারিবে না। কারণ, সমুদ্রপারবর্ত্তী দ্বীপ দখলের জন্য যে নৌবহরের প্রয়োজন যদি তাহা ঘায়েল হইয়া যায়, তবে, সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তার করা যায় না। ফলে জাহাজযোগে সৈন্যদল আনয়ন বা অবতরণ সম্ভব নহে। কিন্তু এই বর্ণনার মধ্যে যে অতিশয়োক্তি ছিল, তাহার প্রমাণ এই যে, ইহার দুই দিন পরেই যব দ্বীপের অবস্থা বিপজ্জনক হইয়া উঠিল। জাপানীরা উত্তর, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে কতকগুলি ঘাঁটি দখল করিয়া লইল। জেনারেল ওয়াভেল, যিনি দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহা-সাগরের সর্ব্বপ্রধান অধিনায়ক ছিলেন, তিনি তাঁহার প্রধান শিবির সুরাবায়া পরিত্যাগ করিয়া ভারতবর্ষে চলিয়া যান। জাভা রক্ষার ভার ওলন্দাজ সেনাপতিদের হাতে দেওয়া হয়। জাভার রাজধানীও ব্যাণ্ডোয়েংয়ে স্থানান্তরিত হয়। যদি জাভা সাগরের নৌযুদ্ধে জাপানীদের চূড়ান্ত পরাজয় হইত, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এত দ্রুত যব দ্বীপের বিপদ ঘটিত না। অপর পক্ষে জাপানীরা দাবী করিয়াছিল যে, জাভার নৌ-যুদ্ধে বিশেষ ভাবে ওলন্দাজবহর ঘায়েল হইয়া গিয়াছে। উভয় পক্ষের দাবীর অতিশয়োক্তি বাদ দিলে ইহাই মনে হইবে যে, জাপানীরা প্রচুর ক্ষতি সত্ত্বেও জাভার নানা স্থানে সৈন্য নামাইতে পারিয়াছে। অর্থাৎ নৌবহরের ক্ষতির দ্বারা তাহাদের অভিযানের গতি রুদ্ধ হয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

---

(৪)

যব দ্বীপের পতন

৬ই ও ৯ই মার্চ্চ,'৪২।

জাভার পশ্চিমে সুমাত্রা, উত্তরে বোর্ণিও এবং পূর্ব্বে সেলিবিস, এগুলি জাপান আগেই দখল করিয়া লইয়াছিল। তারপর অতি দ্রুত বলি দ্বীপ দখল করিয়া জাপানীরা এই তিন দিক হইতে জাহাজ, বজরা ও বিমান বহরের সাহায্যে যব দ্বীপকে ঘিরিয়া ধরিল। তিনটি ফলকের মত তাহারা জাভাকে তিন স্থানে বিদ্ধ করিল। পশ্চিম প্রান্তে বানটাংয়ে নামিয়া একদল রাজধানী বাটাভিয়াকে দক্ষিণ হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিল। বাটাভিয়া হইতে ১০০ মাইল দক্ষিণে বাণ্ডোয়েং, বাটাভিয়ার পর এখানেই ওলন্দাজদের প্রধান সমর শিবির স্থাপিত হইয়াছিল। জাপানীরা এই দুই সহরের মধ্যস্থলে প্রবেশ করিয়া ইহাদিগকে দুই প্রান্তে

বিচ্ছিন্ন করার কৌশল অবলম্বন করিল। দ্বিতীয় দল ইন্দ্রমায়ুতে অবতরণ করিয়া প্রথম দলকে সাহায্য করিবার জন্য ব্যাণ্ডোয়েংের দিকে অগ্রসর হইল। জাভার প্রধান নৌঘাঁটি সুরাবায়া, ইহার পশ্চিমে রেমবাং। জাপানীদের তৃতীয় দল রেমবাংয়ে নামিয়া সুরাবায়ার দিকে অভিযান করিল। সহজ ভাষায় বলা যাইতে পারে পশ্চিমে বাটাভিয়া, পূর্ব্বে সুরাবায়া এবং দক্ষিণে ব্যাণ্ডোয়েং—জাভার এই তিন প্রাণকেন্দ্র জাপানীরা একই সঙ্গে বর্শার অগ্রভাগের মত বিদ্ধ করিতে থাকে। উত্তর দিকের বিস্তৃত সমতল ভূমিতে জাপানীদের আক্রমণের বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল। কারণ, প্রকৃতির কোন বিঘ্ন ছিল না। কিন্তু যব দ্বীপের অন্যতম ঘাঁটি ব্যাণ্ডোয়েং পর্ব্বতমালার মধ্যে অবস্থিত। জেলিয়াংজাপ নামক একটি ভালো পোতাশ্রয়ের সহিত ইহা রেলপথ ও রাজপথের দ্বারা সংযুক্ত। জাপানীরা ব্যাণ্ডোয়েংের দিকে সাঁড়াশির আকারে চাপ দিল—পশ্চিম উপকূল এবং ইন্দ্রমায়ু হইতে। বিভিন্ন স্থান হইতে একযোগে আঘাত হানিয়া জাপানীরা শীঘ্রই ওলন্দাজদের আত্মরক্ষার ব্যূহগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিল। রণকৌশলের দিক হইতে তাহারা কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য নীতি অবলম্বন করিয়াছিল। বৃহৎ ও ভারী যন্ত্র এবং প্রকাণ্ড আকৃতির অস্ত্র তাহারা জাভায় আনে নাই। তবে, যাহা কিছু অস্ত্র, যন্ত্র ও বিমান এবং সৈন্যদল তাহারা লইয়া আসিয়াছিল, সেগুলি সমস্তই সংখ্যা শক্তিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। বে-সরকারী অনুমান এই যে, অভিযাত্রী জাপ-বাহিনীতে ৭ ডিভিসন বা কমপক্ষে ১লক্ষ সৈন্য ছিল। ট্যাঙ্ক, ট্রেঞ্চ-মর্টার ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিতেও জাপানীরা শ্রেষ্ঠ ছিল। অর্থাৎ সমস্ত দিক দিয়াই ওলন্দাজদের তুলনায় জাপানের শক্তি ৫গুণ বেশী ছিল। যেখানে আক্রমণকারী এত বেশী শক্তি নিয়োগ করিতে পারে সেখানে কেবল সংখ্যার দ্বারাই আত্মরক্ষাকারীকে ঘায়েল করা যায়। তথাপি ওলন্দাজবাহিনী

যথেষ্ট বীরত্ব এবং দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছিল। কৌশলের দিক দিয়া জাপানীরা স্থানে স্থানে সূচিভেদ নীতি বা infiltration taotics অবলম্বন করিয়াছিল। ছোট ছোট দল হাল্‌কা অস্ত্রশস্ত্র অর্থাৎ রাইফেল, মেসিনগান ও ক্ষুদ্রাকৃতির মর্টার লইয়া যত্রতত্র অবতরণ করিয়া দেশের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করিতেছিল। ইহাদের পরণে গুরুতর বর্ম্মাচ্ছাদন ছিল না। হাল্কা রবারের জুতা ও হাফ-প্যাণ্টই ইহাদের পোষাক। ইহারা সাধারণতঃ ছোট মেশিনগান বা রাইফেল হাতে সাইকেলে চড়িয়া অলিগলি দিয়া ইচ্ছামত আক্রমণ চালাইয়াছে। এই প্রকার রণকৌশলের উদ্দেশ্য জনসাধারণকে আতঙ্কগ্রস্ত করিয়া দেওয়া এবং আভ্যন্তরীণ যাতায়াতের ও খবরাখবরের ব্যবস্থা ধ্বংস করিয়া স্থানীয় আত্মরক্ষাবাহিনীর পশ্চাতে ঘোরতর বিপর্য্যয় আনয়ন করা।......

শেষের দিকে জাপ আক্রমণের গতি বিশ্লেষণ করিলে দ্বীপ দখলে জাপানীদের কৌশল কিঞ্চিৎ স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

পশ্চিম জাভায় ইন্দ্রমায়ু হইতে বাটাং পর্য্যন্ত ৩০ মাইল প্রশস্ত হইয়া দ্বীপের উত্তর অংশে বরাবর সমতল ভূমি বিস্তৃত। এই ভূমির পশ্চিম ভাগে সমুদ্রকূলে জাভার রাজধানী বাটাভিয়া অবস্থিত। জাপানী বোমারুদল প্রথমে নির্ম্মমভাবে বোমাবর্ষণ করিয়া বাটাং ও ইন্দ্রমায়ু অঞ্চলে মিত্রপক্ষের সমরশক্তিকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। এইভাবে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিবার পর জাপানীরা সৈন্যের পর সৈন্যদলকে স্বল্প ও হাল্কা অস্ত্রে সজ্জিত করিয়া জাহাজযোগে এই সমতল ভূমিতে অবতরণ করাইয়া দেয়। বাটাংয়ে যে দল অবতরণ করে তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল বাটাভিয়ার দক্ষিণ দিয়া অগ্রসর হইয়া এই সহরকে বিচ্ছিন্ন করা এবং ইন্দ্রমায়ুতে যে দল অবতরণ করে প্রথমে তাহাদের মতলব ছিল, বরাবর সমুদ্রকূলের সমতল ভূমি ধরিয়া বাটাভিয়ার দিকে

অগ্রসর হওয়া—অর্থাৎ ছোটখাট সাঁড়াশী আক্রমণে বাটাভিয়াকে চাপিয়া মারিবার চেষ্টা। এই অবস্থার সম্মুখীন হইবা মাত্র মিত্রপক্ষ বাটাভিয়া ত্যাগ করিয়া দ্বীপের দক্ষিণ অংশে উচ্চ ভূমির উপর অবস্থিত ব্যাণ্ডোয়েং-এ সামরিক কেন্দ্র সরাইয়া লন। ফলে বাটাং হইতে যে শত্রুদল অগ্রসর হইতেছিল তাহারা সহজেই বাটাভিয়া দখল করে এবং ইন্দ্রমায়ু হইতে পশ্চিমমুখী শত্রু বাহু বাটাভিয়ার দিকে আর না গিয়া ব্যাণ্ডোয়েংকেই লক্ষ্য করে। এই পথেই সোয়েবঙ্গ সহর ও কালিকাজাতি বিমান ঘাঁটি। জাপানীরা প্রবল বোমাবর্ষণ করিয়া বিমান ঘাঁটি বিধ্বস্ত করে। ওলন্দাজ-বাহিনী অপূর্ব্ব বীরত্বসহকারে শত্রুর এই বাহুকে—যেখানে সমতল ভূমি শেষ হইয়া উচ্চ ভূমি সুরু হইয়াছে, সেখানে পাল্টা আক্রমণে বাধা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু বোমারু ও জঙ্গী বিমানের সাহায্য ব্যতিরেকে তাহাদের সে আক্রমণ মন্দীভূত হইয়া যায়।

৯ই মার্চ্চের মধ্যে জাভার অধিকাংশ স্থানে ওলন্দাজদের প্রতিরোধ শক্তি নষ্ট হইয়া যায় এবং জাপানীরা একে একে বাটাভিয়া, সুরাবায়া, ব্যাণ্ডোয়েং, ইন্দ্রমায়ু ইত্যাদি দখল করিয়া লয়। যব দ্বীপের কেন এই দ্রুত শোচনীয় পরিণতি ঘটিল সেই সম্পর্কে একটি আধা-সরকারী বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে। পাঠকদের সুবিধার জন্য এখানে উহার অধিকাংশ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। ৭ই মার্চ্চের বিবরণে বলা হইয়াছে :—

'জাপানীরা অধিকতর বলসহ সুবিখ্যাত টুংকুয়াপ্রবু আগ্নেয়গিরির উত্তরভাগে রক্ষী ব্যূহ ভেদ করিবার ফলে যব দ্বীপের অবস্থা, বিশেষ করিয়া এই দ্বীপের পশ্চিম খণ্ডের অবস্থা সঙ্কটজনক করিয়া তুলিয়াছে। ওলন্দাজ পক্ষীয় সৈন্যগণ শত্রুদিগকে প্রাণপণ বাধা দিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সংখ্যায় অনেক কম

বলিয়া আঁটিয়া উঠিতে পারে নাই। অধিকন্তু জাপানী বিমান এরূপ প্রবলভাব ধারণ করিয়াছে যে, আর উপযুক্ত প্রতিরোধ করার কোন শক্তি ওলন্দাজদের নাই। এই আগ্নেয়গিরির উত্তর ভাগস্থ সামুদেশ অতি শান্তিপূর্ণ স্থান ছিল। সহস্র সহস্র লোক এই অঞ্চলের রমণীয়তা দেখিয়া মুগ্ধ হইত। এখন এখানে যে ধ্বংসলীলা চলিতেছে তাহা সত্যই হৃদয়-বিদারক। ওলন্দাজদের যখন মনে পড়ে যে, মালয় রক্ষার ব্যর্থ চেষ্টায় তাহাদের বিমানবলের অধিকাংশ অযথা ক্ষয় হইয়াছে, তখন তাহাদের দুঃখ আরও বৃদ্ধি পায়। মালয় এবং সিঙ্গাপুরের তুলনায় যবদ্বীপের অবস্থা অধিকতর প্রতিকূল; কেন না এখানে জাপানীদের শক্তি ওলন্দাজদের চেয়ে অন্ততঃ পাঁচ গুণ বেশী হইবে। বিমানবলের তুলনাই হয় না। এবিষয়ে জাপানীরা সম্পূর্ণ প্রাধান্য লাভ করিয়াছে।

৮ই ডিসেম্বর যখন জাপানীরা আমেরিকা ও বৃটেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে, তখন ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ মিত্রবর্গের সাহায্যকল্পে সমগ্র বিমান ও নৌ-শক্তি নিয়োগ করে। যে সমস্ত দেশ অত্যাচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছে সে সমস্ত দেশেই ওলন্দাজদের এই কার্য্য প্রশংসিত হইয়াছে। এই কার্য্যের মধ্যে একটা বিপদও ছিল। কারণ, ইহাতে ওলন্দাজদের শক্তি দ্রুত ক্ষয় হইয়াছে। কিন্তু অবিলম্বে সাহায্য আসিয়া পৌছিবে, এই ভরসাতেই ঐ বিপদের ঝুঁকি লওয়া হইয়াছিল। বস্তুতঃ এরূপ ব্যবস্থাও করা হইয়াছিল যাহাতে ত্বরায় সাহায্য আসিয়া পৌছিতে পারে। মিত্রবর্গের পূর্ব্ব এশিয়ায় যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র যব দ্বীপে স্থাপন করা হয়। তাহাতেই বুঝা যায় যে, মালয় ও সিঙ্গাপুরের পতন হইলে যব দ্বীপকে ঘাঁটি করিয়াই মিত্রবর্গ পাল্টা আক্রমণ আরম্ভ করিবেন। বহু সৈন্য আনিয়া যাহাতে দ্রুত সমাবেশ করা যায় তেমন ব্যবস্থাও করিয়া রাখা হইয়াছিল। আশা করা গিয়াছিল যে, যদি জাপানীদিগকে কিছুকাল

ঠেকাইয়া রাখা যায়, তবে সে সমস্ত সৈন্য আসিয়া পড়িবে এবং তাহাদিগকে কাজে লাগানো যাইবে।

'জানুয়ারী মাসে বহিঃপ্রদেশগুলি একে একে হাত ছাড়া হয়। তখন আশা করা গিয়াছিল যে, ঐ প্রদেশগুলি আপাততঃ হাতছাড়া হইলেও ফেব্রুয়ারী মাসে সাহায্য আসিয়া পৌছিবেই। তাহা হইলেই যব দ্বীপকে রক্ষা করা যাইবে এবং পরে সেখান হইতে পাল্টা আক্রমণ করা যাইবে। কিন্তু এই প্রত্যাশিত সাহায্য কোনও কালেই আসিল না। প্রকৃতপক্ষে জাভায় মিত্রপক্ষের সৈন্য অতি কম। তাহারা ওলন্দাজ ও যবদ্বী পী সৈন্যদের পাশে দাঁড়াইয়া সোৎসাহে যুদ্ধ করিতেছে বটে, কিন্তু জাপানীদের গতি রোধ করিতে পারে নাই। আক্রমণাত্মক কার্য্যে ওলন্দাজ রণবহর ও বিমানগুলি খুব সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্তও হইতে হইয়াছে খুবই বেশী। তাহাদের ক্ষয় পূরণের জন্য নূতন সাহায্য পাওয়া যায় নাই। যে কয়টি মার্কিণ বোমারু আসিয়াছিল সেগুলিকে রক্ষা করিয়া চলার মত এবং বিমান ময়দানগুলি রক্ষা করার মত জঙ্গীর অভাবে মার্কিণ বোমারুগুলির কার্য্যকারিতা অনেক হ্রাস পাইয়াছিল। যে কয়টি জঙ্গী বিমান ছিল সেগুলিও যোগ্যতায় জাপানীদের সমকক্ষ নহে। ফলে জাপানীদের বড় বড় বোমারুর আক্রমণ বৃদ্ধি পাইবার সঙ্গে সঙ্গে মিত্রপক্ষের আক্রমণ শক্তি হ্রাস পাইতে থাকে।

'ফেব্রুয়ারী মাসের শেষভাগে অবস্থা এরূপ দাঁড়ায় যে, যবদ্বীপ কার্য্যতঃ চতুর্দ্দিক হইতে শত্রু পরিবেষ্টিত হইয়া পড়ে। সংখ্যাবলে বলীয়ান শত্রুরা যে সময় যবদ্বীপ আক্রমণ করে, সে সময় ওলন্দাজ রণবহরের সারভাগ বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই ক্ষতির দুঃখ বড় বটে, কিন্তু সন্তুষ্টির কথা এই যে, এই ক্ষতি বৃথা যায় নাই। ওলন্দাজ নৌবহর মরণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিয়াছে। ২৬শে ও ২৭শে ফেব্রুয়ারী জাভা সাগরে যে যুদ্ধ হয়

উহার ফলে সুরাবায়া ঘাঁটি ক্রুজারের পক্ষে অব্যবহার্য্য হইয়া পড়ে। এই ঘাঁটিটিকে বড় বোমারুর আক্রমণ হইতে রক্ষা করার কোনও ব্যবস্থা ছিল না। গত শনিবার রাত্রিতে যখন জাপানীরা আক্রমণ করে তখন তাহাদিগকে প্রবল বাধা দেওয়া হয়। নামিতে চেষ্টা করিতে যাইয়া অনেক জাপানী নিহত হয় বটে, কিন্তু ওলন্দাজ পক্ষেও প্রচুর লোক ক্ষয় হয়। অত্যধিক সংখ্যায় জাপানীরা আসিয়া বাণ্ডাং, ইন্দ্রমায়ু এবং রেমবঙ্গে কম পক্ষে ৭ ডিভিসন সৈন্য নামায়। জলে ও আকাশে এভাবে প্রতিরোধ দূর হওয়ার পর জাপানীরা কার্য্যতঃ খোলা মাঠ পাইয়া বসে। তাহারা যত খুসী সৈন্য ও সমরসম্ভার নামাইবার সুবিধা লাভ করে। তাহাদিগকে বাধা দিবার মত কিছুই থাকে না। জাপানীরা ইন্দ্রমায়ু হইতে সোয়েবঙ্গ এবং কালিকাজাতি বিমান ঘাঁটি পর্য্যন্ত অগ্রসর হয়। তাহারা টংকুয়াপ্রবুর উত্তর ভাগস্থ প্রান্তরে আসিয়াও পৌছে। জাপানীদের পরবর্ত্তী উদ্দেশ্যের প্রতীক্ষা না করিয়াই ওলন্দাজরা তাহাদিগকে পাল্টা আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে।

'ব্যাণ্ডোয়েং হইতে কালিকাজাতি বিমান' ঘাঁটিতে যে আক্রমণ হয়, তাহাতে প্রমাণিত হয় যে, স্থল সেনারা যত অসমসাহসিকই হউক না কেন, বিমান বলের দ্বারা সুরক্ষিত না থাকিলে তাহারা কিছুতেই আক্রমণ চালাইতে পারে না। ওলন্দাজ সৈন্যদিগকে জাপানীদের ছোঁমারা বিমান অবিরাম বিব্রত করিয়া তুলিতেছিল। তথাপি তাহাদের সাহস অতি দুর্দ্ধর্ষ ছিল। এক একটি ওলন্দাজ সৈন্য যে বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে, ইতিহাসে তাহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। কিন্তু এই নরমেধ যজ্ঞের বিশাল অগ্নিকুণ্ড হইতে পরিত্রাণ পাইবার কোনও উপায়ই তাহাদের ছিল না। ইন্দ্রমায়ুতে যে সমস্ত জাপানী অবতরণ করিয়াছিল, তাহাদের উপর স্থানে স্থানে প্রত্যাক্রমণ হয়। কোনও কোনও ক্ষেত্রে অসীম সাহসের সহিত

এই প্রত্যাক্রমণ ঘটিয়াছিল। দুই এক স্থানে পার্শ্ব আক্রমণ অংশতঃ সফলও হইয়াছিল। কিন্তু মোটের উপর এই সমস্ত প্রত্যাক্রমণ ব্যর্থ হইয়াছে। এখানেও সেই একই কাহিনী। আকাশপথ রক্ষা না করিতে পারিলে স্থল সৈন্য কোন কাজেই লাগে না।

'যবদ্বীপে যেখানে হাজার হাজার বিমানের প্রয়োজন ছিল, সেখানে বিমান সংখ্যা ক্রমেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে থাকে। ফলে বাটাভিয়াস্থ ওলন্দাজ সৈন্যগণ বাটাভিয়া ছাড়িয়া ব্যাণ্ডোয়েঙ্গে চলিয়া যায়। এই স্থানটির ভৌগোলিক অবস্থান এরূপ যে, এখান হইতে যুদ্ধ করা অনেক সুবিধা-জনক। সোয়েবঙ্গ হইতে ব্যাণ্ডোয়েঙ্গের প্রবেশ পথটি রক্ষা করা প্রধান কার্য্য হইয়া দাঁড়ায়। এখানে ওলন্দাজ সৈন্যেরা ইতিহাসের এক অপূর্ব্ব বীরত্বের অধ্যায় রচনা করে। দুই দিন পর্য্যন্ত মুহূর্ত্তের বিশ্রাম না লইয়াও তাহারা এই প্রবেশ পথটি রক্ষা করে। কিন্তু শেষে উহা রক্ষা করা একেবারে অসম্ভব হইয়া পড়ে।'

* *

*

এই বর্ণনার মধ্যে যে শোচনীয় অবস্থার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে উহার বিশ্লেষণ অনাবশ্যক। ক্রীট হইতে মালয় এবং যবদ্বীপ পর্য্যন্ত মিত্রশক্তির সেই এক কাহিনী। বিমানবল, সৈন্যবল, অস্ত্র ও সমরোপকরণের শক্তি সমস্তই কম এবং এত কম যে, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার সর্ব্বত্র বিদ্যুৎগতি ভাগ্য বিপর্য্যয়! বালি ও জাভার পতনের সঙ্গে ওলন্দাজদের সুদূর প্রাচ্যের ঐশ্বর্য্যশালী সাম্রাজ্য জাপানের হাতে চলিয়া গেল। নূতন সাম্রাজ্যবাদ পুরাণো সাম্রাজ্যবাদকে গ্রাস করিল!

ষষ্ঠ অধ্যায়

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের পতন

(১)

ফিলিপাইনের বিপদ

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমাদের দেশে একেবারে অপরিচিত নহে। আমেরিকার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল স্বাধীনতা আন্দোলন করিয়া ফিলিপাইন দ্বীপ পরাধীন ভারতবর্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। অতি সংক্ষেপে ইহার পরিচয় দিয়া বলা যাইতে পারে যে, জাপান ও ফরমোজা হইতে দক্ষিণে, শুয়াম হইতে পশ্চিমে, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে উত্তরে এবং দক্ষিণ চীন সাগর হইতে পূবদিকে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ অবস্থিত। ৭ হাজার ৮৩টি দ্বীপ লইয়া ফিলিপাইন গঠিত। কিন্তু এই অসংখ্য দ্বীপের সমস্তগুলির নামাকরণও সম্ভব হয় নাই। ইহার মধ্যে মাত্র কয়েকটি বড় দ্বীপই উল্লেখযোগ্য। ফিলিপাইন দ্বীপের উৎপত্তি মূলতঃ

আগ্নেয়গিরি হইতে, সুতরাং ইহাতে অনেক বড় বড় পাহাড় এবং অসংখ্য হ্রদ ও নদী আছে।• সমতল ভূমি উর্ব্বর ও শস্যশালী এবং খনিজ সম্পদও এখানে প্রচুর। ইহার মধ্যে সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য সোণা, তারপর রূপা, তামা, সীসা, লোহা, প্লাটিনাম, ম্যাঙ্গানিজ এবং গন্ধক ইত্যাদিও যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এখানকার তামাক ও চুরুট প্রসিদ্ধ। অরণ্য ভূমিতে মূল্যবান বৃক্ষ ও জন্তু-জানোয়ার আছে। এই দ্বীপপুঞ্জের মোট আয়তন ১লক্ষ ১৫হাজার বর্গ মাইল এবং লোক সংখ্যা ১২৩৫৩৮০০। ফার্ডিনাণ্ড ম্যাগেলান নামে প্রসিদ্ধ পর্ত্তুগীজ নাবিক ১৫২১ খৃষ্টাব্দে এই দ্বীপ প্রথম অবিষ্কার করেন। ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে অনেকগুলি লড়াইয়ের পর স্পেনীয়গণ এই দ্বীপ দখল করেন এবং ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইহা স্পেনের অধিকারে থাকে। তারপর উহা সন্ধিপত্রানুসারে আমেরিকার দখলে যায়। কিন্তু ফিলিপাইনের অধিবাসীরা আমেরিকার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে এবং দুই বৎসর পর সেই বিদ্রোহ প্রশমিত হয়। পরবর্ত্তীকালে দীর্ঘকালের আন্দোলনের ফলে এবং মার্কিণ গণতান্ত্রিকনীতির প্রভাবে একমাত্র দেশ-রক্ষা বিভাগ ও যুদ্ধের প্রয়োজন ছাড়া অন্যান্য ব্যাপারে ফিলিপাইনের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন স্বীকার করা হয়।......

মার্কিণ নৌবল ও নৌ-আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার জন্য জাপান যেমন যুদ্ধের গোড়াতেই বিভিন্ন মার্কিণ নৌঘাঁটির উপর আক্রমণ চালাইয়াছিল ফিলিপাইনের উপরও তেমনই তাহাদের আক্রমণ নিবদ্ধ হইয়াছিল। এই যুদ্ধকে আমরা অত্যন্ত সংক্ষেপে বর্ণনা করিব এবং মাত্র কয়েকটি তারিখ উল্লেখ করিয়া ইহার চূড়ান্ত গতি নির্ণয় করিব।

* *
*

১লা জানুয়ারী '৪২।

হংকং ও গুয়ামের পতনের পর ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের বিপদ অনিবার্য্য ছিল। কারণ, দুই পার্শ্বের ইঙ্গ-মার্কিণ নৌ-ঘাঁটি বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় ফিলিপাইনকে কেবলমাত্র নিজের আভ্যন্তরীণ আত্মরক্ষার শক্তির উপর নির্ভর করিতে হইয়াছে। আধুনিক যুদ্ধের দূরবর্ত্তী ঘাঁটিসমূহ নষ্ট হইয়া গেলে আভ্যন্তরীণ আত্মরক্ষার ব্যূহগুলির উপর এত প্রচণ্ড চাপ কেন্দ্রীভূত হয় যে, শত্রুর তুলনায় অপরিমিত শক্তি ছাড়া উহাকে রক্ষা করা কঠিন। কিন্তু শত্রুর তুলনায় অধিক শক্তি থাকা দূরের কথা ফিলিপাইনের সৈন্য সংখ্যা ও অস্ত্র সংখ্যা অনেক কম বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল ম্যাক-আর্থার এত কম শক্তি লইয়া লড়িতেছেন যে, রাজধানী ম্যানিলার পতন আসন্ন বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। মোটামুটিভাবে বলা যাইতে পারে যে, প্রায় দুই সপ্তাহ ধরিয়া ফিলিপাইনের উপর আক্রমণ চলিতেছে এবং এই আক্রমণ প্রচণ্ডভাবে সুরু হইয়াছে ২২শে ডিসেম্বর হইতে। ঐ দিন ৮০খানা জাপানী জাহাজকে ম্যানিলার ১৫০ মাইল উত্তরে লিঙ্গায়েন উপসাগর (উত্তর ফিলিপাইনের লুজন দ্বীপ) অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা গিয়াছিল। এই সমস্ত জাহাজে ৮০ হাজার হইতে ১ লক্ষ জাপ সৈন্য ছিল। শক্তিশালী নৌ ও বিমানবহরের সহযোগিতায় জাপবাহিনী অগ্রসর হইয়াছে এবং রাত্রি বেলা বহু স্থানে অবতরণ করিয়াছে। সাধারণতঃ দূর হইতে জাহাজযোগে অভিযান এবং প্রচুর সৈন্যের অবতরণ অত্যন্ত দুঃসাধ্য। সমর বিশেষজ্ঞগণ বলেন যে, এই ধরণের অভিযান দুরূহতম রণনীতির পর্য্যায়ে পড়ে। কারণ, জল, স্থল ও বিমানবাহিনীর পরিপূর্ণ সহযোগিতা ও ঘড়ির কাঁটার মত সুশৃঙ্খল নিয়মানুবর্ত্তিতার প্ল্যান ছাড়া এই ধরণের
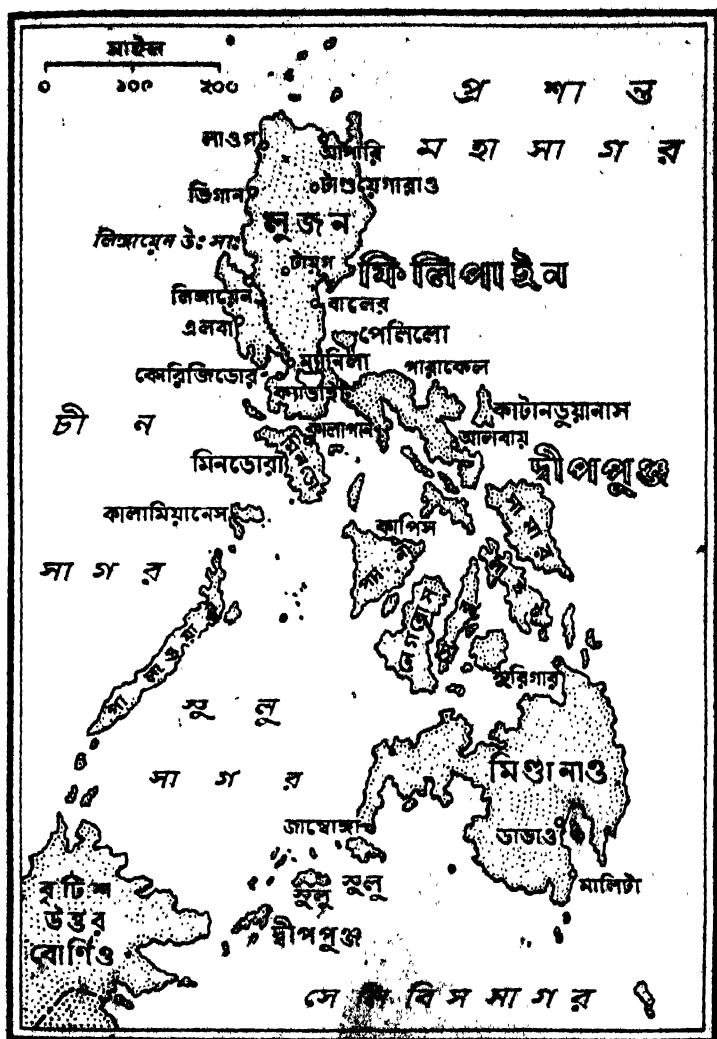
অভিযান চলিতে পারে না। জাপানীরা ৮০খানা জাহাজযোগে ১ লক্ষ সৈন্য লইয়া অগ্রসর হইল, দূর হইতে ফিলিপাইনের সমরকর্ত্তাগণ তাহা প্রত্যক্ষ করিলেন, অথচ এই প্রকাণ্ড নৌবহরকে তাঁহারা সমুদ্র পথে ঠেকাইতে পারিলেন না! এতগুলি জাহাজের একযোগে আগমন ঝাঁক বাঁধিয়া পক্ষীদলের উড়িবার মত এবং যে কোন কাঁচা শিকারীও এই ঝাঁকের উপর গুলী চালাইলে বহু পাখী মারিতে পারিতেন! কিন্তু ৮০ খানা জাপ জাহাজের কয়খানা ফিলিপাইনের হাতে মারা পড়িয়াছে, তাহার কোন সংবাদ নাই। ইহার পরেই ফিলিপাইনের উপর আক্রমণ প্রচণ্ড হইয়াছে, শত্রুকে দূরে বাধা দিতে না পারিলে হাতের কাছে প্রতিরোধ করা একান্ত কঠিন।

ফিলিপাইনকে সাধারণতঃ তিন অংশে ভাগ করা যায়। উত্তরাংশে লুজন, মধ্য অংশে মিনডোরা এবং দক্ষিণাংশে মিণ্ডানাও দ্বীপ। জাপানীরা প্রথমতঃ উত্তরাংশেই সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র আক্রমণ চালাইয়াছে। কারণ ইহারই নিম্নাংশে রাজধানী ম্যানিলা। এই ম্যানিলার উপর উত্তর ও দক্ষিণ দিক হইতে একযোগে চাপ পড়িয়াছে। প্রধানতঃ লিঙ্গায়েন উপসাগরের তীর ধরিয়া এবং কোরিজিডোর নৌদুর্গের উপর লক্ষ্য করিয়া আক্রমণ চালানো হইয়াছে। আক্রমণের প্রথম পর্ব্ব সুরু হইয়াছে তীব্র বোমা বর্ষণের দ্বারা। মনে হয় প্রচুর এরোপ্লেনের সাহায্যে নৌ-বহর অগ্রসর হইয়াছে এবং এই এরোপ্লেনকে উপযুক্ত বাধা দিতে না পারাতেই জাপ সৈন্যেরা দলে দলে জাহাজযোগে অবতরণ করিতে পারিয়াছে। কোরিজিডোরকে এখানকার জিব্রাল্টার নৌ-দুর্গের সহিত তুলনা দেওয়া হইয়াছে। ম্যানিলার দিকে প্রবেশ পথে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা সুরক্ষিত ঘাঁটি। লিঙ্গায়েন ও কোরিজিডোরকে দুই দিক হইতে একই সময়ে বিপন্ন করিয়া ম্যানিলার উপর প্রবল চাপ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং মাঝখানে

পড়িয়া ম্যানিলা অতি দ্রুত 'অরক্ষিত সহর' বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছে। নৌ-দুর্গকে ঘায়েল করিবার প্রধান সম্বল যুদ্ধ-জাহাজ হইতে গোলাবর্ষণ। কোরিজিডোরে গোলাবর্ষণ ও বোমাবর্ষণ দুইই ঘটিয়াছে এবং জেনারেল ম্যাক-আর্থারের সৈন্যদল অতি শীঘ্র আরও দক্ষিণে হটিতে বাধ্য হইয়াছে। জাপানের দুই বাহু ম্যানিলা হইতে ৩৫ মাইল দক্ষিণে সম্মিলিত হইবে বলিয়া প্রকাশ।

ফিলিপাইনের অবস্থা দুঃখজনক। জাপানী আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্ম-রক্ষার যে পরিমাণ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া উচিত ছিল, তাহা করা হয় নাই। অন্যথা দূর হইতে সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া কিভাবে দলে দলে জাপানী পদাতিক, ট্যাঙ্কবাহিনী এবং অশ্বারোহী বাহিনী ফিলিপাইনে অবতরণ করিল? প্রকাশ যে, যুদ্ধ বিদ্যায় দক্ষ (veteran) সেনানীগণ এই সমস্ত জাপবাহিনীর সহিত রহিয়াছে এবং তাহারা আধুনিক যুদ্ধের সমস্ত সাজসরঞ্জাম (modern equipment) লইয়া অবতরণ করিয়াছে এবং অশ্বারোহীবাহিনীও সঙ্গে আনিয়াছে। আধুনিক যুদ্ধে ট্যাঙ্কের আধিপত্যের দরুণ ঘোড়া বাতিল হইয়া গিয়াছিল। কেবল রুশ রণাঙ্গনের জার্ম্মাণ যুদ্ধে শীতকালে সোভিয়েট সৈন্যেরা অশ্বারোহীবাহিনী ব্যবহার করিয়াছিল। রাশিয়ার কসাকবাহিনী উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী সৈন্য, ইহাদিগকে আধুনিক কায়দায় সজ্জিত করিয়া জার্ম্মাণদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এবং সেই যুদ্ধ ঘটিয়াছে সম্পূর্ণরূপে স্থলপথে। কিন্তু ২৯শে ডিসেম্বর প্যাম্পাগনা প্রদেশে জাপানীরা দূরবর্ত্তী সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া জাহাজযোগে অশ্বারোহী সৈন্য নামাইয়াছে!—এই সংবাদ কিঞ্চিৎ বিচিত্র সন্দেহ নাই। ফিলিপাইনের এই যুদ্ধ লক্ষ্য করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রচুর বিমানবহর ও নৌ-বহর একযোগে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতেছে। বিমানবহরকে এডভান্স গার্ড বা অগ্রবর্ত্তী প্রহরীবাহিনীরূপে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

প্রচুর বোমাবর্ষণ করিয়া তাহারা নৌ-বহরের অভিযান-পথ এবং রাত্রির অন্ধকারে সৈন্যদলের অবতরণ সহজতর করিয়াছে। অধিকন্তু তীরে অবতরণ করিয়া তাহারা ট্যাঙ্কের সাহায্যে যান্ত্রিক যুদ্ধ চালাইয়াছে। সোজা কথায় বলা যাইতে পারে যে, জার্ম্মাণীর স্থলযুদ্ধের যান্ত্রিক ক্ষিপ্রাক্রমণের সঙ্গে জাপানী নৌ-যুদ্ধের স্বাভাবিক রণপটুতাকে সম্মিলিত করা হইয়াছে। জার্ম্মাণীর নিকট হইতে তাহারা গ্রহণ করিয়াছে স্থল-যুদ্ধের আধুনিক প্রক্রিয়া এবং ইহার সঙ্গে তাহারা যোগ করিয়াছে গত অর্দ্ধ শতাব্দীর নিজেদের নৌ-যুদ্ধের অভিজ্ঞতা। ইহারই ফল দেখিতেছি আমরা ফিলিপাইনের রণক্ষেত্রে, যাহার পরিণাম সম্পর্কে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র পূর্ব্বাহ্নে সজাগ ছিলেন না। সুতরাং দুর্গতি দ্রুত ঘনাইয়া আসিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

(২)

ম্যানিলার পতন

৩রা জানুয়ারী '৪২।

ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলার পতন হইয়াছে। প্রশান্ত মহাসমুদ্রে মিত্রশক্তির আত্মরক্ষার পক্ষে ইহা গুরুতর ক্ষতি ঘটাইবে। গুয়াম হইতে ফিলিপাইন পর্য্যন্ত সমস্ত নৌ-ঘাঁটি একে একে জাপানীদের দখলে যাওয়ায় মার্কিণ নৌ-বহরের মহড়া ক্রমশঃ অচল অবস্থায় আসিয়া পৌছিতেছে। সম্প্রতি কম্যাণ্ডার কিংহাল্ এক বিবৃতিতে বলিয়াছিলেন যে, সাধারণতঃ নৌ-যুদ্ধে কেবল নৌ-বহরের কথাই জনসাধারণ মনে রাখে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই এই মূল তথ্য জানেন না যে, সুরক্ষিত নৌ-ঘাঁটি বা naval base ছাড়া কোন নৌ-বহরই কার্য্যতঃ যুদ্ধ চালাইতে পারে না। সুতরাং নৌ-সংগ্রাম ও নৌ-বহরের পক্ষে নৌ-ঘাঁটিগুলি

একান্ত জরুরী প্রয়োজনের মত। ওয়েক, গুয়াম, ম্যানিলা, হংকং, সাংহাই, পেনাং—এই ঘাঁটিগুলি অতি দ্রুত জাপানীদের হাতে গেল। মিত্রশক্তির পক্ষে এই অবস্থাটা অত্যন্ত ক্লেশকর। জাপানীরা যে কৌশলে আক্রমণ চালাইয়াছে, তাহাতে ম্যানিলার পতন অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত ছিল না। তাহারা জলে, স্থলে ও আকাশে একযোগে অভিযান করিয়াছে। দূর সমুদ্র লঙ্ঘন করিয়া ২৪ দিনে ২৬০ মাইল স্থলপথে অতিক্রম কিম্বা ১২০ মাইল দূরে লিঙ্গায়েন উপসাগরে নামিয়া ১৮ দিনের মধ্যে ম্যানিলা সহর দখল ব্লিজক্রিগের লক্ষণ উদ্ঘাটিত করিতেছে। মাইল হিসাবে দৈনিক অগ্রগতির বিচার করিলে কিম্বা প্রতিপক্ষের সামরিক শক্তির একান্ত দুর্ব্বলতার কথা চিন্তা করিলে জার্ম্মাণীর তুলনায় জাপানী আক্রমণের গতি যথেষ্ট কম বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে জার্ম্মাণী পোল্যাণ্ড, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও রাশিয়ায় স্থল পথে এবং সমতল ভূমিতে স্বচ্ছন্দ যুদ্ধ চালাইয়াছিল, মাঝখানে কোন জলপথের ব্যবধান ছিল না। এক্ষেত্রে ভৌগোলিক অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। এখানে প্রথমেই বিশাল সমুদ্র লঙ্ঘন করিতে হইয়াছে, তারপর আকাশে বিমানশক্তির আধিপত্য বিস্তার করিয়া তীরে সৈন্য নামাইতে হইয়াছে এবং তারপর স্থলপথে আধুনিক সংগ্রাম করিতে হইয়াছে। উত্তর আফ্রিকায় ইতালীর বিরুদ্ধে বৃটেনের প্রথম অভিযানের সঙ্গে ইহার কিছু তুলনা দেওয়া যাইতে পারে এবং সেখানেও নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনীর মধ্যে অনুরূপ সংযোগ ঘটাইয়া অগ্রসর হইতে হইয়াছিল। তবে এক্ষেত্রে শত্রুপক্ষের তুলনায় ফিলিপাইনের আত্মরক্ষার ব্যবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। প্রকাশ যে, সেখানে মার্কিণ সৈন্য ছিল ৬ হাজার, খাস ফিলিপাইনের সরকারী সৈন্য ছিল ২০ হাজার, 'স্কাউট সৈন্য' (মার্কিণ অফিসারদের অধীনে এক শ্রেণীর দেশীয় সৈন্য) ১২ হাজার এবং ৫ মাসের

ট্রেণিং প্রাপ্ত রিজার্ভ সৈন্য ছিল ১ লক্ষ। বলা বাহুল্য যে, এই মোট সৈন্য-সংখ্যা বড় রকমের অভিযানের পক্ষে সহায়ক নহে। বিশেষতঃ, ট্যাঙ্ক ও বিমানের প্রাচুর্য্য না থাকিলে আধুনিক যুদ্ধ বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হয়। তথাপি মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল ম্যাক-আর্থার ২০০ মাইল দীর্ঘ রণাঙ্গনে যথেষ্ট বীরত্ব ও দৃঢ়তার সহিত লড়িয়াছেন এবং এখনও তিনি ম্যানিলার উত্তরে ও উত্তর-পশ্চিমে কোরিজিডোর নৌ-দুর্গকে কেন্দ্র করিয়া আরও সংগ্রাম চালাইতে ইচ্ছুক হইয়াছেন। তাঁহার এই দৃঢ় সঙ্কল্প প্রশংসনীয়, কিন্তু উত্তর ফিলিপাইনে জাপানীরা যেভাবে অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে ম্যানিলার পতনের পর জেনারেল ম্যাক-আর্থার আর কত দিন লড়িতে পারিবেন, তাহাই প্রশ্ন।

ফিলিপাইনের দুর্দ্দশার জন্য কেবল জাপানী নৃশংসতা ও বিশ্বাস-ঘাতকোচিত আক্রমণের উপর দোষ দিলেই চলিবে না। মার্কিণ কর্ত্তৃপক্ষের ঢিলেমি এবং শৈথিল্যের কথাও চিন্তনীয়। গত ২০।২২ বৎসর ধরিয়া নৌবিশেষজ্ঞগণ প্রশান্ত মহাসমুদ্রে জাপ-মার্কিণ সংগ্রামের সম্ভাবনা এবং উহার গতিপ্রকৃতি লইয়া আলোচনা করিয়া আসিতেছিলেন। তাঁহারা বলিতেছিলেন যে, হাওয়াই, ওয়েক, গুয়াম ও ফিলিপাইনে যদি সুরক্ষিত আধুনিক নৌঘাঁটি ও নৌদুর্গ নির্ম্মিত না হয়, তাহা হইলে ভাবী নৌযুদ্ধে আমেরিকা বিপদে পড়িবে। কিন্তু ১৮৯৯ সালে স্পেনের নিকট হইতে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আমেরিকার হাতে আসিবার পর আধুনিক নৌ-সংগ্রামের চাহিদা মিটাইবার উপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বিত হয় নাই। যে পরিমাণ কয়লা, পেট্রোল, রসদ, গোলাবারুদ, কামান, বিমান-আক্রমণ প্রতিরোধক যন্ত্রপাতি এবং জাহাজ মেরামতি কার্য্যের উপযোগী ব্যবস্থা ইত্যাদি আধুনিক নৌবহরের ঘাঁটির পক্ষে প্রয়োজন, তদনুরূপ ব্যবস্থা করা হয় নাই। ক্যাভাইট, (ম্যানিলা) ওলোঙ্গাপো এবং পোলক, এই তিনটির

মধ্যে প্রথমটি কিছু উন্নত ধরণের ছিল, কিন্তু বাকি দুইটি মার্কিণ সামরিক কর্ত্তাদের নিকট গুরুত্ব অর্জ্জন করে নাই। ম্যানিলার পতনের পর উহার নৌঘাঁটি ক্যাভাইট পরিত্যক্ত হইয়াছে এবং ওলোঙ্গাপোও বর্ত্তমানে আত্মরক্ষার কোন কাজে আসিবে না। আমেরিকার অভিজ্ঞ এবং প্রবীণ নৌ-সেনানীগণ ম্যানিলায় ব্যয়বহুল আধুনিকতম দুর্গাদি নির্ম্মাণের প্রস্তাবে সম্মত হন নাই। তাঁহাদের যুক্তি ছিল এই যে, শক্তিশালী মার্কিণ নৌ-বহরের সাহায্য ছাড়া ফিলিপাইন আত্মরক্ষা করিতে পারিবে না এবং ফিলিপাইনে কোন প্রকাণ্ড নৌবহরের পক্ষে সামান্য কিছুকাল অবস্থানেরও উপযুক্ত ব্যবস্থা নাই। এই অবস্থা লক্ষ্য করিয়া একজন মার্কিণ বিশেষজ্ঞ বহুকাল আগে মন্তব্য করিয়াছিলেন, 'The Philiphines are there for Japan whenever she likes to take them and nothing can prevent her from seizing them when she feels disposed to do so. As at present circumstanced, we could do nothing whatever to protect them in time of war. If we were foolish enough to locate a fleet at Manila the history of Port Arthur would repeat itself, with us in the role of the Russians!' ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ যে ভাবে আছে, তাহাতে জাপানীরা যে দিন খুসী উহা দখল করিতে পারে এবং আমাদের (মার্কিণ) কোন সাধ্য নাই যে, তাহা ঠেকাইতে পারি। যদি কোন দিন মূর্খের মত ম্যানিলায় কোন নৌবহরের সন্ধান পাই তাহা হইলে বুঝিতে হইবে পোর্ট আর্থার বন্দরের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটিতেছে এবং আমরা (মার্কিণ) রাশিয়ানদের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়াছি। অর্থাৎ পোর্ট আর্থারে রাশিয়া যেভাবে হারিয়াছিল, তেমন শোচনীয় পরাজয় ঘটিবে ফিলিপাইনে আমেরিকানদের। এই প্রসঙ্গে আরও ভাবিবার

কথা এই যে, আমেরিকা জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনার কথা চিন্তা করিয়াই ফিলিপাইনকে স্বাধীনতা দিয়াও দেশ রক্ষার ব্যবস্থা ও নৌ-ঘাটিগুলি নিজেদের হাতে রাখিয়াছিল। তথাপি আমেরিকা অসতর্ক ছিল এবং এত অসতর্ক যে, জাপানীরা এক মাসের মধ্যে ওয়েক ও গুয়াম হইতে ম্যানিলা পর্য্যন্ত দখল করিয়া লইল। নৌবিশারদগণ গুয়াম ও ফিলিপাইনকে আমেরিকার আত্মরক্ষার পক্ষে সিঙ্গাপুরের অনুরূপ গুরুত্ব দিয়াছিলেন। কিন্তু সেই গুরুত্ব কাগজে কলমেই রহিয়া গিয়াছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

—:*:-

(৩)

দীর্ঘ অবরোধের অবসান

৬ই মে, '৪২।

পাহাড়, নদী, অরণ্য ও সমুদ্র আত্মরক্ষার দিক দিয়া বরাবরই অত্যন্ত সহায়ক ছিল। আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধ যদিও এই বিঘ্ন বহুলাংশে অতিক্রম করিয়াছে, তথাপি দক্ষ সেনাপতি ও উৎকৃষ্ট রণকৌশলের যোগাযোগ ঘটিলে এই প্রাকৃতিক বিঘ্ন যান্ত্রিক যুগেও আত্মরক্ষার বিস্ময় দেখাইতে পারে। ফিলিপাইনের বাতান উপদ্বীপের সংগ্রাম ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধের ইতিহাসে ইহা স্মরণীয় হইয়া থাকিবে। মার্কিণ ও ফিলিপাইন সৈন্যের সহায়তায় জেনারেল ম্যাক-আর্থার শ্রেষ্ঠতর জাপানী সৈন্য ও অস্ত্র সমাবেশের বিরুদ্ধে ক্রমাগত চারি মাসকাল আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। প্রশান্ত মহাসাগর ও

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধে এই কৃতিত্ব আর কোন সেনাপতি ও সৈন্যদলই দেখাইতে পারে নাই। জেনারেল ম্যাক-আর্থার মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সেনাপতি মণ্ডলীর অধ্যক্ষ ছিলেন এবং অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্বে ফিলিপাইনেরও কমাণ্ডার ছিলেন। জাপানের সহিত যুদ্ধ বাধিবার সময় প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্ট তাঁহাকে পুনরায় আহ্বান করেন এবং ম্যাক-আর্থার সানন্দে তাঁহার অবসর জীবনের বিশ্রাম সুখ ত্যাগ করিয়া ফিলিপাইনের অধিনায়কত্ব গ্রহণ করেন। মার্চ্চ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি জেনারেল ওয়েন-

রাইটের হাতে অধিনায়কত্ব অর্পণ করিয়া অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করেন। কারণ, অষ্ট্রেলিয়ার রণনৈতিক অবস্থা ক্রমে ঘোরালো হইয়া আসিতেছিল। ফিলিপাইন যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, উত্তরে ও দক্ষিণে একে একে দ্বীপগুলি জাপানের দখলে গেলেও বাতান উপত্যকায় ম্যাক-আর্থার ও কোরিজিডোর দুর্গে ওয়েনরাইট প্রবল প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাইতে থাকেন। জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে রাজধানী ম্যানিলার অতি দ্রুত পতনের পর কেহই প্রত্যাশা করেন নাই যে, জাপবাহিনীকে গোটা ফিলিপাইন দখল করিতে এবং ম্যানিলা উপসাগরের প্রবেশ পথে কোরিজিডোর দুর্গের অবরোধ ভাঙ্গিতে মে মাসের প্রথম সপ্তাহ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। জেনারেল ম্যাক-আর্থার ম্যানিলার পতনে বিচলিত না হইয়া আরও ১৫ মাইল পিছনে
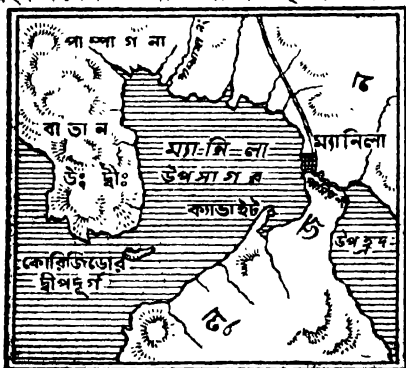
হটিয়া গিয়া নূতন ব্যূহ রচনা করেন। কোরিজিডোর হইতে উত্তর-পশ্চিমে ৩০।৩৫ মাইল দূরে বাতান উপদ্বীপের এক কোণে প্রধান ব্যূহ রচিত হয়। এই অংশের ভৌগোলিক অবস্থা রণনীতির উপর প্রচুর প্রভাব খাটাইয়াছে। বিশেষভাবে মানচিত্রে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, দক্ষিণ চীন সমুদ্রের পূর্ব্বাংশ ক্রমশঃ সরু হইয়া গিয়া ম্যানিলা উপসাগরের সঙ্গে মিশিয়াছে। এই ম্যানিলা উপসাগরের প্রবেশ পথ বেশ সঙ্কীর্ণ। ইহার বামদিকে কোরিজিডোর এবং ডানদিকে ক্যাভাইট। এই দুই নৌ-ঘাটি ও নৌদুর্গ যেন দুই পার্শ্ব হইতে (প্রকৃতপক্ষে ক্যাভাইট আরও ভিতরে—পূবদিকে) ম্যানিলা উপসাগর ও সহরকে পাহারা দিতেছে। ভিতরের দিকে প্রবেশ করিয়া ম্যানিলা উপসাগর বিষম চওড়া হইয়া গিয়াছে। ফলে একই সঙ্গে দুই বাহু বাড়াইয়া ক্যাভাইট ও বাতান উপদ্বীপ দখল করা সম্ভব ছিল না। কোরিজিডোরের উত্তরে এবং পাম্পাগনা ও জাম্বেলিস প্রদেশের প্রান্ত দেশে বাতান উপদ্বীপ অবস্থিত। অরণ্যময় দুরূহ পার্ব্বত্য প্রদেশ এই বাতান। এখানকার পাহাড়গুলির চূড়া কোনটা ৪৭০০ ফুট এবং কোনটা বা ৩২০০ ফুটের উর্দ্ধে। কিন্তু পর্ব্বতশৃঙ্গের উচ্চতাই একমাত্র বড় কথা নহে, দুর্গম শ্বাপদশঙ্কুল অরণ্য এবং কঠিন ও দুরারোহ পার্ব্বত্যভূমি জেনারেল ম্যাক-আর্থারের সহায়ক হইল। আমাদের রাজপুত ইতিহাসে রাণাপ্রতাপ যেমন মেবারের পতনের পর আরাবল্লী পর্ব্বত হইতে আকবরের মোগল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ চালাইয়াছিলেন, জেনারেল ম্যাক-আর্থারও তেমনি ম্যানিলার পতনের পর বাতান উপদ্বীপের পার্ব্বত্য অঞ্চল হইতে ফিলিপাইন দ্বীপের সংগ্রাম চালাইলেন। উভয়ে প্রায় একই প্রকারের ঐতিহাসিক খ্যাতি অর্জ্জন করিলেন।

জেনারেল ম্যাক-আর্থারের দক্ষিণ ব্যূহ পাম্পাঙ্গা নদীর জলাভূমি

পর্য্যন্ত এবং বাম ব্যূহ কাবুসিলান পর্ব্বত পর্য্যন্ত প্রসারিত হইল। এই অবস্থার মধ্যে জাপানীরা মাত্র ১৯ মাইলেরও অনধিক রণক্ষেত্র জুড়িয়া ট্যাঙ্ক আক্রমণের সুযোগ পাইল। এভাবে জাপানী জেনারেল মাসারু হোমা ও মার্কিণ জেনারেল ম্যাক-আর্থারের মধ্যে যে অবরোধ সংগ্রাম আরম্ভ হয়, তাহা ভাঙ্গিবার জন্য জাপানীরা ক্রমাগত চারি মাস ধরিয়া নৌবহর, বিমানবহর ও স্থলবাহিনীর দ্বারা প্রচণ্ড আক্রমণ করিতে থাকে। কিন্তু মার্চ্চ মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যেও চূড়ান্ত ফলাফল না পাইয়া ভগ্নহৃদয় জাপ সেনাপতি জেনারেল হোমা হারিকিরি বা আত্মহত্যা করেন বলিয়া গুজব রটে। জাপানীদের ইহাই স্বাজাতিক ধর্ম্ম। অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে, কিম্বা কোন আশা না থাকিলে জাপানীরা ধর্ম্ম ও সম্রাটের নামে 'হারিকিরি'র দ্বারা আত্মবিসর্জ্জন করে। জেনারেল হোমার রণ-নৈতিক ব্যর্থতা ও আত্মহত্যার পর মালয় ও সিঙ্গাপুর বিজয়ী জেনারেল ইয়ামাসিতা ফিলিপাইন অভিযানের প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হন। সান ফানাণ্ডোতে তিনি তাঁহার প্রধান শিবির স্থাপন করেন। ফিলি-পাইন দ্বীপ অতি বিচিত্র আকৃতির। উহা যেন একটা লম্বা ফিতার মত, এই ফিতা কোথাও কোথাও ঈষৎ কুঞ্চিত হইয়া যেন বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহার ফাঁকে ফাঁকে অসংখ্য দ্বীপ, উপদ্বীপ, উপসাগর, খাড়ি, জলপথ ও প্রণালী। জাপানীরা বিমান আধিপত্য বিস্তার করিয়া উহার ফাঁকে ফাঁকে দ্বীপ ও উপদ্বীপে নৌবহরসহ ঢুকিয়া পড়ে এবং প্রচুর স্থলসৈন্য নামাইয়া ক্রমে ক্রমে পশ্চিমাংশের মিন্দোরো, প্যানে, সেবু, ইত্যাদি দ্বীপ এবং দক্ষিণে মিণ্ডানাও দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়া লয়। এই দক্ষিণবর্ত্তী মিণ্ডানাও দ্বীপ ও উহার ড্যাভাও বন্দরে জাপানীরা তাহাদের ফিলিপাইন অভিযানের প্রধান ঘাঁটি করিয়াছিল বলিয়া মার্কিণীদের ধারণা। এই ঘাঁটি হইতে তাহারা সুমাত্রায়ও আক্রমণ চালাইয়াছিল। উভয় পক্ষের

কামান, বিমান, ট্যাঙ্ক ও নৌবহরের (ফিলিপাইনে উল্লেখযোগ্য শক্তিশালী নৌবহর ছিল না) মধ্যে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরিয়া তীব্র ও তিক্ত দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে। বাতান উপদ্বীপের পাহাড়ে ও জঙ্গলে কি ধরণের যুদ্ধ হইয়াছে, তাহা বুঝাইবার জন্য আমরা ম্যাক-আর্থারের প্রদত্ত একটি চমৎকার বীরত্বের কাহিনী উদ্ধৃত করিতেছি। কাহিনীটি এই :—

"আইগরাইট সম্প্রদায় খাস ফিলিপাইনের আদিবাসী, তাহারা খৃষ্টান নহে। উত্তর লুজনের বনতক পার্ব্বত্য অঞ্চলে তাহারা বাস করে। তাহারা খুব পরিশ্রমী এবং শান্ত স্বভাবের লোক। কিন্তু ভয় কাহাকে বলে তাহা তাহারা জানে না। তাহাদের অনেকে ফিলি-পাইনের স্বদেশী সেনাদলে সৈনিকের কাজ করে। তাহারা যে প্রকৃষ্ট যোদ্ধা তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। সম্প্রতি একদিন জাপানীরা একটি স্থান আক্রমণ করে। আইগরাইটদের একটি 'কোম্পানী' সেই স্থানটি রক্ষা করিতেছিল। শৃগালের গর্ত্তের মত গর্ত্ত খুঁড়িয়া তাহারা সেই গর্ত্ত হইতে যুদ্ধ করিতে থাকে। কোন প্রকার কাতরতা প্রকাশ না করিয়া এবং কোনও প্রকার পলায়নের চেষ্টা না করিয়া আইগরাইটরা সেই গর্ত্তে দাঁড়াইয়া একে একে সকলে প্রাণ বিসর্জ্জন দেয়। কিন্তু বৃথা একজনও মরে নাই, প্রত্যেকে বহু জাপানীকে নিধন করিয়া পরে নিজে নিহত হয়।

"এই স্থানটী পুনরধিকার করার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে পাল্টা আক্রমণের আদেশ দেওয়া হয়। একটি ট্যাঙ্ক দল ও একটি পদাতিক দলকে এই কার্য্যে নিয়োগ করা হয়। এই পদাতিক দল আইগরাইটদের লইয়া গঠিত। তাহারা তাহাদের স্ব-সম্প্রদায়ের ভ্রাতৃবৃন্দের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইবার জন্য বদ্ধপরিকর হয়। যে অঞ্চলে এই ব্যাপার ঘটিতেছিল সেই অঞ্চল বাঁশের জঙ্গলে ভরা। সেই অঞ্চলের

তরাই খণ্ড এক প্রকার দুর্ভেদ্য, অতি ঘন ঝোড় জঙ্গলের মধ্য দিয়া ট্যাঙ্ক চলা প্রায় অসম্ভব। কিন্তু ম্যাক-আর্থারের সৈন্যদের উপস্থিত বুদ্ধি অসামান্য। এই সূত্রে সেই উপস্থিত বুদ্ধি কাজে লাগিল। কোনও কথা না বলিয়া আইগরাইট দলের সেনানায়ক তাঁহার লোকদিগকে ট্যাঙ্কের ছাদে উঠিতে আদেশ দিলেন। ঝোড় জঙ্গলের মধ্য দিয়া তাহারা ট্যাঙ্ক চালকদিগকে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। মার্কিণ চালকগণ বদ্ধ গাড়ীর মধ্যে বসিয়া গাড়ী চালাইতে লাগিল, আর খোলা ছাদে দাঁড়াইয়া আইগরাইটরা তাহাদিগকে যষ্টির সাহায্যে পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল। তারপর শত্রুর কাছাকাছি আসিলে খোলা ছাদের উপর হইতে আইগরাইটরা অবিরাম অটোম্যাটিক পিস্তল চালাইতে আরম্ভ করিল। বহু ভয়ঙ্কর প্রভাত বাতান দেখিয়াছে, কিন্তু সে দিনের মত প্রভাত বুঝি কোন কালেও দেখা যায় নাই। আইগরাইটদের সে কি উন্মাদনা! বন্দুক বা জঙ্গলের সাধ্য কি সেই দুর্দ্দম গতি রোধ করিতে পারে। সে গতি রোধ করার ক্ষমতা একমাত্র মৃত্যুর। বাতান উপদ্বীপ অনেক স্থানই রক্তরঞ্জিত হইয়া আছে, কিন্তু এত রক্তের খেলা অন্য কোথাও দেখা যায় নাই। যুদ্ধের শেষে দেখা গেল যে, আমাদের ট্যাঙ্ক এবং আইগরাইট সৈন্যদের অবশিষ্ট ভাগ যুদ্ধ ক্ষেত্রে রহিয়াছে, কিন্তু জাপানী পদাতিকদল একেবারে উৎসাদিত হইয়াছে।”

জেনারেল ম্যাক-আর্থার তাঁহার অধীনস্থ সেনানায়কদিগকে সমবেত করিয়া আইগরাইটদের এই বীরত্বের কাহিনীটি বর্ণনা করিয়া বলেন—‘পৃথিবীর বহু রণক্ষেত্রে অসীম সাহস ও অপরিসীম বীরত্বের কার্য্য আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বহু পরিত্যক্ত আশা আমি সফল হইতে দেখিয়াছি। পরিখায় শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত দাঁড়াইয়া লোককে আমি এমন বীরত্বের পরিচয় দিতে দেখিয়াছি যাহা ভাষায় বর্ণনা করা সম্ভব নহে।

কিন্তু ট্যাঙ্কের উপর দাঁড়াইয়া আইগরাইটরা যে অসম সাহসিকতা দেখাইয়াছে, তাহার সহিত কিছুরই তুলনা হয় না। সেই অসম-সাহসিকতা দর্শনে হৃদস্পন্দন স্তব্ধ হইয়া যায়।”

ফিলিপাইনের সৈন্যেরা জাপানীদের ক্রূরতার মুখে এমন বহু বীরত্বের পরিচয় দিয়াছে। তথাপি শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষা সম্ভব হয় নাই। কারণ, জাপানীরা প্রয়োজনমত দলে দলে হাজার হাজার নূতন সৈন্য আমদানি করিতে পারিয়াছে; বিমান পথে ও সমুদ্র পথে কর্ত্তৃত্বের জন্যই ইহা সম্ভব হইয়াছে। অপর পক্ষে আমেরিকা বাতান ও কোরিজিডোর রক্ষী ক্লান্ত সৈন্যদিগের ক্ষয় ও ক্ষতিপূরণ করিতে পারে নাই। নূতন সৈন্য ও নূতন অস্ত্র আমদানি করিতে না পারিলে অবরোধ সংগ্রাম অনিশ্চিতকাল পর্য্যন্ত চালানো যায় না। তথাপি আত্মরক্ষার দৃঢ় সংগ্রাম চলিতে থাকিল এবং ফেব্রুয়ারী ও মার্চ্চ মাস অতিক্রান্ত হইল। এপ্রিল মাস হইতে কামানের গোলা ও বিমানের বোমা বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হইতে লাগিল এবং ইহার সঙ্গে নূতন নূতন জাপ-সৈন্য যোগ দিল। যুদ্ধ আরম্ভ হইবার পর এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত একমাত্র কোরিজিডোরেই ২০৬ বার বিমান আক্রমণের শিঙ্গা ধ্বনি হইয়াছে এবং ৯ই এপ্রিলের পর এক সপ্তাহের মধ্যে ৬৫ বার বিমান আক্রমণ হইয়াছিল। ইহা হইতেই কোরিজিডোর দুর্গে আত্মরক্ষার দৃঢ়তা ও জাপ আক্রমণের প্রচণ্ডতা অনুভূত হইবে। কামানের গোলা বর্ষণও দুই পক্ষ হইতে চলিয়াছিল প্রচুর। মার্চ্চ মাসের একটি মার্কিণ বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ—

‘ম্যানিলা উপসাগরের দক্ষিণ তীরস্থ জাপ কামান শ্রেণী আমাদের

পোতাশ্রয়ের রক্ষা ব্যবস্থার উপর গোলাবর্ষণ করিতেছে এবং ফোর্ট ফ্রাঙ্ক ও ফোর্ট ড্রামের উপর কামানের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত করিতেছে। একটি গোলায় বহু লোক হতাহত হইয়াছে। আমাদের দুর্গগুলি হইতে পাল্টা গোলাবর্ষণ করা হইতেছে। বাতান রণাঙ্গনের সর্ব্বত্র শত্রু পক্ষীয় টহলদার সৈন্যগণ আক্রমণমূলক কার্য্য চালাইতেছে এবং স্থানে স্থানে প্রায়ই সংঘর্ষ হইতেছে। ক্যাভাইট প্রদেশের উপকূলে যেখানে জাপ কামানশ্রেণী স্থাপিত, সেখান হইতে দুই মাইলের মধ্যে ক্ষুদ্র দ্বীপের উপর ফোর্ট ফ্রাঙ্ক ও ফোর্ট ড্রাম অবস্থিত। অন্যান্য আমেরিকান দুর্গগুলি উপকূল হইতে অন্ততঃ দশ মাইল দূরে ম্যানিলা উপসাগরের উত্তর অংশে রহিয়াছে।'

গোটা এপ্রিল মাস ধরিয়া এবং মে মাসের প্রথম সপ্তাহে যুদ্ধের উপসংহারের দিকে এই প্রকার নিকটবর্ত্তী ঘাঁটি ও একান্তরূপে কামানের পাল্লার মধ্যে অজস্র গোলা বর্ষিত হইয়াছে। নৌদুর্গ ভাঙ্গিবার পক্ষে কামানের গোলা একটা প্রধান সহায়। জাপানীরা ইহার ব্যবহারে ত্রুটি করে নাই। ৮ই এপ্রিল ওয়াশিংটন হইতে খবর আসে যে, নিছক সংখ্যার জোরেই জাপানীরা বাতান রক্ষী মার্কিণ সৈন্যদিগকে 'শৃগাল গর্ত্ত ও বন জঙ্গল' হইতে তাড়াইয়া দিবে। তারপর জেনারেল ওয়েনরাইট কোরিজিডোর দুর্গে কতদিন আত্মরক্ষা করিবেন? কারণ, বাতানের প্রান্ত হইতে কোরিজিডোরের দূরত্ব মাত্র ৫ মাইল। সুতরাং ওয়াশিংটনের সামরিক মহল মনে করিলেন যে, বর্ষা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই মার্কিণ ও ফিলিপাইনীয় সেনাদলের প্রতিরোধ চূর্ণ করার উদ্দেশ্যে জাপানীরা বাতানের নূতন অভিযানে সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিতেছে। আর একপক্ষ কালের মধ্যেই তথায় বর্ষা আরম্ভ হইবে। নূতন এই আক্রমণ চালাইবার উদ্দেশ্যে জাপানীরা বিরাট শক্তি সমাবেশ

করিয়াছে। তথায় একটি জাপ সেনাদলে দুই হইতে ছয় ডিভিসন পদাতিক সৈন্য ও গোলন্দাজ ও অন্যান্য সৈন্য থাকে; উহাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ১০ হাজার হইতে ১ লক্ষ ৩৫ হাজার। ফিলিপাইন রক্ষাকারী সেনাদলের তুলনায় তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী।

প্রকৃতপক্ষে বাতান রক্ষী সৈন্যের সংখ্যা ৩৭ হাজারের বেশী ছিল না, এবং কাহারও কাহারও মতে জাপানীরা শেষ পর্য্যন্ত প্রায় দুই লক্ষ সৈন্য ফিলিপাইনে আনিয়াছিল এবং ইহাদের সঙ্গে আধুনিক যুদ্ধের সমুদ্রপারবর্ত্তী দেশ আক্রমণের সর্ব্বপ্রকার যন্ত্রসজ্জা ও অস্ত্রসজ্জা ছিল। এই প্রচণ্ড সংগ্রাম-শক্তির দ্বারা জাপানীরা বাতানের ব্যূহ ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলে এবং ১০ই এপ্রিল বাতানের যুদ্ধ শেষ হয়।

ইহার পর বাকী রহিল ফিলিপাইনের জিব্রাল্টার অর্থাৎ কোরিজিডোর দুর্গ। কিন্তু অতি দ্রুত ইহারও মৃত্যু ঘনাইয়া আসিল। ১৫ই এপ্রিল ওয়াশিংটনের সামরিক মহল অনুমান করিলেন—

'জাপানীরা শীঘ্রই পার্ব্বত্য দুর্গ সমন্বিত করিজিডোর দ্বীপ আক্রমণের চেষ্টা করিবে। করিজিডোর ও প্রধান ভূমিখণ্ডের মধ্যবর্ত্তী স্থানের জল শুকাইবার সঙ্গে সঙ্গে এই আক্রমণ চালাইবে। কয়েক দিনের মধ্যেই ওখানে বর্ষাকাল আরম্ভ হইবে। জাপানীরা বাতান উপকূল ও ম্যানিলা উপসাগর কূল—এই দুই দিক হইতেই আসিতে পারে। সেনাবাহী বজরাগুলির সঙ্গে সঙ্গে সামরিক রক্ষী-জাহাজ ছোট ছোট কামান লইয়া অগ্রসর হইবে। উপসাগরে ইতিমধ্যে এইরূপ জাহাজ চলা ফেরা করিতেছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে। জাপানীরা দ্বীপটির উপর আবহাওয়ার অবস্থা অনুসারে প্রবলভাবে বোমা বা কামানের গোলা বর্ষণ করিবে। তারপর বজরাগুলি নানাদিক হইতে আসিয়া দ্বীপে ভিড়িবে। ইহাই জাপানীদের রণ-পদ্ধতি।'

এই অনুমান মিথ্যা হয় নাই। বাতান ও ক্যাভাইট হইতে প্রকাণ্ড রকমের কামান দাগিয়া ও বোমা ফেলিয়া জাপানীরা কোরিজিডোর দুর্গের শেষ আত্মরক্ষার প্রাচীর ও ব্যূহ ভাঙ্গিয়া ফেলে। ৬ই মে তারিখে কোরিজিডোর সহ ম্যানিলা উপসাগরের সমস্ত দ্বীপ দুর্গের পতন ঘটে এবং জেনারেল ওয়েনরাইট সসৈন্যে আত্মসমর্পণ করেন। কোরিজিডোর দুর্গে শেষ আক্রমণের সময় ৩ হাজারের কিছু বেশী সৈন্য ছিল। বাতানে ৩৫ হাজার মার্কিণ ও ফিলিপাইনীয় সৈন্য ও ২৫ হাজার অসামরিক লোক ছিল। ইহারা সকলেই জাপানীদের হাতে বন্দী হয়। বাতান উপদ্বীপ ও কোরিজিডোর দুর্গের ঐতিহাসিক অবরোধ সংগ্রামের এখানেই শেষ হয়। জাপানী আক্রমণ অপেক্ষা মার্কিণ আত্মরক্ষার রণনীতিই এখানে অধিকতর প্রশংসার যোগ্য।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

ব্রহ্মদেশের পতন

(১)

মৌলমেন ও টেনাসেরিম

১লা ফেব্রুয়ারী '৪২।

ব্রহ্মদেশ দখলের আসল যুদ্ধ সুরু হইয়াছিল মার্চ্চ মাসে। কিন্তু মৌলমেন ও মার্ত্তাবান হইতে সুরু করিয়া দক্ষিণতম ব্রহ্মের টেনাসেরিম বিভাগ মালয় যুদ্ধের পর্ব্বাংশেই ধরা যাইতে পারে। মালয় ও দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্ম একই ভূভাগের সংলগ্ন, এমন কি অবিচ্ছিন্ন বলিয়া এই অংশের যুদ্ধ অনিবার্য্যরূপে মালয় সংগ্রামের সহিত যুক্ত হইয়াছিল। জাপানীদের রণনীতি একটা প্রকাণ্ড বেড়াজালের মত দক্ষিণ ব্রহ্ম, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ও ফিলিপাইনকে যেন একই সময়ে ঘিরিয়া ধরিয়াছিল। সুতরাং ভৌগোলিক সীমার বিচ্ছেদের জন্য দেশগুলি পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন হইলেও প্রকৃতপক্ষে এই দেশগুলিতে প্রায় একই সময়ে আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

রণনৈতিক চাতুর্য্যের একটা প্রকৃষ্ট পন্থা হইতেছে, বহু স্থানে একই সময়ে আক্রমণ করিয়া প্রতিপক্ষকে বিহ্বল করা এবং কতকগুলি স্থানে প্রচণ্ড শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া প্রতিপক্ষের শক্তিকে নানাস্থানে ছড়াইয়া দেওয়া বা বিচ্ছিন্ন করা। ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার প্রায় সমস্ত স্থানেই জাপান আক্রমণ চালাইতেছে এবং কতকগুলি অংশে প্রচণ্ড শক্তির সমাবেশ করিয়াছে। ফলে, বৃটিশ পক্ষ কোন স্থানেই সাফল্যের সহিত দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কারণ, জাপানের মত অনুরূপ সংখ্যাশক্তি লইয়া মিত্রপক্ষ কোথাও প্রচণ্ড শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে না। মালয়, ব্রহ্মদেশ ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ—প্রধানতঃ এই তিন রণভূমিতে মিত্র পক্ষের শক্তি বিক্ষিপ্ত ও ছড়ানো, তাহাদের আয়োজন জাপানের মত নহে এবং জাপান আক্রমণ করিতেছে বলিয়া আত্মরক্ষাকারীদিগকে আক্রমণকারীর পরিকল্পনার নিকট নত হইয়া চলিতে হইতেছে। জাপান যে কৌশলে ও যে শক্তিতে যুদ্ধ চালাইতেছে, তাহাতে আগামী দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত তাহার জয়লাভ আদৌ বিস্ময়কর হইবে না। যেখানে শক্তির সমতা নাই, সেখানে উৎকৃষ্ট যোদ্ধার পক্ষে অগ্রগতি অত্যন্ত সহজ।

এই সহজ অগ্রগতির দৃষ্টান্তই আমরা পাইতেছি মালয় ও দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধে। আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে প্রতিদিন সংবাদ পাইতেছি যে, যেখানে আসিয়া জাপান দাঁড়াইতেছে, সেখান হইতেই বৃটিশ সৈন্য কেবল withdraw বা ঘাঁটি ছাড়িয়া চলিয়া আসিতেছে। এই পরিত্যাগ বা পশ্চাদপসরণ পরাজয়েরই নামান্তর মাত্র। ইহার অর্থ এই নয় যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাহিনী লড়িতেছে না, কিম্বা তাহারা ভালো যোদ্ধা নহে। সাম্রাজ্যবাহিনী প্রাণপণ সংগ্রাম করিতেছে, যোদ্ধা হিসাবে তাহারা জাপানীদের তুলনায় আদৌ হীন নহে এবং

ব্যক্তিগত গুণ ও বীরত্বও তাহাদের চমৎকার। কিন্তু জাপানীদের তুলনায় সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রের সংখ্যায় তাহারা অত্যন্ত হীন। সুতরাং প্রাণপণ সংগ্রাম করিয়াও তাহারা জাপানীদের প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। সাম্রাজ্যবাহিনীর পক্ষে ইহা দুর্ভাগ্য এবং আমাদের পক্ষে ইহা উদ্বেগের। আমরা চক্ষুর সম্মুখে দেখিতেছি যে, একে একে দক্ষিণ ব্রহ্মের সমস্ত ঘাঁটি জাপানীরা দখল করিয়া লইতেছে। প্রথমে গিয়াছে ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট, অতি সহজে ইহা দখল হইয়াছে। তারপর মালয়ের যুদ্ধের জন্য এই দিকে ততটা জোর দেওয়া হয় নাই। কিন্তু সিঙ্গাপুরের দিকে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ ব্রহ্মের আক্রমণও ক্রমশঃ প্রবল হইতেছে। ভিক্টোরিয়া পয়েণ্টের পতনের পর টেনাসেরিম বিভাগের উপর আক্রমণ সুরু হইয়াছে এবং এই বিভাগের মারগুই, টেভয়, মৌলমেন ইত্যাদি দখল হইয়া গিয়াছে। টেনাসেরিম বিভাগকে আমাদের বাঙ্গলাদেশের চট্টগ্রাম বিভাগের সহিত তুলনা দেওয়া যায়। চট্টগ্রাম বিভাগও দীর্ঘ সমুদ্রতটবর্ত্তী এবং দক্ষিণ দিকে ইহা ক্রমশঃ নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে। পাহাড়, অরণ্য, খরস্রোতা নদী এবং সমুদ্রতীর ও বন্ধুর ভূমি চট্টগ্রামের বৈশিষ্ট্য। টেনাসেরিম বিভাগও অনুরূপ এবং ইহার পাশাপাশি চলিয়াছে থাইল্যাণ্ডের সীমা—ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া ইহা প্রায় পরস্পরের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভৌগোলিক বিচারে ইহা একটি যোজক মাত্র এবং এই ধরণের যোজকে যুদ্ধ চালানো অত্যন্ত কষ্টকর। কারণ, উহার এক পার্শ্বে (থাইল্যাণ্ড) শত্রু এবং অন্য পার্শ্বে সমুদ্র। রণনীতির সাধারণ ধর্ম্মানুসারে সমুদ্রের পটভূমিকায় সঙ্কীর্ণ যোজকে আত্মরক্ষার সংগ্রাম চালানো দুঃসাধ্য। প্রচুর সৈন্যদলকে ইচ্ছামত মহড়ায় খেলানো যায় না, অথচ সম্মুখভাগে শত্রুর

প্রচণ্ড আক্রমণ এবং পশ্চাতে অগাধ সমুদ্র। এই সমুদ্রকে কাজে লাগানো যাইত, যদি প্রচুরসংখ্যক জাহাজ ও নৌসৈন্যের সমাবেশ করা যাইত। (বিমানবহরের সহযোগিতা যে প্রয়োজনীয় তাহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র।) থাইল্যাণ্ডের সীমা হইতে মিট্টা হইয়া টেভয়ের দিকে এবং কাওকারিক হইয়া মৌলমেনের দিকে জাপানীরা যে সম্মুখবর্ত্তী চাপ দিয়াছিল, উহা প্রতিরোধ করা সহজ হইত যদি পশ্চাৎবর্ত্তী সমুদ্র হইতে যুদ্ধ-জাহাজ ও বিমানবহরের যথোপযুক্ত সহযোগিতা পাওয়া যাইত। কিন্তু এই রণকৌশল বৃটিশবাহিনী খাটাইতে পারিতেছে না উপযুক্ত সংখ্যাশক্তির অভাবে।

সালুইন, থাটন, আমহার্ষ্ট, টেভয় এবং মারগুই—এই কয়টি জেলা লইয়া টেনাসেরিম বিভাগ গঠিত। এই জেলাগুলির পূর্ব্বাংশ পর্ব্বত বহুল এবং গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন। এই সমস্ত পর্ব্বতের শৃঙ্গ কোথাও কোথাও এক হাজার হইতে তিন হাজার এবং তিন হাজার হইতে সাড়ে পাঁচ হাজার ফুট উঁচু। তবে থাটন জেলায় জঙ্গল বেশী থাকিলেও উহা সালুইন বা আমহার্ষ্ট জেলার মত ততটা পর্ব্বত বহুল নহে এবং এই জেলার থাইল্যাণ্ড সীমান্ত দিয়া কতকগুলি গিরিসঙ্কট ও রাস্তা আছে। এই রাস্তাগুলি প্রধানতঃ শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল। টেভয় এবং মারগুই জেলায়ও অনুরূপ কয়েকটি trade route বা ব্যবসায়-বাণিজ্যের রাস্তা আছে এবং এইগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত হইতেছে। ১৮২৬ সালে বৃটিশ কর্ত্তৃক এইগুলি দখলের আগে এক শতাব্দীর অধিক কাল ধরিয়া এই জেলাগুলিতে শ্যাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধ চলিয়াছিল। টেনাসেরিম বিভাগ যেখানে সঙ্কীর্ণ যোজকের মত ক্রমশঃ দক্ষিণে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, উহার একদিকে বঙ্গোপসাগর ও

অন্যদিকে শ্যামোপসাগর এবং এই স্থানটি বোধ হয় ৩০ মাইলের বেশী চওড়া নহে। ফলে এই সামান্য পথটুকু অতিক্রম করা সহজ ছিল এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে দূরবর্ত্তী আরব ও ভারতবর্ষের ব্যবসায়-বাণিজ্য 'এই পথ দিয়া সুদূর প্রাচ্য পর্য্যন্ত প্রসারিত ছিল। আজ দক্ষিণ ব্রহ্ম আমাদের নিকট অপরিচিত হইয়া থাকিলেও এবং যুদ্ধের কল্যাণে আমরা নূতন করিয়া ভূগোল শিখিলেও এই অংশটার ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিতান্ত কম ছিল না। টেনাসেরিম বিভাগের এই জেলাগুলি আজ একে একে জাপানীরা দখল করিয়া লইয়াছে এবং শেষ পর্য্যন্ত বিখ্যাত মৌলমেন বন্দরেরও পতন হইয়াছে। রেঙ্গুণের পর মৌলমেন সমগ্র ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ বন্দর। কেবল বন্দর নহে, রেঙ্গুণ হইতে সিঙ্গাপুর যাইবার পক্ষে ইহা একটি বড় রকমের বিমান ঘাঁটি। ইরাবতীর পর ব্রহ্মদেশের প্রসিদ্ধ নদী সালুইন, এই নদীর মোহনার নিকট মৌলমেন অবস্থিত এবং ইহা আমহার্ষ্ট জেলার অন্তর্গত। সেগুন কাঠের যে ঐশ্বর্য্যের জন্য ব্রহ্মদেশ লোভনীয়, সেই সেগুন কাঠ সালুইন নদী দিয়া ভাসাইয়া মৌলমেনে আনা হইত এবং মৌলমেন ইহার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল।

মৌলমেনের পতনের দ্বারা দক্ষিণ ব্রহ্মের একটি শ্রেষ্ঠ ঘাঁটি হাতছাড়া হইয়া গেল। কেবল দক্ষিণ ব্রহ্ম নহে, রেঙ্গুণেরও প্রত্যক্ষ বিপদ ঘনাইয়া আসিল। কারণ, মৌলমেন হইতে মার্ত্তাবান ও পেগু হইয়া রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত রেলপথের সংযোগ। মৌলমেন ও মার্ত্তাবান পরস্পর নদীমোহনার দ্বারা বিচ্ছিন্ন এবং এখান হইতে রেঙ্গুণের দূরত্ব বোধহয় ১৫০ হইতে ১৭০ মাইলের মধ্যে। অপর পক্ষে বিমান পথের দূরত্ব ১০০ মাইলের বেশী হইবে না। সুতরাং মৌলমেনের বিমান ঘাঁটি হইতে রেঙ্গুণের উপর জাপ বোমারুর উৎপাত আরও বৃদ্ধি পাইবে।

জাপানীরা মৌলমেন হইতে ষ্টীমার যোগে মার্ত্তাবান হইয়া পেগু রেলপথ ধরিয়া রেঙ্গুণে পৌছিতে চেষ্টা করিবে। তাহারা ইতিমধ্যেই মার্ত্তাবান ও রেঙ্গুণে বোমাবর্ষণ আরম্ভ করিয়াছে। জাপানীদের পদাতিকবাহিনী যে এই দিকে অগ্রসর হইবে, বোমাবর্ষণ তাহারই ইঙ্গিত মাত্র। জাপ বিমানবহর বৃটেনের রাজকীয় বিমানবহরের মত একটি পৃথক সামরিক বিভাগ নহে। উহা একান্তরূপে স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সহযোগী। সুতরাং জাপানীরা মার্ত্তাবান ও রেঙ্গুণে বোমাবর্ষণের আড়াল ধরিয়া স্থলপথে যান্ত্রিকবাহিনীর দ্বারা আক্রমণ চালাইবে। (মৌলমেনের যুদ্ধে জাপানীরা নাকি সরবরাহ ব্যবস্থার জন্য হাতী ব্যবহার করিয়াছিল। আধুনিক যুদ্ধের পক্ষে ইহা একটা ব্যতিক্রম মাত্র। ট্যাঙ্ক ও বোমারুর যুগে বেশী পরিমাণ হস্তীযূথের ব্যবহার সম্ভব নহে, কারণ, প্রতিপক্ষের বোমা, গুলী বা গোলাবর্ষণে বিশালকায় হস্তীর ক্ষেপিবার সম্ভাবনা আছে। ঢাল, তরোয়াল ও বর্শাফলকের যুদ্ধ ইহা নহে।) মৌলমেন হইতে সিঙ্গাপুরের সীমা পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ জাপানীরা দখল করায় বঙ্গোপসাগরে জাপানের প্রভুত্ব বৃদ্ধি পাইবে এবং রেঙ্গুণ হইতে মৌলমেন ও টেভয় হইয়া সিঙ্গাপুরের বিমানপথও বিচ্ছিন্ন হইবে। যদি অতঃপর সিঙ্গাপুর আত্মরক্ষা করিতে না পারে, তবে, জলপথে ব্রহ্মদেশের আরও বিপদ অনিবার্য্য।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(২)

মার্ত্তাবান ও সালুইন

১০ই ফেব্রুয়ারী '৪২।

যুদ্ধের আগে জাপানের বিমানশক্তি সম্পর্কে যেমন ভুল ধারণা করা হইয়াছিল এবং উহার ফলে মিত্রশক্তি যেমন পর্য্যাপ্ত বিমান-বহর পূর্ব্বদিকে সমাবেশ করিতে পারেন নাই, তেমনি জাপানী সৈন্যের সংখ্যা, অস্ত্রসজ্জা এবং আক্রমণের ক্ষিপ্রতা ও নৈপুণ্য সম্পর্কেও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা হইয়াছিল। চারি পাঁচ বৎসর চীনের নব পর্য্যায়ের যুদ্ধে জাপানের সংগ্রাম-শক্তি এতটা প্রচণ্ড বলিয়া প্রমাণিত হয় নাই। ফিনল্যাণ্ডের যুদ্ধে সোভিয়েট রাশিয়ার দীর্ঘসূত্রতা যেমন লাল-পল্টনের শক্তিকে গোপন রাখিয়াছিল, চীন যুদ্ধে জাপানের বিলম্বও তেমন ভুল বুঝিবার অবসর দিয়াছে। ইহা ছাড়া আধুনিক যান্ত্রিক

১৪

সংগ্রাম চালাইবার পক্ষে যে সমস্ত কল-কারখানা এবং কাঁচামালের প্রয়োজন, জাপান সেই দিক দিয়া হীন বলিয়াই সমরবিশেষজ্ঞদের বিশ্বাস ছিল। তাঁহারা মনে করিতেন, ইয়োরোপে ইতালী যেমন তৃতীয় শ্রেণীর যোদ্ধা, জাপানও ঠিক তাহাই। এই কারণেই জাপান শেষ পর্য্যন্ত ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিবে এতখানি চরম পন্থার উপর অনেকেই বিশ্বাস রাখিতে পারেন নাই। জাপানের বিশাল বহির্বাণিজ্য নষ্ট হইবে, কাঁচামালে টান পড়িবে এবং তিনমাস যুদ্ধ চালাইয়াই জাপান রণক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবে, এমন কথাও শুনা গিয়াছিল। এক্ষণে লণ্ডনের বিখ্যাত "ইকনোমিষ্ট" পত্রিকা পর্য্যন্ত অর্থনৈতিক হিসাব কষিয়া বলিতেছেন যে, ৬ মাস হইতে এক বা দেড় বৎসর পর্য্যন্ত যুদ্ধ চালাইতে জাপানের তেমন বিষম বেগ পাইতে হইবে না। অনেক সময় দেখা যায় যে, শান্তির সময়ের গবেষণা যুদ্ধের সময়ে ব্যর্থ হয়। কারণ, শান্তি ও যুদ্ধের মধ্যে অবস্থার এত পরিবর্ত্তন ঘটে এবং এমন সমস্ত অজ্ঞাত প্রশ্ন আসিয়া দেখা দেয়, যাহা পূর্ব্বাহ্ণে ধারণা করা যায় না। ফলে শান্তির সময়কার হিসাব যুদ্ধের সময় ব্যর্থ হইয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া ও ব্রহ্মদেশে এই ভ্রান্তধারণারই ফল ফলিতেছে।

ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট হইতে মৌলমেন পর্য্যন্ত জাপানীরা গোটা দক্ষিণ ব্রহ্ম দখল করিয়া লইয়াছে। জঙ্গল, পাহাড়, নদী বা সঙ্কীর্ণ যোজকের জন্য তাহাদের এই অভিযান বাধাগ্রস্ত হয় নাই। এক্ষণে সালুইন নদীর তীরে যুদ্ধ চলিতেছে। ইরাবতীর পরেই সালুইন ব্রহ্মদেশের বড় নদী। এই নদীর মোহনার একতীরে মৌলমেন এবং অপর তীরে মার্ত্তাবান। জাপানীরা মার্ত্তাবানের উপর কামান দাগিতেছে এবং বোমা ফেলিতেছে। সেখানকার অবস্থাও সঙ্কটজনক।

'রয়টারের' মতে মার্ত্তাবানে আর আত্মরক্ষা করা চলিবে না। কারণ, সালুইনের যেখানে জাপানীরা পৌঁছিয়াছে, সেখান হইতে মৌলমেন মাত্র পৌণে এক মাইল দূরে। কেবল তাহাই নয়, সালুইন যেন দুই বাহু দিয়া মার্ত্তাবান অঞ্চলকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। ফলে, সামরিক দিক হইতে মার্ত্তাবান "বিপজ্জনক পকেটে" পরিণত হইয়াছে এবং এই পকেটে আত্মরক্ষা করিতে গেলে বেষ্টিত হওয়ার সম্ভাবনা। ইহার চেয়ে বরং উত্তর দিকে সরিয়া গেলে জাপানীদের আরও ভালোভাবে বাধা দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু উত্তর দিকের অবস্থা কি জাপানকে সুবিধা দিবে না? উত্তর দিকে প্রাকৃতিক বিঘ্ন কম, মাটি শক্ত ও সমতল। মে মাসে বৃষ্টি নামিবার আগে এই তিন মাস কাল জাপানীরা সেই অঞ্চলে যুদ্ধ চালাইবার সুবিধা পাইবে। যুদ্ধ সেখানে কঠিন হয়, যেখানে পাহাড়, জঙ্গল ও সমুদ্রের বিপুল বিঘ্ন থাকে। আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রামের পক্ষে শক্ত ও সমতল মাটী আদর্শস্থানীয়। সুতরাং মার্ত্তাবান ছাড়িয়া উত্তর দিকে ঘাঁটি করিলেই জাপানীরা জব্দ হইবে, এমন আনুমানিক সান্ত্বনায় লাভ নাই। ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট, টেভয়, মারগুই, মৌলমেন ইত্যাদি দক্ষিণ ব্রহ্মের সমস্ত ঘাঁটিই একে একে পরিত্যক্ত হইয়াছে। এক্ষণে মার্ত্তাবান ত্যাগ করিয়া বোধহয় থাটনের দিকে সাম্রাজ্যবাহিনী হটিবে। কিন্তু মার্ত্তাবান পরিত্যক্ত হইলে জাপানীরা রেলপথের সুবিধা পাইবে এবং এই রেলপথ পেগু ঘুরিয়া রেঙ্গুণে গিয়াছে। অপর দিকে বিমানপথে রেঙ্গুণের দূরত্ব এক্ষণে মাত্র ১০০ মাইল। সুতরাং বোমারুর উৎপাত আরও বাড়িবে এবং এই সেদিনও শেষরাত্রি চার ঘন্টাকাল ধরিয়া জাপানীরা রেঙ্গুণে হানা দিয়াছে। অতএব ক্রমাগত স্থানত্যাগের দ্বারা আত্মরক্ষার সুবিধা হইবে, এমন ভরসা পাওয়া কঠিন। অবস্থার এই গুরুত্ব লক্ষ্য করিয়া স্বয়ং ব্রহ্মের

স্বরাষ্ট্র-সচিব মেজর মঙ্‌ বলিয়াছেন যে, Any further withdrawal will be dangerous—আরও বেশী পিছু হটিলে ঘোরতর বিপদ হইবে। মেজর মঙের মতে অবস্থা একেবারে নৈরাশ্যব্যাঞ্জক না হইলেও গুরুতর। যেখানে স্বয়ং মন্ত্রীর এই অভিমত, সেখানে সন্দেহের অবসর কম।

* *

*

১১ই তারিখের সেনাবিভাগীয় বিজ্ঞপ্তিতেও দেখা যায় যে, জাপানীদের এক শক্তিশালীবাহিনী নৌকায় আরোহণ করিয়া মার্ত্তাবানের উত্তর-পশ্চিমে অবতরণ করিয়াছে। মার্ত্তাবানের পূর্ব্ব এবং পশ্চিমের বিভিন্ন স্থানে শত্রুপক্ষের বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে বটে, কিন্তু মার্ত্তাবান সহর শত্রুর দখলে গিয়াছে। উত্তরে পা-আন এলাকায় সারাদিন তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছিল। এখানে বহুসংখ্যক জাপ সৈন্য এক প্রকাণ্ড ব্যূহ রচনা করিয়া সালুইন নদী অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। এই এলাকায় আক্রমণ চালাইয়া বহু অসুবিধা সত্ত্বেও অবস্থা আয়ত্তে আনা হইয়াছে বলিয়া বাহ্যতঃ মনে হয়। কিন্তু শত্রুপক্ষীয় বিমান সমূহ বৃটিশ বাহিনীর উপর বোমা নিক্ষেপ করিয়াছে এবং মেসিনগান চালাইয়াছে। ইহার পরবর্ত্তী খবরেও দেখা যায় যে, মার্ত্তাবান এলাকার মিত্রপক্ষীয় স্থলবাহিনীর উপর শত্রু বিমান প্রবল আক্রমণ করে। সালুইন রণাঙ্গণে পা-আন এলাকায় তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। কিন্তু সালুইন রণক্ষেত্রের অবস্থাও অতি দ্রুত খারাপ হইয়া পড়ে। শত্রুর আক্রমণে মিত্রপক্ষীয় ব্যূহ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে এবং সঙ্কট দেখা দেয়।

বিমানশক্তির শ্রেষ্ঠতার জন্য জাপানীরা যেমন নৌকাযোগে মার্ত্তাবানে অবতরণে সমর্থ হয়, তেমনই কতকটা ইচ্ছা মত কৌশল অনুসরণেরও সুযোগ পায়। অপর পক্ষে ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যদল এই বিমানশক্তির অভাবে অত্যন্ত বেকায়দায় পড়ে। জাপানীদের মার্ত্তাবান অধিকার সম্পর্কে একথা জানা গিয়াছে যে, বহুসংখ্যক জাপ সৈন্য কিছু উত্তরে সালুইন নদীর তীরে উপস্থিত হইয়া পার্ব্বত্য অঞ্চল অতিক্রম করে। এ ভাবে তাহারা মার্ত্তাবানের পশ্চাভাগে পৌছে এবং মার্ত্তাবান হইতে উত্তরে থাটনের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে, তাহা বন্ধ করিয়া দেয়। আর একদল জাপ সৈন্য সমুদ্র হইতে মার্ত্তাবানের উত্তরে অবতরণ করিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হয়। উত্তর দিক হইতে জাপানীদের এই বেষ্টনী ভেদ করিয়া মার্ত্তাবানের বৃটিশ সৈন্যদের উদ্ধারের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তখন গুর্খা ও একদল বৃটিশ সৈন্য অবরুদ্ধ সহর হইতে বাহির হয়। তাহারা মার্ত্তাবান-থাটন পথে না যাইয়া উহার পূর্ব্বদিকস্থ দুর্গম অঞ্চল দিয়া উত্তর দিকে অগ্রসর হয়। গুর্খা সৈন্যগণ মারাত্মক কুকরির দ্বারা জাপব্যূহের ভিতর দিয়া পথ করিয়া লয়। এদিকে বেলুচি সৈন্যগণ মৌলমেনের ২৫ মাইল উত্তরে পা-আনের খেয়াঘাটে প্রচণ্ড জাপ আক্রমণের সম্মুখীন হয়। জাপানীরা পা-আন এলাকার দুই দিক হইতে সাঁড়াশীর আকারে আক্রমণ চালাইয়া বেলুচীদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতে সমর্থ হয়। ইহার পর দুই পক্ষে তুমুল লড়াই চলে। জাপানীদের চাপ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায় এবং জাপ বিমানবহর স্থলবাহিনীর সহিত সহযোগিতা করে। এইভাবে মার্ত্তাবান দখল শেষ হয়।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(৩)

দক্ষিণ ব্রহ্মের নদীপথে

২০শে ফেব্রুয়ারী '৪২।

দক্ষিণ ব্রহ্মের টেনাসেরিম বিভাগের যুদ্ধ প্রায় শেষ হইয়া আসিতেছে। এই বিভাগের একমাত্র থাটন বাদে আর সমস্ত জেলাই জাপানীরা দখল করিয়া লইয়াছে। এক নিঃশ্বাসে এইটুকু বলা যায় যে, মৌলমেন হইতে সিঙ্গাপুর পর্য্যন্ত সমস্ত ভূভাগ ও সমুদ্র তীর জাপানীদের করায়ত্ত হইয়াছে। ইহা দ্বারা তাহারা জল, স্থল ও আকাশপথের প্রভূত সুবিধা পাইয়াছে। বর্ত্তমানে তাহারা রেঙ্গুণের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া দক্ষিণ ব্রহ্মে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। এই দিকের যুদ্ধে নদীতীর প্রাধান্য লাভ করিবে। রেঙ্গুণ যেমন রেঙ্গুণ নদীর তীরে, মৌলমেন ও মার্ত্তাবান তেমনই সালুইন নদীর মোহনায় এবং

সালুইন ও ইরাবতীর মধ্যে সিটাং আর একটি বড় নদী। এই নদীগুলির আবার কয়েকটি ছোট ছোট শাখা নদী আছে। উহার মধ্যে বিলিন ও ডনথামি আজিকার যুদ্ধের জন্য উল্লেখযোগ্য হইয়াছে। সিটাং ও সালুইনের মধ্যে বিলিন নদী, বিলিন সহরও এই নদীর তীরে। এই নদীটি মার্ত্তাবান উপসাগরে পড়িয়াছে। ডনথামি নদী মার্ত্তাবানের কিছু উপরে সালুইন নদীর সহিত মিশিয়াছে। সালুইন নদী অতি দীর্ঘ, কিন্তু ইরাবতীর যেমন হাজার মাইল জলপথ ষ্টীমার ও নৌকাযোগে ব্যবহার করা যায়, সালুইন তেমন নহে। এই নদীর মাত্র ৮০ মাইল জলপথ ষ্টীমারে যাতায়াত করা যায়। সালুইন নদী মোহনার এক তীরে মার্ত্তাবান ও অন্য তীরে মৌলমেন—অর্থাৎ উপরের দিকে মার্ত্তাবান ও নীচের দিকে মৌলমেন। এই দুই সহর ষ্টীমার লাইনের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত। রেঙ্গুণ হইতে পেগু এবং পেগু হইতে মার্ত্তাবান পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। মার্ত্তাবান হইতে ষ্টীমার-যোগে মৌলমেন হইয়া আবার রেলপথ দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্মের দিকে চলিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমানে জাপানী ও সাম্রাজ্যবাহিনীর মধ্যে এই অঞ্চলেই যুদ্ধক্ষেত্র সৃষ্টি হইয়াছে। সহজ ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, উপরে থাটন, নীচে মার্ত্তাবান এবং ইহার সঙ্গে পা-আন সহর ও সালুইন, বিলিন ও ডনথামি নদী—এই অংশটার মধ্যেই মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ পাঞ্জা লড়িতেছে। এক্ষণে সাম্রাজ্য বাহিনী দাঁড়াইয়াছে বিলিন নদীর তীর ধরিয়া, এখানে রহিয়াছে। তাহাদের দক্ষিণ বাহু বা right flank, আর বাম বাহু বা left flank রহিয়াছে থাটনের নীচে ডনথামি নদীর ধারে। কিন্তু জাপানীরা দুইদিক দিয়াই সাম্রাজ্য-বাহিনীর দুই বাহু বিপন্ন করিতে পারে। পা-আন হইতে থাটন মাত্র ২৫ মাইল পশ্চিমে, জাপানীরা এখানে সালুইন নদী অতিক্রম করিয়াছে।

ভারতীয় বেলুচী সেনাদের সহিত পা-আনে জাপানীদের তীব্র সংঘর্ষ হইয়াছিল, কিন্তু ভারতীয় সৈন্যরা পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইয়াছে এবং জাপবাহিনী এখানে শক্ত হইয়া বসিয়াছে। এই দিক দিয়া তাহারা সাম্রাজ্যবাহিনীর বাম বাহু (যাহা থাটনের কিছু দক্ষিণে) এবং মার্ত্তাবান উপসাগরে জাহাজ যোগে সৈন্য নামাইয়া সাম্রাজ্যবাহিনীর দক্ষিণ বাহু বিপন্ন করিতে পারে। আবার থাটনের দিক হইতে বিলিন নদীতীরস্থ সাম্রাজ্য বাহিনীর দক্ষিণ বাহু আক্রান্ত হইতে পারে। সুতরাং সাম্রাজ্যবাহিনীর অবস্থা এখানেও সামরিক দিক হইতে যথেষ্ট আশাপ্রদ নহে। যেখানে সৈন্যবাহিনীর দুই পার্শ্বই দুই বা তিন দিক হইতে আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা, সেখানে শত্রুকে সাফল্যের সহিত বাধা দেওয়া সহজ নহে। যদি থাটনে ও বিলিন নদীতীরে জাপ-বাহিনীকে প্রতিরোধ করিতে না পারা যায়, তবে থাটনের রেলপথ ও রাস্তা করায়ত্ত করিয়া স্থলপথে জাপানীরা রেঙ্গুণকে আরও বিপন্ন করিতে পারিবে।

মৌলমেনের ৪০ মাইল উত্তরে বিলিন নদীতীরে সাম্রাজ্যবাহিনী নূতন ব্যূহ রচনা করিয়াছে এবং জাপানীরা রেঙ্গুণের ১০৫ মাইলের মধ্যে পৌছিয়াছে। ছয়দিনে জাপানীরা ৬০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। বিলিন সহর হইতে পেগু ৫৫ মাইল, উৎকৃষ্ট রাস্তা ও রেলপথের দ্বারা ইহা সংযুক্ত। বিলিন নদীর পর সিটাং নদী এবং সিটাং হইতে পেগু পর্য্যন্ত শুষ্ক সমতল ভূমি, যাহা যান্ত্রিক বা পদাতিক বাহিনীর সংগ্রামের পক্ষে উৎকৃষ্ট। সুতরাং জাপানীদের এই দিক দিয়া অগ্রগতি এবং সাম্রাজ্যবাহিনীর পশ্চাদপসরণ রেঙ্গুণের পক্ষে মোটেই শুভ নহে। ব্রহ্মের যুদ্ধ ক্রমশঃই প্রচণ্ড ও ভয়াবহ আকার ধারণ করিবে। সিঙ্গাপুরের যুদ্ধের জন্য তাহাদের আক্রমণ এতদিন

কিছু মন্দীভূত ছিল, কিন্তু সিঙ্গাপুরের পতনের পর একদিকে জাভা, সুমাত্রা এবং অন্য দিকে ব্রহ্মদেশের উপর জাপ আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হইবে। সিঙ্গাপুরের দুর্গদ্বার মুক্ত হওয়ায় মালাক্কা প্রণালী দিয়া জাপ নৌবহরের আবির্ভাব সম্ভাবনা। এই নৌবহর মার্ত্তাবান উপসাগর ও বঙ্গোপসাগরে পৌছিয়া রেঙ্গুণ, চট্টগ্রাম ও কলিকাতাকে যুগপৎ বিপন্ন (অন্ততঃ বোমারু আক্রমণের দ্বারা) করিতে পারে। থাটনের মধ্য দিয়া স্থলপথে অগ্রগতির সঙ্গে জাপ নৌবহর মার্ত্তাবান উপসাগর দিয়া রেঙ্গুণ ও থাটনের যুদ্ধে সহযোগিতা করিতে পারে। কিন্তু অষ্ট্রেলিয়ার ঘাঁটি সম্পর্কে নিশ্চিন্ত না হইয়া জাপ নৌবহরের একটা বড় অংশ মার্ত্তাবান ও বঙ্গোপসাগরের অভিযানে পূর্ণোদ্যমে বাহির হইবে কিনা, তাহা নিশ্চয়ই বিতর্কের অপেক্ষা রাখে। তবে, দক্ষিণ চীন-সমুদ্র হইতে মার্ত্তাবান উপসাগর পর্য্যন্ত দীর্ঘ জলপথের সমস্ত নৌ-ঘাঁটি ও বন্দর জাপানীদের দখলে যাওয়ায় জাপ নৌবিভাগের দুঃসাহস ও লোভ জাগ্রত করিতে পারে এবং জাপানীরা দ্রুত যুদ্ধ শেষ করিতে চাহে বলিয়া জল, স্থল ও আকাশের সমবেত শক্তি একই সঙ্গে প্রয়োগ করিতে পারে। ব্রহ্মের এই যুদ্ধে জাপ পদাতিকবাহিনী বিমান বহরের সহযোগিতায় রেঙ্গুণকে দ্রুত কাবু করিতে চাহিবে। জাপানের বিমান শক্তি নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে এবং বিমান পথের দূরত্ব হিসাবে জাপানীরা রেঙ্গুণ হইতে মাত্র ৮০ মাইল দূরে আছে। এত নিকট হইতে জাপ বিমানবহর যে অনায়াসে ধ্বংসকর অভিযান চালাইতে চাহিবে, তাহা অনুমান করা কষ্টকর নহে।

চুংকিং হইতে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম দেশের যুদ্ধের জন্য ৩০ হাজার জাপ সৈন্য ইন্দোচীনে পৌছিয়াছে, আরও দুই ডিভিসন (বর্ত্তমানে জাপানীদের এক ডিভিসনে বোধ হয় ২৫ হাজার সৈন্য

আছে) জাপ সৈন্য ইতিপূর্ব্বেই ব্রহ্ম দেশে গিয়াছে এবং মালয়ের যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় আরও সৈন্য সেখান হইতে আনা হইতেছে। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশ আক্রমণে মোট জাপানী সৈন্যের সংখ্যা এক লক্ষ হইবে। এই এক লক্ষ সৈন্যের গতিরোধ করিতে হইলে অনুরূপ সংখ্যক সৈন্য ও সমরোপকরণ তো দরকার বটেই, অধিকন্তু সংখ্যাশক্তির দিক দিয়াও সাম্রাজ্যবাহিনীর আরও বেশী শক্তিশালী হওয়া প্রয়োজন। দেড় লক্ষ হইতে দুই লক্ষ সৈন্য এবং উপযুক্ত বিমান বহর ও অস্ত্রশস্ত্রের একান্ত প্রয়োজন। জাপানীদের বিরুদ্ধে চীনা সৈন্যেরা যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছে এবং মার্শাল চিয়াং কাইশেকের সহযোগিতায় প্রচুর চীনা সৈন্য ব্রহ্মদেশে সমবেত হইয়াছে। সামরিক কারণেই চীনা ও ভারতীয় সৈন্যের সংখ্যা বর্ত্তমানে জানা যাইবে না। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের সমস্যা এই যে, কেবল man power বা সৈন্য সংখ্যার প্রাচুর্য্য থাকিলেই চলিবে না, material বা সমরোপকরণেরও প্রাচুর্য্য থাকা চাই। জাপানী যুদ্ধে যান্ত্রিক সংগ্রামের বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু জার্ম্মাণ যুদ্ধের মত ইহাতে ট্যাঙ্কের আধিপত্য নাই। যুদ্ধক্ষেত্রের ভৌগোলিক রূপই ইহার অন্যতম কারণ। সমুদ্র, নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, দ্বীপ, প্রণালী, উপদ্বীপ ও যোজক—এইগুলিই ইঙ্গ-জাপ রণক্ষেত্রের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য এবং এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ট্যাঙ্ক অপেক্ষা বোমারু বিমান, নৌবহর ও পদাতিক বাহিনীই প্রাধান্য অর্জ্জন করিতেছে। জাপানীরা রণক্ষেত্রের এই প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিঘ্নকে অতিক্রম করিবার নৈপুণ্যও দেখাইয়াছে এবং এশিয়া ভূখণ্ডে বহু বৎসর ধরিয়া সংগ্রামরত থাকায় জাপানীরা এই অঞ্চলের যুদ্ধে প্রচুর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছে। অপরপক্ষে ভারতীয় এবং চীনা সৈন্যদেরও অভিজ্ঞতা ও সাহস আছে। যদি মিত্রপক্ষ উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্য ও সমরোপকরণ জুটাইতে পারেন,

তবে, রেঙ্গুণে না হউক অন্ততঃ উত্তর ও মধ্য ব্রহ্মে তাঁহারা জাপানী-দিগকে দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করিয়া রাখিতে পারিবেন। চুংকিং হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, চীনের পক্ষে ব্রহ্মদেশই যুদ্ধ চালনার শেষ সামরিক ঘাঁটি (Last line of operational bases) এবং এই শেষ ঘাঁটি রক্ষার জন্য চীনা সৈন্যরা শেষ রক্তবিন্দু দান করিবে। ব্রহ্মদেশ ও রেঙ্গুণ কেবল চীনেরই আত্মরক্ষার শেষ ঘাঁটি নহে, উহা ভারতবর্ষের আত্মরক্ষারও শেষ দূরবর্ত্তী দুর্গদ্বার।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(৪)

রেঙ্গুণ অভিমুখে

২৫শে ফেব্রুয়ারী, '৪২।

সিঙ্গাপুরের যখন পতন হইয়াছিল, তখন একথা বুঝাইবার চেষ্টা হইয়াছিল যে, মিত্রশক্তির পক্ষে সিঙ্গাপুরের গুরুত্ব আর ততখানি নাই। এক্ষণে রেঙ্গুণই সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি, চীনের সরবরাহ ব্যবস্থা ও ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে রেঙ্গুণের মূল্য অপরিসীম। সুতরাং যেভাবেই হউক রেঙ্গুণকে রক্ষা করা হইবে। কিন্তু গত ৮।১০ দিন ধরিয়া থাটন জেলা ও বিলিন নদীর ধারে যে যুদ্ধ চলিতেছিল এবং তাহাতে যে ফলাফল হইয়াছে, তাহাতে রেঙ্গুণের অদৃষ্ট সম্পর্কে ভরসা পাওয়া কঠিন। যতদিন সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ চলিতেছিল, ততদিন দক্ষিণ ব্রহ্মে জাপানীরা প্রবল আক্রমণ করিতে পারে নাই। তথাপি তাহারা

সেই সুযোগে মৌলমেন ও মার্ত্তাবান দখল করিয়া লইয়াছিল। আজ সিঙ্গাপুর সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হইয়া এবং সেখানে জাপ নৌবহর আনিবার ব্যবস্থা করিয়া জাপানীরা ব্রহ্মদেশে প্রবল চাপ দিয়াছে। মৌলমেন হইতে মার্ত্তবান হইয়া তাহারা প্রথমে পা-আন দখল করিয়াছে, সেখান হইতে তাহারা একযোগে বিলিন ও সিটাং নদীর দিকে নজর দিয়াছে। বিলিন নদীতীরে বোধ হয় ৪।৫ দিন প্রচণ্ড যুদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু এই যুদ্ধের কোন বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় নাই। গত ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখ সাম্রাজ্যবাহিনী বিলিন নদীতীর হইতে পশ্চাদপসরণ করিয়া সিটাং নদীর আড়ালে নূতন ব্যূহ রচনা করিয়াছে। পা-আন হইতে থাটন ও বিলিনের দিকে দুই পার্শ্ব ধরিয়া যেভাবে জাপানীরা আক্রমণ চালাইয়াছিল তাহাতে বিলিন নদীতটে মিত্রবাহিনীর আত্মরক্ষা যে বেশী দিন সম্ভব ছিল না, একথা তখনই স্পষ্ট হইয়াছিল। জাপানীরা বিলিন নদী অতিক্রম করিতে গিয়া রবারের নৌকা ব্যবহার করিয়াছিল। কিন্তু এখানকার সংগ্রাম আধুনিক যান্ত্রিক যুদ্ধের ধারা পুরাপুরি অনুসরণ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। ট্যাঙ্কের কোন ব্যবহার এখানে হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায় নাই—হইয়াছে হাতাহাতি যুদ্ধ ও পরস্পরের বেয়নটের সংঘর্ষ। জাপানীরা ট্যাঙ্ক-শক্তিতে প্রবল নহে, তবে বিমানশক্তি উভয়পক্ষই প্রবলভাবে প্রয়োগ করিয়াছিল। তথাপি সাম্রাজ্যবাহিনী পশ্চাতে হটিতে বাধ্য হইল কেন, সেই প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে। কৈফিয়ৎস্বরূপ বলা হইয়াছে যে, জাপানীরা নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিয়াছে। কিন্তু মিত্রপক্ষে সৈন্যসংখ্যা কম হইবার কথা নয়। ভারতীয়, চীনা ও বৃটিশ—প্রধানতঃ এই তিন জাতীয় সৈন্য ব্রহ্মদেশ রক্ষায় প্রচুরভাবে সমবেত করা হইয়াছে বলিয়া প্রচারিত হইয়াছিল। চীনা সৈন্যেরা দলে দলে ব্রহ্ম-

দেশে আসিয়াছে এবং ভারতীয় সৈন্যেরতো কথাই নাই। তথাপি আজ সৈন্য সংখ্যার অজুহাত দেওয়া হইতেছে কেন? আর যুদ্ধ যেখানে ট্যাঙ্কের প্রাচুর্য্যের উপর নির্ভরশীল নহে, সেখানে সাম্রাজ্যবাহিনী তিষ্ঠিতে পারিতেছে না কেন? হাতাহাতি যুদ্ধ এবং কামান ও রাইফেলের ব্যবহারে জাপ সৈন্যের তুলনায় ভারতীয় সৈন্যেরা শ্রেষ্ঠ বলিয়াই অনেকের ধারণা। ভারতীয় সৈন্যেরা যুঝিতেছে নিজেদের দেশে—এখানকার নদী, জঙ্গল ও পথঘাট ব্রহ্মদেশীয় বা ভারতীয় সৈন্যদের নিকট সুপরিচিত। এই অবস্থায় বিলিন নদী হইতে সাম্রাজ্য-বাহিনীর পশ্চাদপসরণ অত্যন্ত দুর্ভাগ্য ও দুঃখের কথা।

সালুইন ও বিলিন নদীর পর এক্ষণে বাকি রহিল সিটাং নদী, তারপরেই পেগু ও রেঙ্গুণ। রেলপথ ও পাকা রাস্তার দ্বারা এইগুলি পরস্পরের সহিত যুক্ত। প্রকাশ যে, জাপ সৈন্যরা রেঙ্গুণ সহর হইতে মাত্র ৭০ মাইল দূরে আছে। জঙ্গলাকীর্ণ ভূমির যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। এক্ষণে সুরু হইল উৎকৃষ্ট সমতল ভূমি। পদাতিক সৈন্যের পক্ষে সমতল ভূমির মত লোভনীয় কিছু নাই। অপর পক্ষে জঙ্গল ও নদীর যুদ্ধে জাপানীরা যে ওস্তাদি দেখাইয়াছে, তাহাও বার বার স্বীকার করা হইয়াছে। কিন্তু প্রশ্ন এই যে, জঙ্গল, পাহাড়, নদী বা সমতল ভূমি যে কোন স্থানেই যদি জাপানীরা ক্রমাগত সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইয়া আত্মরক্ষার ব্যূহ ভাঙ্গিতে থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশ রক্ষা পাইবে কিসের জোরে? ভারতীয় পদাতিক বাহিনীর দ্বারাও যদি জাপ পদাতিক বাহিনীকে ঠেকানো না যায়, তবে রেঙ্গুণের দশা কি হইবে? রেঙ্গুণ সমুদ্র তীর হইতে মাত্র ২১ মাইল। এখানকার নদীর মোহনা গঙ্গার মোহনার মত নহে, গঙ্গার মোহনা ধরিয়া বড় বড় জাহাজের পক্ষে ৮০ মাইল দূরবর্ত্তী কলিকাতায়

প্রবেশ সহজসাধ্য নহে। কিন্তু ষ্টীমার, নৌকা ও বড় জাহাজ অপেক্ষাকৃত সহজে রেঙ্গুণ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে। সিঙ্গাপুর ও পেনাং হইয়া জাপানী নৌবহর যে কোন মুহূর্ত্তে রেঙ্গুণের দিকে অভিযান করিতে পারে এবং বঙ্গোপসাগরে ইতিপূর্ব্বেই তাহারা সক্রিয় হইয়াছে। এইজন্য বন্দর হিসাবে রেঙ্গুণ পরিত্যক্ত হইয়াছে, উহার জলপথে মাইন বসানো হইয়াছে শত্রুপক্ষের নৌবহরকে বাধা দেওয়ার জন্য। রেঙ্গুণ এক্ষণে আর বন্দর নহে এবং নাগরিক পরিপূর্ণ সহরও নহে। একমাত্র যুদ্ধ পরিচালনার জন্য যাহাদের উপস্থিতি প্রয়োজন, তাহারা ছাড়া আর বাকি সমস্ত নাগরিককে রেঙ্গুণ হইতে সরাইয়া ফেলা হইয়াছে। দলে দলে নরনারী ষ্টীমারে, নৌকায়, মোটরে ও পায়ে হাঁটিয়া রেঙ্গুণ ছাড়িয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছে। রেঙ্গুণ খাস রণক্ষেত্রের মর্য্যাদায় উন্নীত হইল। কিন্তু ইহা আনন্দের কথা নহে। একদিকে সিটাং নদীতট হইতে পেগু হইয়া জাপ পদাতিক বাহিনী এবং অন্য দিকে মার্ত্তাবান উপসাগর দিয়া জাপ নৌবাহিনী রেঙ্গুণের উপর আক্রমণ চালাইবে। ইহার সঙ্গে জাপানী বিমানবহর যে সহযোগিতা করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সিঙ্গাপুর যুদ্ধের সময় যেমন তোব্রুকের তুলনা দিয়া 'ষ্টেট্সম্যান' দীর্ঘ অবরোধ যুদ্ধের ব্যর্থ প্রত্যাশা করিয়াছিলেন, রেঙ্গুণ সম্পর্কেও তথাকার গভর্ণর তেমনই তোব্রুকের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। লাট সাহেবের এই কথার মধ্যে আশা আছে বটে, কিন্তু সামরিক দিক হইতে খুব ভরসা আছে কিনা জানি না। কারণ, তোব্রুকের সঙ্গে রেঙ্গুণের তুলনা দেওয়াই ভুল। তোব্রুক লিবিয়ার মরুভূমির একটা ছোট বন্দর, উহা সমুদ্রের উপকূলে এবং সেই সমুদ্রে ভূমধ্যসাগরীয় বৃটিশ নৌবহরের একাধিপত্য ছিল এবং বিমানবহরও সক্রিয় ছিল। অপর পক্ষে ভূমধ্যসাগরের এই অংশে জার্ম্মাণবাহিনীর কোন নৌবহর ও

নৌ-আধিপত্য ছিল না। তাহারা সোজা ট্যাঙ্ক চালাইয়া বেজাজী ও ডের্ণা হইতে তোব্রুককে বামদিকে রাখিয়া চলিয়া গিয়াছিল। বিমান-শক্তিও তাহাদের যথেষ্ট ছিল না। সুতরাং তোব্রুকের পক্ষে দীর্ঘকাল আত্মরক্ষা করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু রেঙ্গুণের অবস্থা কি? সিঙ্গাপুর, পেনাং ও ভিক্টোরিয়া পয়েণ্ট এবং মালয় উপদ্বীপের ও দক্ষিণ ব্রহ্মের সমস্ত নৌঘাঁটি ও বিমানঘাঁটি জাপানীদের দখলে যাওয়ায় সমুদ্রপথে জাপানের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সমুদ্রপথ দিয়া রেঙ্গুণ বিপন্ন এবং যদি কোন বন্দর সমুদ্রের দিক দিয়া বিপন্ন হয়, তবে, উহার অদৃষ্ট সম্পর্কে নিতান্ত উদ্বেগ বোধ না করিয়া উপায় নাই। কেবল জলপথই নহে, রেঙ্গুণ স্থলপথ দিয়াও বিপন্ন হইয়াছে এবং সেই বিপদ আরও প্রত্যক্ষ। যদি সিটাং নদীর তটে জাপানীদিগকে রোধ করা না যায়, তবে, পেগু হইতে রেঙ্গুণের দিকে জাপ-বাহিনী স্থলপথে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইবে। জাপানীরা সেই দিকেই অগ্রসর হইতেছে। যদি স্থলপথে পদাতিক বাহিনী, আকাশে বিমান এবং জলে যুদ্ধ-জাহাজ একত্রিত হয়, তবে, এই ত্রিধারার সংগ্রামে রেঙ্গুণের সঙ্কট কত ভয়াবহ হইবে, তাহার বর্ণনা অনাবশ্যক।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(৫)

পেগু ও রেঙ্গুণের বিপদ

২৮শে ফেব্রুয়ারী '৪২।

ফেব্রুয়ারীর শেষ ও মার্চ্চের প্রথম ভাগ হইতে সিটাং নদী অতিক্রম করার পর জাপানীদের পেগু ও রেঙ্গুণ অভিযানের গতি বৃদ্ধি পায়। ২৬শে ফেব্রুয়ারী সংবাদ আসে যে, জাপানীরা পেগু সহর বিপন্ন করিয়া তুলিয়াছে এবং রেঙ্গুণ হইতে উত্তরগামী পথটিও বন্ধ করিবার উপক্রম করিতেছে। চিয়াংমাইয়ে প্রধান ঘাঁটি করিয়া পাপুন হইতে উক্ত পথের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে আক্রমণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে। সিটাং নদীর পূর্ব্ব তীর ধরিয়া জাপ সৈন্যেরা উত্তর দিকে অগ্রসর হইতেছে। আর বৃটিশ সৈন্যেরা সিটাং নদীর পশ্চিম তীরে পশ্চাদপসরণ করিতেছে। সিটাং প্রশস্ত নদী, কিন্তু তেমন বেগবতী

নহে, চীন-ব্রহ্ম রাজপথের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হইতে উহা ২০ মাইল দূরে অবস্থিত। পশ্চাদপসরণের পর বৃটিশ সৈন্যগণ নদী মোহনার একটি বড় রেলওয়ে সেতু ধ্বংস করিয়াছে। বৃটিশ পক্ষে বহু সৈন্য হতাহত হইয়াছে সত্য, কিন্তু জাপানীদের প্রচণ্ড ক্ষতি হইয়াছে। সিটাং নদীর পূর্ব্ব তীরে জাপানীদিগকে প্রায় ১০ দিন ঠেকাইয়া রাখা হইয়াছিল। যুদ্ধারম্ভ হওয়ার পর বোধ হয় ফিলিপাইন ব্যতীত আর কোথাও প্রতিপক্ষকে এত বেশীদিন প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় নাই। ইহাতে যে সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহা বৃটিশ বাহিনীর ভবিষ্যৎ সংগ্রামে বিশেষ কাজে লাগিবে। 'এসোসিয়েটেড প্রেসে'র সংবাদদাতা জানাইতেছেন:—বৃটিশ ও সাম্রাজ্যবাহিনীর যে সকল সৈন্য সিটাং নদীর তীরবর্ত্তী ব্যূহ রক্ষা করিতেছে, রেঙ্গুণ রক্ষার পরবর্ত্তী চরম যুদ্ধের জন্য নূতন সৈন্য আনিয়া তাহাদের শক্তি বৃদ্ধি করা হইয়াছে। রেঙ্গুণ এই ব্যূহ হইতে ৭০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। পূর্ব্বে বিলিন নদীর তীর বরাবর জাপ বাহিনীকে বাধা দিয়া যে সময় পাওয়া গিয়াছে, তাহাতেই নূতন সৈন্য আমদানি সম্ভব হইয়াছে। জাপানীরা যে কোন সময় সিটাং নদীর তীরে হানা দিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। রেঙ্গুণের সামরিক বিজ্ঞপ্তিতেও বলা হইয়াছে যে, জাপবাহিনী এ পর্য্যন্ত যদিও সিটাং নদী পার হইবার চেষ্টা করে নাই, তথাপি উক্ত নদীর পূর্ব্ব তীরে বহু সংখ্যক জাপ সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে। শ্যাম ও ইন্দোচীন হইতে বহু সংখ্যক জাপ সৈন্য আনা হইতেছে। জাপানীরা জানে যে, একবার যদি তাহারা নদী পার হইতে পারে, তবে, রেঙ্গুণে পৌছিবার সর্ব্বশেষ প্রাকৃতিক বাধা তাহারা অতিক্রম করিবে। সেই জন্য গুরুতর ক্ষতি সহ্য করিতেও তাহারা প্রস্তুত হইয়াছে। তাহারা যদি সিটাং নদী পার হইতে না পারে, তথাপি পেগুর পতন

হইলে তাহারা দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে গতি পরিবর্ত্তন করিয়া রেঙ্গুণ অভিমুখে অগ্রসর হইতে পারিবে। পেগু হইতে রেঙ্গুণের দূরত্ব মাত্র ৫৪ মাইল।

ইহার পর ২৮শে তারিখ লণ্ডন হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রেঙ্গুণের চারদিকের অবস্থা সঙ্কটজনক। রেঙ্গুণের কর্ত্তৃত্বভার সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের হাতে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সিটাং রণক্ষেত্রে একটি সেতুমুখ দখলের জন্য তুমুল যুদ্ধ চলিয়াছে। বৃটিশবাহিনী প্রচণ্ডভাবে যুদ্ধ চালাইয়া প্রায় দুই হাজার জাপ সৈন্য হতাহত করিয়াছে। শত্রুপক্ষের সৈন্য সংখ্যা বেশী থাকায় এবং তাহারা খুব বেশী চাপ দেওয়ায় বৃটিশ বাহিনীকে সিটাং নদীর পশ্চিম দিকে সরিয়া আসিতে হইয়াছে। অবশ্য সেতুটিও উড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। জাপানীরা পেগুর নিকট রেলপথ বিচ্ছিন্ন করার দাবী করিয়াছে। এই দাবী বোধ হয় সত্য। কারণ, এই অঞ্চলে তাহারা প্রবল চাপ দিয়াছিল। রেঙ্গুণ হইতে বলা হইয়াছে যে, 'গত ২০শে ফেব্রুয়ারী সংখ্যাধিক শত্রু সৈন্যের সহিত তিনদিন প্রচণ্ড যুদ্ধ করিয়া এবং বহু সংখ্যক শত্রু সৈন্য হতাহত করিয়া আমাদের সৈন্যগণ বিলিন রণাঙ্গন ত্যাগ করে। ক্ষতির পরিমাণ এত বেশী হইয়াছিল যে, তাহারা আমাদের অনুসরণ করিয়া আসিতে পারে নাই। তবে, হস্তীসহ বৃহৎ এক দল সৈন্য শত্রুপক্ষের সাহায্যের জন্য নদীতীর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া আসে। শত্রুরা যাহাতে সিটাং নদীর তীরে পৌছিতে না পারে, তজ্জন্য আমাদের সৈন্যগণ উক্ত নদীতীরে হটিয়া যায়। কিন্তু সেখানে বৃহৎ একদল শত্রুসৈন্য আমাদের অগ্রবর্ত্তী ঘাঁটিগুলির উপর এরূপ কঠোর চাপ দেয় যে, আমাদের ব্যূহ আরও শক্ত করিবার জন্য আরও পশ্চাদপসরণ করিয়া সিটাং নদীর পশ্চিম তীরে চলিয়া আসে।'

ইহার পর জাপানীরা সিটাং নদী অতিক্রম করে এবং ৩রা মার্চ্চ তারিখ সরকারীভাবে স্বীকার করা হয় যে, সিটাং রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষের সংঘর্ষের পর জাপানীরা সিটাং নদী পার হইয়া পেগুর ১৫ মাইল উত্তর-পূর্ব্বে বাও নামক স্থানে উপস্থিত হয়। সমগ্র ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষ রক্ষার ভার জেনারেল ওয়াভেলের উপর অর্পিত হয়। তিনি সর্ব্ব-প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হইলেন। অপর পক্ষে উত্তর ব্রহ্মে বহু সংখ্যক চীনা সৈন্যের (জাপানীদের মতে ৫ ডিভিসন) সমাবেশ হয়। মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল ষ্টিলওয়েল উত্তর ব্রহ্ম এবং বৃটিশ সেনাপতি জেনারেল আলেকজেণ্ডার দক্ষিণ ব্রহ্ম রণাঙ্গনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ওদিকে জাপানীরাও এই দুই অংশে চাপ দিবার জন্য তৈয়ারী হয়।

এতদিন দক্ষিণ ব্রহ্মের উপরেই জাপানীদের চাপ প্রবল ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তাহারা উত্তর ব্রহ্মের দিকেও মন দিয়াছে। রণনীতির সাধারণ ধর্ম্মানুসারে ইহা অপ্রত্যাশিত নহে। যখন কোন দেশকে আক্রমণ করা হয়, তখন কৌশলী শত্রু কেবল একদিকেই কিম্বা একই অঞ্চলের বিভিন্ন দিকেই অগ্রসর হয় না। প্রতিপক্ষকে ধাপ্পা দেওয়া কিম্বা প্রতিপক্ষের সৈন্যদল বিচ্ছিন্ন করার জন্য তাহারা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অংশের উপর আক্রমণ করিতে থাকে। এই বিষয়ে জার্ম্মাণ রণনীতিই সর্ব্বাধিক উল্লেখযোগ্য। হঠাৎ অতর্কিত আক্রমণ, ব্যাপক সৈন্য সমাবেশ এবং বিভিন্ন দিকে একই সঙ্গে অভিযান ইত্যাদি জার্ম্মাণ রণকৌশলের বৈশিষ্ট্য। পোল্যাণ্ডে তাহারা একই সময়ে তিনদিকে, পশ্চিম ইউরোপের (ফ্রান্স. বেলজিয়াম, লাক্সেমবুর্গ, হল্যাণ্ড) বিভিন্ন দিকে ও বিভিন্ন অংশে এবং সোভিয়েট রাশিয়ার দীর্ঘ দেড় হাজার মাইল রণক্ষেত্রে একই সময়ে অভূতপূর্ব্ব প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়াছিল। ইহার উদ্দেশ্য ছিল প্রতিপক্ষের সমগ্র সৈন্যবাহিনী বিচ্ছিন্ন করা, কোন

অংশে যাহাতে আত্মরক্ষার জন্য কেন্দ্রীভূত করা না যায়, সে জন্য বাধা দেওয়া এবং ব্যাপক ও আকস্মিক আক্রমণে বিহ্বল করিয়া দেওয়া। আজ জাপানীরা ব্রহ্মদেশে যে আক্রমণ চালাইতেছে, উহা আর অতর্কিত নহে, তবে তাহারা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অংশে একই সময়ে প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইয়া আত্মরক্ষায় বিভ্রাট বাধাইতে চাহিতেছে। থাইল্যাণ্ড বা শ্যামদেশের উত্তরাংশ যেখানে ব্রহ্মের সহিত মিশিয়াছে, জাপ সৈন্যেরা সেখানে আক্রমণের জন্য অগ্রসর হইয়াছে। এই দিকে ৭০ হাজার জাপ সৈন্যের সমাবেশ হইয়াছে। এই সৈন্যদলের প্রধান আড্ডা চেঙ্গমাইতে। চেঙ্গমাই একটী বড় বিমান ঘাঁটি এবং ইহা ব্যাঙ্ককের সহিত রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। ব্রহ্মদেশের শানরাজ্য, ইন্দোচীন ও থাইল্যাণ্ড অর্থাৎ তিনটি সীমানা যেখানে পরস্পরের সহিত হাত ধরিয়াছে, সেইদিকেই জাপানীদের প্রচণ্ড অভিযান আসন্ন। যে ৭০ হাজার সৈন্য এইদিকে সমাবেশ করা হইয়াছে, উহার মধ্যে ৩০ হাজার সৈন্য চেঙ্গমাইতে, আরও ৩০ হাজার উত্তরবর্ত্তী চিয়েংরাইতে এবং বাকী ১০ হাজার মেকং নদীতটে সমাবেশ করা হইয়াছে। মেকং নদী ব্রহ্ম-শ্যাম ও ইন্দোচীনের সীমানা পথে প্রবাহিত। এই সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্য উত্তর ব্রহ্মের শান রাজ্যগুলি আক্রমণ। দক্ষিণে রেঙ্গুণ ও পেগুর দিকে যখন অভিযান চলিতেছে, তখন উত্তর দিকে শান রাজ্যসমূহের প্রতিও আক্রমণ চালানো হইবে।

ইন্দোচীন ও শ্যাম জাপানীদের কবলে যাওয়ায় ব্রহ্মদেশের বিপদ এত গুরুতর হইয়াছে। কারণ, এই দুই দেশই ব্রহ্ম সীমান্তের সঙ্গে সংযুক্ত। যদি সীমান্তবর্ত্তী রাজ্যগুলিতে পুরাপুরি প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা যায়, তাহা হইলে আক্রমণের পক্ষে যে সুবিধা পাওয়া যাইবে, তাহা বলা বাহুল্য মাত্র। আধুনিক যুদ্ধে শত্রুকে যত দূরে রাখা যায় ততই মঙ্গল।

কারণ, ট্যাঙ্ক ও বিমানের জন্য আজ দূরত্বের ব্যবধান ঘুচিয়াছে। রুশ-জার্ম্মাণ যুদ্ধের আগে সোভিয়েট রাশিয়া কর্ত্তৃক পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড ও রুমানিয়ার সীমান্তবর্ত্তী অংশগুলি দখলের পশ্চাতে রাশিয়ার মনে এই আশঙ্কাই ছিল। তাহারা আত্মরক্ষার সামরিক প্রয়োজনে এইগুলি দখল করিয়াছিল। যদি মিত্রপক্ষ থাইল্যাণ্ড ও ইন্দোচীন পূর্ব্বাহ্নে দখলে আনিতে পারিতেন, তাহা হইলে আজ ব্রহ্মদেশ এত বিপদে পড়িত না। আজ জাপানীরা ব্রহ্মের দুই দিকে অগ্রসর হইবার জন্য শ্যামের সীমানা অঞ্চলে নূতন নূতন বিমান ঘাঁটি ও রাস্তা তৈয়ার করিতেছে। পাপুন হইতে ১০ মাইল পশ্চিমে তাহারা একটি সামরিক রাস্তাও ইতিমধ্যে তৈয়ার করিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। যদি এভাবে তাহারা রাস্তা ও ঘাঁটি তৈয়ার করিতে পারে, তবে তাহারা একই সময়ে উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে পারিবে এবং এই আক্রমণ সাঁড়াশির চাপের আকার ধারণ করিবে কিনা তাহা আর কয়েকদিনের মধ্যেই বুঝা যাইবে। সিটাং ও পেগু অভিমুখে জাপানীরা যেভাবে অগ্রসর হইতেছে, তাহাতে রেঙ্গুণের অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক হইয়াছে।

সিটাং নদী পার হওয়ার আগে যুদ্ধের গতি কি আকার ধারণ করিতে পারে এবং জাপানীদের সামরিক হালচাল কি হইতে পারে, সেই সম্পর্কে জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী লিখিয়াছেন—

যুদ্ধের গতি দেখিয়া মনে হয়, জাপানীরা সিটাং নদীর মোহনা হইতে প্রায় ১০০ মাইল উত্তরে ব্যাপক অঞ্চল জুড়িয়া বৃটিশ বাহিনীর পার্শ্বদেশ অতিক্রম করিবার চেষ্টা করিবে। টাঙ্গুর নিকটবর্ত্তী উক্ত অঞ্চলে এবং উহার ৫০ মাইল উত্তরে ব্রহ্ম ও থাইল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী গিরি-সঙ্কটের পথ তাহারা ব্যবহার করিতে পারে। অন্য টাঙ্গুতে প্রচণ্ড

বোমা বর্ষিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এরূপ বিমান আক্রমণ সেখানে এপর্য্যন্ত আর কখনও হয় নাই। ইহাতে মনে হয়, জাপানীরা চীন-ব্রহ্ম রাস্তায় এই স্থানটিতে স্থলপথে আক্রমণের মতলব করিতেছে। প্রধান জাপ বাহিনীকে এখন পর্য্যন্ত সিটাং নদীর পূর্ব্ব তীরে ঠেকাইয়া রাখা হইলেও তাহাদের টহলদার সৈন্যগণ ব্রহ্ম-চীন পথের নিকটবর্ত্তী স্থান সাময়িকভাবে ভেদ করিতে সমর্থ হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় অবস্থা মোটেই আশাপ্রদ নহে এবং রেঙ্গুণ ও সমগ্র নিম্ন ব্রহ্ম এখনও বিশেষ বিপন্ন। উত্তর-পশ্চিম থাইল্যাণ্ডে বহু জাপ সৈন্য সমাবেশ করা হইয়াছে। এই সকল সৈন্য শীঘ্রই দক্ষিণ শান রাজ্য আক্রমণ করিবে বলিয়া মনে হইতেছে।

এই সময় দক্ষিণ ব্রহ্মের নানা সহরে জাপানী বোমারু প্রচণ্ড আক্রমণ চালাইতে থাকে। রেঙ্গুণ, পেগু, টাঙ্গু, ইত্যাদিতে প্রবল বোমা বর্ষিত হওয়ায় লক্ষ লক্ষ নর-নারী ঘরবাড়ী সম্পত্তি ফেলিয়া চারিদিকে পলায়ন করিতে থাকে। বিশেষভাবে ব্রহ্মদেশবাসী ভারতীয়গণ, যাহাদের সংখ্যা কয়েক লক্ষ হইবে, তাহারা ভারতবর্ষের দিকে ছুটিতে থাকে। লক্ষ লক্ষ নর-নারীর ব্রহ্মদেশ ত্যাগ এক বৃহৎ সমস্যার সৃষ্টি করে। তাহাদের কষ্ট, লাঞ্ছনা এবং ক্ষয় ও ক্ষতির পরিমাণ অবর্ণনীয়।

ছোট সহরে ও গ্রাম অঞ্চলেও জাপানীদের বোমারু অবিরত ধ্বংস-লীলা বিস্তার করিতেছিল। ইহার একটি চমকপ্রদ বর্ণনা পাঠকদের কৌতূহল তৃপ্তির জন্য উল্লেখ করিতেছি।

সিটাং নদীর রণাঙ্গনস্থিত 'এসোসিয়েটেড প্রেসে'র সংবাদদাতা লিখিতেছেন যে, 'জাপানীরা স্থলপথে ক্রমে ক্রমে চীন-ব্রহ্ম রাজপথের দিকে অগ্রসর হইবার সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণাঞ্চলের রেলপথের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তার বিভিন্ন অংশে প্রবল বোমা-বর্ষণ করিতেছে। আমি কয়েকটী

গ্রামে জাপ বিমানহানার নমুনা দেখিয়াছি। ভস্মীভূত গ্রামগুলিতে উদ্‌ভ্রান্ত গ্রামবাসীগণ তাহাদের সম্পত্তির দগ্ধাবশেষের দিকে তাকাইয়া তাহাদের কাহিনী যখন বিবৃত করিতেছিল, তখন মাথার উপর গাছের ডালে বসা শকুনিগুলি আবহাওয়াকে বীভৎস করিয়া তুলিয়াছিল। কয়েকটি ছোট সহরে ভাঙ্গাচোরা দরজা, জানালা, জনহীন পথ এবং নিস্তব্ধতার মধ্যে শুধু পথচারী কুকুরের চীৎকারে বুঝা যাইতেছিল সহরগুলির সমস্ত লোক সহর ছাড়িয়া অভ্যন্তর প্রদেশে চলিয়া গিয়াছে। বহুবার আক্রান্ত টাঙ্গু নামক একটী গুরুত্বপূর্ণ সহর পরিত্যাগের কয়েকটি মিনিট পরেই অনেক জাপ বোমারু বিমান পুনরায় সহরটী আক্রমণ করে। সন্ধ্যাবেলা আমি পুনরায় উক্ত সহরে ফিরিয়া গিয়া দেখি বিরাট অগ্নিকাণ্ড সুরু হইয়াছে এবং অগ্নিশিখা পাঁচ হাজার ফুট উচ্চে উঠায় চতুর্দ্দিকে কয়েক মাইল দূর হইতে তাহা দৃষ্টিগোচর হইতেছে। জাপানীরা বৃহৎ বিস্ফোরক ও অগ্নি-বোমা বর্ষণ করিয়া সমগ্র বাজার অঞ্চলে আগুন লাগাইয়া দিয়াছে। অর্দ্ধ বর্গমাইল স্থান অগ্নিময় নরককুণ্ডে পরিণত হইয়াছে। সামরিক ও অ-সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ অবশ্য অবস্থা ধীরে ধীরে আয়ত্তে আনিতেছেন। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করিবার সামরিক উদ্দেশ্যেই এই সকল বিমান আক্রমণ চালানো হইয়াছে, সন্দেহ নাই। কিন্তু স্থানীয় জনসাধারণকে ইহার জন্য বিপুল কষ্ট ও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইতেছে।'

এই বর্ণনা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, ব্যাপক বোমারু আক্রমণের ফলে জনসাধারণের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হওয়া কোন অস্বাভাবিক ব্যাপার নহে।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(৬)

রেঙ্গুণ ও পেগু পরিত্যাগ

১লা হইতে ১৪ই মার্চ্চ, '৪২।

জাপানীরা যেন এক প্রবল ধাক্কায় সিটাং নদী অতিক্রম করিয়া ১৮ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। পেগু হইতে ১৫ মাইল দূরবর্ত্তী বাও গ্রামে জাপানীদের সহিত বৃটিশ পক্ষের সংঘর্ষ হয়। ইহা কোন বড় যুদ্ধ নহে, একান্তরূপে খণ্ড যুদ্ধ মাত্র। বৃটিশ পক্ষের প্রহরী সৈন্য-দলের সহিত সংঘর্ষ বাধিয়াছিল। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, প্রধান বৃটিশ বাহিনী সিটাংয়ের পশ্চিম তীর হইতেও সরিয়া গিয়াছে। বোধহয় তাহারা সিটাং নদীর নিম্ন অববাহিকার দিকে ঘাঁটি লইয়াছে। জাপানীরা রেঙ্গুণের ৬০ মাইলের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। পেগু ও রেঙ্গুন উৎকৃষ্ট রেলপথ ও সড়কের দ্বারা সংযুক্ত। চীন-ব্রহ্ম

রাস্তার ইহা একটি উল্লেখযোগ্য ঘাঁটি। চাউলের কেন্দ্র হিসাবে ইহা বিখ্যাত। জাপানীদিগকে সিটাং নদীর পূর্ব্ব তটেই ঠেকাইয়া রাখা যাইবে বলিয়া যখন আশা করার কতকটা কারণ দেখা যাইতেছিল, ঠিক সেই সময় তাহারা ঐ নদী পার হইয়া আসিল। ইহার অর্থ এই যে, রেঙ্গুণের ঘোর বিপদ ঘোরতর হইল। রেঙ্গুণ বন্দরটি এমন স্থানে অবস্থিত যে, পূর্ব্বদিক হইতে স্থলপথে আক্রমণ হইলে ঐ বন্দর রক্ষা করা দুঃসাধ্য। এদিকে বাও হইতে পেগু হইয়া রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত ভাল রাস্তা ও রেলপথ আছে, জাপানীরা তাহার সুবিধা পাইবে। তাহা ছাড়াও বিপদ আছে। রেঙ্গুণ অঞ্চলে খুব ভালো ভালো বিমানশালা রহিয়াছে। এগুলি জাপানীদের হাতে পড়িবে। জাপানীরা এই সমস্ত বিমানশালা হাতে পাইলে পূর্ণ উদ্যমে ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ চালাইতে পারিবে। তদুপরি হয়তো পূর্ব্ব ভারতের নানাস্থানে অনবরত হানাও দিতে পারিবে। জাপানীরা যে সুনিয়মিতভাবে অগ্রসর হইতে এবং শেষ পর্য্যন্ত সিটাং নদী পার হইতে পারিয়াছে, ইহার কারণ এই যে, তাহারা বিমানবলে অধিকতর বলীয়ান ছিল। সেই বিমানবল তাহারা স্থল যুদ্ধের সাহায্যে নিয়োগ করিতে পারিয়াছে।

৬ই মার্চ্চ সংবাদ আসে যে, বৃটিশ বাহিনী মান্দালয় ও প্রোমের পথে সরিয়া গিয়াছে। পেগুতে যদি বড় রকমের সংগ্রামের ইচ্ছা বা সুবিধা থাকিত, তাহা হইলে প্রধান বাহিনী নিশ্চয়ই এত সহজে উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে মান্দালয় ও প্রোমের পথে অপসারিত হইত না। জাপানীরা ভবিষ্যতে এ পথে মান্দালয় ও রেঙ্গুণের যোগাযোগ নষ্ট করিবে, সম্ভবতঃ এজন্যই পূর্ব্বাহ্ণে বৃটিশ সৈন্য সেই পথ আগুলিয়া বসিয়া রহিল। ইতিমধ্যে পেগুর রণক্ষেত্রে কিছু ট্যাঙ্ক আসিয়া হাজির। এই পর্য্যন্ত দক্ষিণ ব্রহ্মে কোন পক্ষেই ট্যাঙ্কের অস্তিত্ব ছিল

না। সুতরাং হঠাৎ কিছু পরিমাণ ট্যাঙ্ক পাইয়া বৃটিশ পক্ষের সৈন্যেরা বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিল। পদাতিক ও গোলন্দাজবাহিনী মিলিয়া পেগুর দিকে অগ্রগামী জাপ সৈন্যদিগকে যথেষ্ট বাধা দিতে লাগিল। কিছু কিছু ক্ষতিও তাহারা সাধন করিল। কিন্তু জাপানীদিগকে প্রতিরোধ করিতে পারিল না। জাপানীরা বাও ও পায়াজি দখল করিয়া ফেলিল। ৮ই তারিখের সংবাদে দেখা যায় যে, পেগুতে কয়েক দিন আগের মত প্রচণ্ড সংগ্রাম চলিতেছে। জাপানীরা এখন গভীর অরণ্যময় প্রদেশ হইতে উন্মুক্ত ধান্যক্ষেত্র পূর্ণ অঞ্চলে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এইস্থানে বৃটিশবাহিনী তাহাদের পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিতেছে। সম্প্রতি আনীত বৃটিশ ট্যাঙ্কসমূহ বহু শত্রুসৈন্য হতাহত করিতেছে। মার্ত্তাবান হইতে যে রাস্তাঘাট পেগুর সহিত মিলিয়াছে, জাপানীদের সমর-সম্ভার প্রধানতঃ সেই রাস্তা দিয়াই আসিতেছে। জাপানীদের যোগাযোগের এই দীর্ঘপথ উন্মুক্ত স্থানে পড়ায় বৃটিশ বিমানসমূহ উহার উপর নির্ম্মমভাবে আক্রমণ চালাইয়াছে। বে-সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, এই সড়কের উপর ৬ মাইল দীর্ঘ জাপ সমর-সম্ভারবাহী যানবাহন শ্রেণীর উপর বিমান হইতে বোমা ও মেসিনগানের গুলীবর্ষণ করা হইতেছে। সমর-সম্ভারবাহী হস্তিযূথ আতঙ্কে ভার ফেলিয়া দিয়া জঙ্গলে পলাইয়া গিয়াছে।

সংখ্যা শক্তি ও রণকৌশলের দিক হইতে জাপানীরা শ্রেষ্ঠ ছিল। তাহারা প্রত্যাশিত উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়া আসে নাই—আসিয়াছে অরণ্যভূমির কণ্টকাকীর্ণ পথ দিয়া। জঙ্গল যুদ্ধের ইহা বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয়। অপ্রত্যাশিত জঙ্গলের মধ্য দিয়া আসায় তাহারা রণকৌশলের বিস্ময় সৃষ্টি করিতে পারিতেছিল। চীনে জাপানীরা যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছিল, ব্রহ্মদেশে তাহাদের আক্রমণ কৌশল

তাহা হইতে একেবারে পৃথক নহে। চীনে যেমন করিয়াছিল ব্রহ্মেও তাহারা সেইরূপ বড় বড় দলে অগ্রসর হওয়ার পরিবর্ত্তে ১০।১২ জন সৈন্য এক এক দলে বিভক্ত হইয়া এবং সাধারণতঃ সাইকেল ও ছোট বেতারযন্ত্র লইয়া অগ্রসর হইয়াছে। সদর ঘাঁটির সহিত সংবাদ আদান প্রদান করিবার জন্যই এই সকল বেতারযন্ত্র সঙ্গে লওয়া হইয়াছে। কামান ও অন্যান্য সমর-সম্ভার শ্যামদেশীয় হাতীর পিঠে চাপাইয়া জঙ্গল পথে আনয়ন করা হইয়াছে। সম্ভব হইলেই তাহারা জঙ্গল যুদ্ধকে 'স্নায়ু যুদ্ধে' পরিণত করিয়াছে। তাহারা বন্দী ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যদিগের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া এবং পরস্পরের সহিত ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষায় উচ্চৈঃস্বরে কথা বলিতে বলিতে অগ্রসর হইয়াছে।

জাপানীরা পেগুর সন্নিকটে আসিয়া পড়ায় এবং রেঙ্গুণ জলে স্থলে ও আকাশ পথে একান্তরূপে বিপন্ন হওয়ায় ইঙ্গ-ভারতীয়বাহিনীকে রেঙ্গুণ হইতে সরাইয়া লওয়া হয়। নয়াদিল্লী হইতে ৯ই মার্চ্চ ঘোষণা করা হয় যে, দুইদিন আগে রেঙ্গুণের কলকারখানা, ডক ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া দিয়া রেঙ্গুণ পরিত্যাগ করা হইয়াছে। কর্ম্মচারীদের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মের গবর্ণর বেতারযোগে এক বিদায় বক্তৃতা দেন। রেঙ্গুণে ধ্বংস কার্য্য সমাপ্ত করিবার আগে পর্য্যন্ত অ-সামরিক কর্ম্মচারী, লোকজন ও ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠানসমূহকে সরাইয়া ফেলা হয়। রেঙ্গুণের প্রথম দিনের বিমান হানায় যে অভূতপূর্ব্ব ক্ষতি হইয়াছিল, বিমান আক্রমণের ইতিহাসে তাহা অভিনব। সরকারী মতে দুইবার প্রচণ্ড বিমানহানায় রেঙ্গুণে ১১০২ জন নিহত ও ১৬৫০ জন আহত হইয়াছিল। কিন্তু বে-সরকারী মতে রেঙ্গুণে হতাহতের সংখ্যা ৫ হাজারের কম নহে। এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত সংবাদ ব্রহ্মদেশ ছাড়াইয়া কলিকাতা এবং ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। লক্ষ লক্ষ লোক পাগলের মত
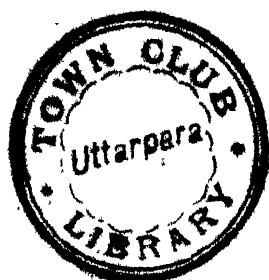
ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া জলপথে ও স্থলপথে (স্থলপথেই বেশীর ভাগ) আসাম, চট্টগ্রাম ও কলিকাতায় আসে। ব্রহ্ম-প্রত্যাগত ও অবর্ণনীয়-রূপে দুর্দ্দশাগ্রস্ত নর-নারী ব্রহ্মদেশ ও রেঙ্গুণ সম্বন্ধে নানা সত্যমিথ্যা আজগুবি গুজব প্রচার করিতে থাকে। সেই হিড়িকে কলিকাতা হইতেও কয়েক লক্ষ লোক গ্রাম্য অঞ্চলে সরিয়া পড়ে।

৯ই মার্চ্চ লণ্ডন হইতে ঘোষণা করা হয় যে, পেগু এখনও যুদ্ধের প্রধান কেন্দ্র। রেঙ্গুণ-মান্দালয় রোড বিচ্ছিন্ন করিয়া দিয়াছে বলিয়া জাপানীরা দাবী করিতেছে—ইহা ছাড়া রেলপথও দুই স্থানে তাহারা বিচ্ছিন্ন করিয়াছে। সম্ভবতঃ রেঙ্গুণের উত্তরে পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়াই তাহারা অগ্রসর হইতে চেষ্টা করিতেছে। এইভাবে পেগু-অঞ্চলের জঙ্গলের মধ্যে তাহারা প্রবেশ করিতে পারিলে রেঙ্গুণ হইতে প্রোম যাইবার অবশিষ্ট রাজপথটিও বিপন্ন হইবে। জাপানীরা ব্রহ্মদেশে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিতেছে বলিয়া জানা যায় নাই। কিন্তু স্থলবাহিনীর দিক হইতে যদি তাহাদের সংখ্যাধিক্য থাকে, তবে যে ভাবে তাহারা চতুর্দ্দিক হইতে ঘেরাও করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতেছে, তাহা ব্যর্থ করা সহজ নহে। সাম্রাজ্যবাহিনী ব্রহ্মদেশে যে প্রতিরোধ করিবার চেষ্টা করিবে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মদেশে পূর্ব্বেও প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং ভবিষ্যতেও তাহা চলিতে থাকিবে। ব্রহ্মদেশে বৃটিশ সাঁজোয়া বাহিনী রহিয়াছে। তথাপি কি কারণে রেঙ্গুণ ত্যাগ করা হইল, সেই সম্পর্কে কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল বলিতেছেন—

পেগুতে বৃটীশ সৈন্যের একাংশ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ায় এবং পেগু নদীর উত্তর তীরে ও রেঙ্গুণ নদীর পশ্চিম তীরে শত্রু সৈন্য অবতরণ করায় রেঙ্গুণ হইতে অপসরণের প্রয়োজন হয়। শত্রুদের এই অবতরণের সময়ে রেঙ্গুণ নদীর মোহনায় ভারতীয় নৌবহরের

জাহাজ 'হিন্দুস্থান' অবতরণকারীদলকে আক্রমণ করে। একখানি ছোট জাহাজ আটক করা হয়, অবশিষ্টগুলি শেষ পর্য্যন্ত সৈন্য-সামন্ত প্রভৃতি নামাইয়া দিতে সমর্থ হয়। ঐগুলির উপর বৃটিশ বিমানসমূহ আক্রমণ চালাইয়াছিল। ধৃত জাহাজখানিতে একজন জাপ অফিসার ও ৫৫জন বিশ্বাসঘাতক বর্ম্মী ছিল। পেগু অঞ্চলে শত্রু সৈন্য পেগুর পার্ব্বত্য জঙ্গলের মধ্য দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। পেগুতে নিযুক্ত বৃটিশ বাহিনীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া শক্তিশালী সাঁজোয়া জঙ্গী-মোটরযানসহ শত্রু পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতে থাকে।

শত্রুসৈন্য অবতরণের ফলে সমস্ত অসামরিক শাসন বন্ধ হইয়া যায়। তখন রেঙ্গুণ ছাড়িয়া চীনাদের সহিত একযোগে মধ্য ব্রহ্মে সংগ্রাম চালাইবার সিদ্ধান্ত করা হয়।

রেঙ্গুণ হইতে ছাড়িয়া আসিবার সময় শত্রুসৈন্য মাগুবীর নিকটে রেঙ্গুণ-প্রোম পথটি বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে, এই স্থানটি রেঙ্গুণের ২৫ মাইল উত্তরে। ট্যাঙ্ক ও পদাতিক বাহিনী লইয়া যুদ্ধ আরম্ভ হয়। প্রথম আক্রমণে শত্রুকে হটান যায় নাই। পরে প্রচণ্ড আক্রমণ করা হয়। প্রচণ্ড সংগ্রামে উভয় পক্ষের গুরুতর ক্ষতি হয় এবং ব্যূহ ভেদ করা হয়। জাপানীরা রাস্তা আটক করিবার কার্য্যে জঙ্গী ও ছোঁমারা বিমানসমূহ ব্যবহার করে। ইহাতে উহারা অনেকটা সাফল্য লাভ করিয়াছে।

বে-সরকারীভাবে খবর পাওয়া গিয়াছে যে, অনুমান একশত জাপ সৈন্য পেগুর উত্তরে রেঙ্গুণ ও মান্দালয়ের মধ্যবর্ত্তী রাজপথ অতিক্রম করিয়া গভীর জঙ্গলের মধ্য দিয়া পশ্চিমে থারাবড্ডীর দিকে যাইতেছে। থারাবড্ডী রেঙ্গুণ-প্রোম রাজপথের উপর এবং রেঙ্গুণের উত্তরে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

সম্ভবতঃ জাপানীদের উদ্দেশ্য হইতেছে রেঙ্গুণ হইতে উত্তর ব্রহ্মে যাইবার পথে বাধা সৃষ্টি করা। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে, উক্ত জাপ সৈন্যদল থারাবড্ডীতে পৌছিতে পারিলে তাহাদের দ্বারা ঐ অঞ্চলে জনসাধারণের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করা হইবে। এইভাবে শাসন কার্য্যে বিঘ্ন ঘটানোই জাপানীদের মতলব। জাপ সৈন্যরা দিনের বেলায় জঙ্গলের মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং অন্ধকার হইলেই বাহির হয়।

পরবর্ত্তী এক সংবাদে জানা যায় যে, জাপানীরা ইরাবতী নদীর তটবর্ত্তী থারবড্ডি সহরও দখল করিয়া লইয়াছে।

মার্চ্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যেই রেঙ্গুণ ও পেগু ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইল। পেগুতে কিছু যুদ্ধ হইয়াছিল, কিন্তু সেই যুদ্ধ সম্ভবতঃ পশ্চাৎরক্ষী সৈন্যদের দ্বারা হইয়াছে—প্রধান বাহিনী নিরাপদে যাহাতে পিছু হঠিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই পেগুর উপকণ্ঠে বাধা দেওয়া হইয়াছিল। জাপানীরা চাহিয়াছিল যাহাতে রেঙ্গুণ হইতে জেনারেল আলেকজেণ্ডারের সৈন্যেরা পরিত্রাণ পাইতে না পারে। এজন্যই রেঙ্গুণ হইতে বাহির হইবার প্রধান সড়ক, যাহা উত্তরাভিমুখে ৪৪০ মাইল দূরবর্ত্তী মান্দালয়ের দিকে চলিয়া গিয়াছে, সেই পথটিও তাহারা পেগু আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। কিন্তু বৃটিশ পক্ষে কিছু ট্যাঙ্ক আমদানি হওয়ায় জাপানীদের প্রতিরোধ-ব্যূহ ভেদ করিয়া মূল বৃটিশবাহিনী রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া উত্তর দিকে চলিয়া যাইতে সমর্থ হয়। প্রকৃত পক্ষে দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর—এই তিন দিক বেষ্টিত হওয়ায় জেনারেল আলেকজেণ্ডারের সৈন্যেরা বিনা যুদ্ধে রেঙ্গুণ ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইতিপূর্ব্বে ব্রহ্মের গবর্ণর রেঙ্গুণ সহরে অবরোধ যুদ্ধ চালানো হইবে এবং তাহা তোব্রুকের মতই দীর্ঘকাল ধরিয়া চলিবে বলিয়া যে বীরত্বব্যঞ্জক ঘোষণা জারি করিয়া-

ছিলেন, তাহা শোচনীয় ব্যর্থতায় পরিণত হয়। কারণ, অবরোধ-যুদ্ধ দূরের কথা খণ্ডযুদ্ধও রেঙ্গুণে অনুষ্ঠিত হয় নাই। তাড়াতাড়ি লোকাপসরণ ও ধ্বংস কার্য্য সাধন করিয়া রেঙ্গুণ হইতে সরিয়া পড়া হয়। রেঙ্গুণের ৬ লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত মাত্র সামান্য কয়েক হাজারে দাঁড়াইয়াছিল। ইহার সঙ্গে পোড়ামাটীর নীতি অনুসৃত হওয়ায় রেঙ্গুণ শ্মশানভূমিতে পরিণত হয়। একজন প্রত্যক্ষদর্শী বলিতেছেন যে, পোড়ামাটীর নীতি অনুসরণের জন্য রেঙ্গুণে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। ৪০ মাইল দূর হইতে অগ্নিশিখা দেখা গিয়াছিল। সমগ্র সহরে প্রচণ্ডভাবে আগুন জ্বলিয়া উঠে। দৃশ্যটা যেন ডানকার্কেরই মত। জলপথে এবং স্থলপথে বিপন্ন নগরীকে রক্ষা করা যাইবে না বলিয়া সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ যখনই বুঝিতে পারিলেন, তখনই ব্যাপকভাবে পোড়ামাটী নীতি অনুসৃত হয়। ডক, গুদাম, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি অসামরিক জিনিষগুলি ধ্বংস করিয়া দেওয়া হয়। কর্ণপটাহভেদী বিস্ফোরণের পরে আগুন জ্বলিয়া উঠে। অসামরিক দ্রব্যগুলি বিরাট ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। সিরিয়ামের বিরাট তৈল শোধনাগার ধ্বংস কার্য্যে এমন একজন লোককে নিয়োগ করা হইয়াছিল যিনি গত বৎসর রাশিয়ানদের ধ্বংস কার্য্য দেখিয়া আসিয়াছিলেন। ৩০০ মাইল উত্তরে তৈলকূপ হইতে যে বিরাট নলের দ্বারা সিরিয়ামে তৈল আনা হইত, তাহাও কাটিয়া দেওয়া হইয়াছে। যুদ্ধ ও আত্মরক্ষার কৌশল অপেক্ষা ধ্বংস কার্য্যের এই ধরণের লোমহর্ষক বর্ণনা রেঙ্গুণ যুদ্ধ সম্পর্কে পাওয়া গিয়াছে।

রেঙ্গুণের পতনের দ্বারা ব্রহ্ম যুদ্ধের প্রাণকেন্দ্র নষ্ট হইয়া গেল এবং চীন-ব্রহ্মের সংযোগও বিনষ্ট হইল। শত্রু ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে আসিয়া দাঁড়াইল।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(১)

দক্ষিণ ব্রহ্মে দুর্ভাগ্যের কারণ

২০শে মার্চ্চ, '৪২।

রেঙ্গুণ ও পেগু সহ গোটা দক্ষিণ ব্রহ্ম অতি দ্রুত জাপানীদের দখলে যাওয়ায় স্বভাবতঃই ব্রহ্ম রক্ষার ব্যবস্থা সম্পর্কে জনসাধারণের মধ্যে নানা সংশয় দেখা দেয়। মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ বা দক্ষিণ ব্রহ্ম কোথাও যেন মিত্রপক্ষ জাপানের সম্মুখে দাঁড়াতেই পারিতেছেন না। ক্রমাগত পশ্চাদপসরণের একঘেয়ে কাহিনী শুনা যাইতেছে। রেঙ্গুণের পতনের পর ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল নয়াদিল্লী হইতে দক্ষিণ ব্রহ্মের দুর্ভাগ্যের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করিয়া বলেন—জাপানীদের দক্ষিণমুখী অভিযানের গতি রোধ করিবার জন্য যথাসময়ে আমরা নূতন স্থল সৈন্য ও বিমান সৈন্য সেই অঞ্চলে

আনিতে পারিব কিনা, ইহাই ছিল আমাদের প্রথম চিন্তা। কিন্তু সময়ের সহিত প্রতিযোগীতায় আমরা পিছনে পড়িয়া যাই। অপ্রত্যাশিত দ্রুততার সহিত জাপানীরা অগ্রসর হয় এবং আমাদের নূতন রণ-সম্ভার পৌঁছিতে অনেক বিলম্ব হইয়া যায়। মালয়, সিঙ্গাপুর বা ব্রহ্মদেশ—গোটা সুদূর প্রাচ্যের যুদ্ধের জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম না। এই স্থানে প্রস্তুত থাকিতে হইলে বিপন্ন মধ্যপ্রাচ্য ও বৃটেন হইতে সৈন্য আনিতে কিম্বা রাশিয়াকে সাহায্য প্রেরণ বন্ধ করিতে হইত। তবে, সুদূর প্রাচ্যে আমাদের যে সৈন্য ছিল, তাহাদের প্রস্তুতি, শিক্ষা ও পরিচালনা সংক্রান্ত ত্রুটিবিচ্যুতি চাপা দিবার জন্যই আমি ইহা বলিতেছি না। কিন্তু ইহাতেও সন্দেহ নাই যে, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ হইতে আমরা শত্রুর উপর জলে, স্থলে ও আকাশে কয়েকবার বড় রকমের আঘাত হানিয়া তাহাদের গুরুতর ক্ষতি সাধন করিয়াছি। অবশ্য এই ক্ষেত্রেও আমাদের ক্ষতির পরিমাণই অপেক্ষাকৃত অধিক ছিল। মালয়ে ভারতীয় সৈন্যদিগকে খুব অসুবিধার মধ্য দিয়া যুদ্ধ চালাইতে হইয়াছে। এই স্থানে শত্রুপক্ষ আকাশে ও সাগরে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল। মালয় রক্ষাকল্পে যে সমস্ত সৈন্য নিয়োগ করিতে হইয়াছিল, তাহারা সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত ছিল না, অথবা ঘন জঙ্গলে যুদ্ধ চালাইবার উপযোগী খুব সামান্য শিক্ষাই লাভ করিয়াছিল। রেঙ্গুণ ও দক্ষিণ ব্রহ্মের এক বৃহৎ অংশের হস্তচ্যুতি কোন কোন বিষয়ে সিঙ্গাপুরের চেয়েও গুরুতর ক্ষতিজনক, সন্দেহ নাই। ব্রহ্ম সম্পর্কেও মালয়ের কথাই খাটে। আমরা যথোচিত প্রস্তুত ছিলাম না। সামরিক সাহায্য দেরীতে আসিয়া পৌঁছিয়াছে এবং নূতন সৈন্যেরাও যথেষ্ট ট্রেনিং লাভ করে নাই।

জেনারেল ওয়াভেলের এই বক্তব্যের সঙ্গে আর একটি বিবরণও

উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই বিবরণীতে রেঙ্গুণ ত্যাগের কারণ অতি সুন্দররূপে আলোচিত হইয়াছে। মান্দালয় হইতে জনৈক বিশেষ সংবাদদাতা 'ষ্টেট্‌স্‌ম্যান' পত্রিকায় লিখিয়াছেন—

"ইচ্ছা করিয়া রাজধানী পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত হয় নাই। বৃটিশ সেনানায়কদিগকে বাধ্য হইয়াই এই সিদ্ধান্ত করিতে হইয়াছিল। তাঁহাদের সমক্ষে দুইটি সমস্যা উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহারা যদি সেনাবল অটুট রাখিয়া রেঙ্গুণ ছাড়িয়া চলিয়া যান, তাহা হইলে উত্তর ব্রহ্মের তৈল খনিগুলি রক্ষা করিতে পারেন। পক্ষান্তরে যদি তাঁহারা রেঙ্গুণে থাকেন, তবে পরাজয় অবধারিত। কেন না, সংখ্যা বলে দ্বিগুণ কি তিনগুণ শত্রুর হস্ত হইতে রেঙ্গুণ রক্ষা করা অসম্ভব। এমন অবস্থায় জেনারেল আলেকজেণ্ডার রেঙ্গুণ পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত করেন। রেঙ্গুণ পতনের কাহিনীর আরম্ভ ৫ই মার্চ্চ হইতে। ঐ তারিখ রেঙ্গুণ হইতে ৫০ মাইল দূরে পেগুর পূর্ব্ব ও উত্তর পূর্ব্ব দিক হইতে জাপানীরা ইংরাজ সৈন্যদের উপর বিষম চাপ দিতে থাকে। জাপানীদের তুলনায় ইংরাজ পক্ষের সৈন্যেরা অনেক দুর্ব্বল ছিল। ঐ অঞ্চলে ট্যাঙ্ক ব্যবহার করা অসুবিধাজনক প্রতিপন্ন হয়। তথাপি ৬ই তারিখে আমরা দুই একটি ছোটখাটো আক্রমণ করি এবং কয়েকটি ট্যাঙ্কমারা কামান দখল করি। শত্রুরা সিটাং নদী পার করিয়া ৩টি হাল্কা ট্যাঙ্ক আনিয়াছিল, আমরা সেই ট্যাঙ্ক তিনটিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দেই। এদিকে পশ্চিম দিক হইতে শত্রুরা আসিয়া রেঙ্গুণের রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। ইংরাজ সৈন্যেরা শত্রুব্যূহ ভেদ করার জন্য একটা চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হয়। ঠিক এই সময় আর একটা নূতন ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায়। সংবাদ পাওয়া যায় যে, বহু সংখ্যক শত্রু রেঙ্গুণ নদীর পশ্চিমে অবতরণ করিয়াছে। তাহাদের সংখ্যা ৬।৭ শত হইবে।

তাহারা যে স্থানে অবতরণ করিয়াছিল, সে স্থানে তাহাদের অনুরক্ত লোক পাইবার সম্ভাবনা ছিল। দেখা গেল যে, শত্রুরা ইচ্ছা করিলেই রেঙ্গুণের পশ্চিম দিক দিয়া প্রবাহিত খালের পথটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে পারে। এমন কি তাহারা খাস রেঙ্গুণ বন্দরে যাইয়াও হাজির হইতে পারে। আর একটা কথাও বিবেচনা করিতে হইল। রেঙ্গুণ নদীর পরপারে সিরিয়ামে যে সমস্ত তৈলাধার আছে, তাহা রক্ষা করার কোন ব্যবস্থা নাই। তথায় যে অল্প সংখ্যক রক্ষী থাকে, শত্রুরা তাহাদিগকে সহজেই পরাভূত করিয়া ফেলিতে পারে। তৈলাগারগুলি বিনষ্ট করার জন্য যে ব্যবস্থা করা ছিল, তাহাও অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতে পারে। তাহা হইলে তৈলাগারগুলি আর দেওয়া যাইবে না। এদিকে আবার খবর পাওয়া গেল যে, এক জাঙ্গাল নূতন সৈন্য ট্যাঙ্কসহ পেগুর দিক হইতে প্রোমের পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছে। অর্থাৎ রেঙ্গুণ হইতে আমাদের বাহির হইবার একমাত্র পথটিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। ৬ই মার্চ্চ তারিখে উক্ত জাপানী জাঙ্গাল আসিয়া প্রোম রোডটি বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। তখন ইংরাজরা ঠিক করে যে, রেঙ্গুণের সমস্ত বিনষ্ট করিয়া দিয়া তৈলাঞ্চলগুলি রক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত। শনিবার বৈকাল ২টার সময় হইতে রেঙ্গুণের ধ্বংস কার্য্য আরম্ভ হয়। ঐ দিন প্রাতে ইংরাজ সৈন্যেরা রেঙ্গুণ ত্যাগ করিয়া প্রোম রোড ধরিয়া বাহির হইয়া যাইতে থাকে। কিছু দূর যাইয়াই রাস্তাটি বিচ্ছিন্ন দেখিতে পাওয়া যায়। রাস্তা করিয়া লওয়ার প্রথম কয়েক দফা চেষ্টা ব্যর্থ হয় এবং ৭ই মার্চ্চ রাত্রে ইংরাজ সৈন্যদিগকে রেঙ্গুণ হইতে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী কৈটান গ্রামের নিকটে অবস্থান করিতে হয়। কৈটানের কিছু পূর্ব্বে হেলগু নামক স্থানে আমাদের যে সমস্ত সৈন্য প্রহরায়

রত ছিল, তাহাদিগকে কৈচানে ডাকিয়া পাঠানো হয়। এদিকে পেগুতে অবরুদ্ধ সৈন্যদলকে যে কোন প্রকারে পথ বাহির করিয়া আসিতে আদেশ দেওয়া হয়। ৮ই মার্চ্চ তারিখে ইংরাজ সৈন্যেরা রাস্তা করিবার জন্য দৃঢ়তার সহিত শত্রুদিগকে আক্রমণ করে। ৯।১০ মাইল দূরে খুয়ারী নামক স্থানে রাস্তাটি একেবারে আটক দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজ পক্ষের আক্রমণ সফল হয় এবং একটা রাস্তা করিয়া লওয়া হয়। কিন্তু পরে শত্রুসৈন্য কৈচান এবং খুয়ারীর মধ্যে রাস্তার দুই দিকে দাঁড়াইয়া ইংরাজ সৈন্য এবং তাহাদের গাড়ীগুলির উপর গুলী চালাইতে থাকে। কিছুকাল পরে পেগু হইতে ট্যাঙ্ক আসিয়া পড়ে এবং ১১টার সময় রাস্তা পরিষ্কার হইয়া যায়। তারপর সুনিয়মিতভাবে সৈন্যেরা চলিয়া যাইতে আরম্ভ করে। পথিমধ্যে শত্রুরা আমাদের সৈন্যদের উপর বোমা বর্ষণের প্রয়াস পাইয়াছিল। কিন্তু আমাদের পক্ষের বিমানগুলি আমাদিগকে রক্ষা করিয়া চলায় ক্ষতি খুব বেশী হয় নাই। ইত্যবসরে পেগুতে অবরুদ্ধ সৈন্যগণ অদ্ভুত পরাক্রমে শত্রুদের প্রভূত ক্ষতি সাধন করিয়া বাহির হইয়া আসিতে সমর্থ হয় এবং সন্ধ্যার মধ্যেই কৈচানের নিকট মূল সৈন্যদলের সহিত মিলিত হয়। ইহার ফলে ৯ই মার্চ্চ প্রাতঃকালের মধ্যেই রেঙ্গুণে আমাদের যে সমস্ত সৈন্য ছিল, তাহারা সকলে সরিয়া পড়িতে সমর্থ হয় এবং রেঙ্গুণ হইতে প্রোম রোডের ধারে ৫০ মাইল দূরে তাইচি গ্রামে সমাবিষ্ট হইতে সমর্থ হয়।

"রেঙ্গুণের যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় হইয়াছে পেগু হইতে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত শত্রুদের আক্রমণের ক্ষিপ্রতা। টেনাসেরিম বিভাগের পার্ব্বত্য অঞ্চলে শত্রুরা অপূর্ব্ব রণকৌশল দেখাইয়াছিল, ইহা সকলেই স্বীকার করে। কিন্তু সকলের মনেই একটা আশা ছিল যে,

সিটাংয়ের পশ্চিমে ধান্যক্ষেত্রগুলির উপর শত্রুদের গতিরোধ করা যাইবে, এই অঞ্চলে আমাদের অনেক ট্যাঙ্ক ছিল। একটা অসুবিধা ছিল—জঙ্গলের দরুণ বড় বড় কামান ব্যবহার করা সম্ভবপর হয় নাই। ব্রহ্মদেশে ভালো রাস্তা খুব কম আছে। টেনাসেরিম অঞ্চলে ইংরাজদের পক্ষে যোগাযোগ রক্ষা করা কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িয়াছিল। ব্রহ্মদেশে টেলিফোন এবং বেতার ব্যবস্থা তেমন উন্নত নহে। বড় রকমের যুদ্ধে উহা কাজে লাগানো যায় না। ফলে, সহরে জঙ্গী কার্য্যালয় হইতে সুদূরে অবস্থিত সেনাদলের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। রেঙ্গুনের পতনের ইহাই কতকগুলি আপাত দৃশ্যমান কারণ। ইহা ছাড়া ব্রহ্মদেশের লোকদিগকে যুদ্ধ সম্পর্কে কোন শিক্ষা দেওয়া হয় নাই। গত ২৩শে ডিসেম্বর যখন প্রথম বোমা বর্ষিত হয়, তখন হইতেই সমগ্র ব্রহ্মে সাংঘাতিক আতঙ্কের সঞ্চার হয় এবং দলে দলে নর-নারী পলায়ন করিতে থাকে।"

পেগু ও রেঙ্গুণের ব্যর্থতার উপরে যে বর্ণনা দেওয়া হইল, তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, দক্ষিণ ব্রহ্ম রক্ষায় তেমন কোন বিস্তৃত ও উৎকৃষ্ট আয়োজন ছিল না। উপযুক্ত সমর-সম্ভার ও উপযুক্ত সৈন্য সংখ্যা ছিল না। যথাসময়ে সৈন্য ও সমরোপকরণ পৌছিতে পারে নাই। সৈন্যদের ট্রেণিং ভালো ছিল না এবং জঙ্গল যুদ্ধের আদৌ কোন নৈপুণ্য তাহাদের ছিল না। একাংশ রক্ষা করিতে গিয়া আরেক অংশ তাহারা হারাইয়াছে এবং এক পথে পাহারা দিতে গিয়া অন্য পথে শত্রুরা আসিয়াছে। উৎকৃষ্ট কোন রণপরিকল্পনা ও উপযুক্ত শক্তি সমাবেশের অভাবই এই ছত্রভঙ্গের মূল কারণ। টেনাসেরিমের পার্ব্বত্য

অঞ্চলে জাপানীদের জঙ্গল যুদ্ধের নৈপুণ্য ও সিটাং পার হইয়া অতি দ্রুত-গতিতে রেঙ্গুণে উপস্থিতি — এই দুই প্রশ্নও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া আরও দুইটি বিশেষ কারণও আছে, রণনীতির দিক হইতে যাহা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমতঃ মিত্রপক্ষকে জাপানীদের বিরুদ্ধে বরাবর উত্তর দক্ষিণভাবে লাইন বাঁধিয়া দাঁড়াইতে হইয়াছিল এবং এই সৈন্যদের নিকট রসদ ও আহার পৌঁছাইবার জন্য পশ্চাতে যে রেল লাইন বা রাস্তা ছিল সেগুলি সমস্তই সৈন্য-লাইন বা মহড়ার সমান্তরালে অবস্থিত। বিপক্ষের তুলনায় হাতে প্রচুর শক্তি না থাকিলে এইভাবে দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করাতে সমূহ বিপদ আছে। কেন না, শত্রুপক্ষ যদি কোনমতে এই সমান্তরালে অবস্থিত যাতায়াত ব্যবস্থাকে কোন এক স্থলে বিদ্ধ করিতে পারে, তবে হয় বাম না হয় দক্ষিণ অংশ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে। অর্থাৎ সে অংশে আহার ও রসদ পাঠাইবার ব্যবস্থা ভাঙ্গিয়া পড়িবে। ব্রহ্ম যুদ্ধে পেগু দখলের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা ঘটিয়াছিল। পেগু দখল হওয়াতে এই স্থান হইতে দক্ষিণে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত যে সৈন্য ছিল তাহারা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে। ব্রহ্ম যুদ্ধের দ্বিতীয় অসুবিধা এই যে, রণাঙ্গনের গভীরতা বেশী ছিল না। জার্ম্মাণ ও জাপানী রণ-নীতিতে দেখা গিয়াছে, তাহারা বিপক্ষের দুর্ব্বল স্থান দিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া তাহাকে বিচ্ছিন্ন ও বিমূঢ় করিতে চায়। এই অবস্থায় সম্মুখ লাইনের পশ্চাতে যদি প্রশস্ত স্থান থাকে, তবে ইচ্ছামত সৈন্যদলকে আগাইয়া বা পিছাইয়া শত্রুর বিচ্ছিন্ন করিবার মতলব ব্যর্থ করা সম্ভব। কিন্তু ব্রহ্ম রণাঙ্গনে ইহার অভাব ঘটিয়াছিল। রেঙ্গুণ-প্রোম রাস্তা হইতে পূর্ব্ব সীমান্ত মাত্র দেড়শত মাইল। মাইল হিসাবে দেড়শত নিতান্ত কম নহে। কিন্তু তৎসত্বেও ব্রহ্মের বিচিত্র ভৌগোলিক সংস্থান আত্মরক্ষার রণনীতিতে প্রচুর বাধা জন্মাইয়াছিল।

বিলিন, সিটাং, সালুইন, ইরাবতী ইত্যাদি নদীগুলি সব উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি, রেলপথগুলি উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি এবং রাস্তাগুলিও তাহাই। ফলে, সৈন্য লাইনের সঙ্গে রসদ ও যন্ত্রাদি সরবরাহের ব্যবস্থাও সমান্তরাল রেখায় পড়িয়া যায়। সুতরাং কোন এক অংশ বিচ্ছিন্ন হইলে রসদ ও সমর-সম্ভার প্রেরণের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া যাইবে। যদি রণাঙ্গনের গভীরতা বা depth থাকিত, সহজ কথায় যদি বেশী পরিমাণ চওড়া জায়গা থাকিত, তবে, ইচ্ছামত পিছনে বা পার্শ্বে সরিয়া যাওয়ার সুবিধা থাকে এবং তাহা দ্বারা শত্রুর কোন এক অংশের আক্রমণ ব্যর্থ করিয়া দেওয়া যায়। কিন্তু রেলপথ, নদী ও রাস্তা ইহার অধিকাংশই লম্বালম্বি থাকায় চওড়া ভূমির মহড়ার সুযোগ পাওয়া যায় নাই। ইহার সঙ্গে অরণ্য এবং উপযুক্ত সংখ্যক উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাটের অভাবের কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে — যাহা শত্রুর পক্ষে বিঘ্নজনক ছিল, তাহাই শেষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষারও প্রকাণ্ড বাধারূপে দেখা দিল।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(৮)

দক্ষিণ ব্রহ্ম যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

<u>২২শে মার্চ্চ, '৪২।</u>

পূর্ব্ববর্ত্তী প্রবন্ধগুলিতে রেঙ্গুণ ও পেগু বৃটিশ বাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যাগের ঘটনাবলী এবং তৎসংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনা দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোনও স্থানের যুদ্ধ উত্তমরূপে বুঝিতে হইলে কেবল এক পক্ষের সৈন্য সংখ্যার দুর্ব্বলতা, সমর-সম্ভারের অল্পতা বা অপর পক্ষের শ্রেষ্ঠতা ইত্যাদি জানিলেই চলিবে না। পরস্পরের রণনৈতিক চাল এবং রণকৌশলের বৈশিষ্ট্যও জানা দরকার। এই রণনৈতিক চাল ও রণকৌশল রণভূমির ভৌগোলিক সংস্থানের দ্বারা বহুল পরিমাণে প্রভাবান্বিত হইয়া থাকে। কিন্তু পাহাড়, জঙ্গল, নদী ইত্যাদির সংস্থান অনুসারে রণনীতি ও রণকৌশলের সামঞ্জস্য বিধান করিতে হয়।

ভৌগোলিক অবস্থার কথা পূর্ব্বে একাধিকবার বলা হইয়াছে। এখানে বিশেষভাবে আর একটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যাইতে পারে। দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে সমুদ্রতীর একটানা নহে। ভাঙ্গা চিরুণীর দাঁতের মত যেন স্থানে স্থানে হঠাৎ দেশগুলি সরু হইয়া সাগরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। দাক্ষিণাত্য, দক্ষিণ ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, ইন্দোচীন প্রভৃতিকে এই দাঁতের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। প্রধান ভূমিখণ্ড হইতে এই বৰ্দ্ধিত অংশগুলিকে দখল করিবার বেলায় জাপানীরা এক বিশেষ কৌশল গ্রহণ করিয়াছে। মালয় যুদ্ধের সময় আমরা দেখিয়াছিলাম, জাপানীরা প্রথমেই ইহার উত্তরাংশে টেনাসেরিম অঞ্চলে আক্রমণ করিয়া সমগ্র মালয়কে বিচ্ছিন্ন করিয়া ফেলে। এইরূপে বিচ্ছিন্ন করিবার পর তাহারা জলে স্থলে নানাভাবে আক্রমণ করিয়া সে যুদ্ধের অবসান ঘটায়। বিস্তীর্ণ প্রান্তরে দাঁড়াইয়া যখন দুইটি শক্তি মুখোমুখী হয়, তখন সাধারণতঃ পরস্পরের লক্ষ্য থাকে, কিভাবে অপরের গোটা সৈন্যদলকে বা তাহার অংশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পিষিয়া মারা যায়। এই একই নীতি অনুসরণ করিয়া মালয় উপদ্বীপের সঙ্কীর্ণ যোজকে আঘাতের দ্বারা জাপানীরা মিত্রপক্ষের শক্তিকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইয়াছিল। জাপানীরা দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধে অনুরূপ কৌশল গ্রহণ করিয়াছে। ইরাবতীর অববাহিকা পেগুর নিকটে শেষ হইলে ব্রহ্মদেশের সমুদ্রতীর একটানা থাকিত। কিন্তু তাহার পরিবর্ত্তে এই অববাহিকা যেন গলা বাড়াইয়া দুই শত মাইল সমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। জাপানীরা যখন সিটাং নদী অতিক্রম করিয়া পেগুর নিকটবর্ত্তী হইল, তখন মিত্রপক্ষ ভাবিয়াছিলেন শত্রু সৈন্য পেগু-রেঙ্গুণ রাস্তা ও সমতলভূমি ধরিয়া দক্ষিণে রেঙ্গুণের দিকে অগ্রসর হইবে। কিন্তু তাহা ঘটিল না। জাপানীরা এই বৰ্দ্ধিত ভূমিখণ্ডকে প্রথমে

বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য সোজা পশ্চিম দিকে রেঙ্গুণ-প্রোম রাস্তার দিকে ধাবিত হইল। তাহারা পশ্চিম মালয়ে যেভাবে সৈন্যের অগ্রগতি দ্রুত করিবার জন্য জাহাজ ও বজরা যোগে মিত্রপক্ষের পশ্চাতে ছোট ছোট সৈন্যদলকে অবতরণ করাইয়া দিয়াছিল, এখানেও সেইভাবে যখন তাহাদের প্রধান সৈন্যদল প্রোমের রাস্তার দিকে অগ্রসর হইতেছিল, ঠিক সেই সময়ে একদল জাপানী সৈন্য রেঙ্গুণের দক্ষিণে জাহাজযোগে অবতরণ করে। মিত্রপক্ষ সম্মুখ ও পশ্চাৎ হইতে একযোগে আক্রান্ত হইবার আশঙ্কায় ত্রস্ত হইয়া রেঙ্গুণ ছাড়িয়া যাওয়াই স্থির করিলেন। যে সৈন্যদল পেগুর সম্মুখে যুদ্ধ করিতেছিল তাহারাও শত্রুর দ্বারা পেগুর পশ্চিম ও উত্তর হইতে আক্রান্ত হইয়া বেষ্টিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। এই দলকে যে কোন ভাবে বেষ্টনী ভাঙ্গিয়া প্রধান দলের সহিত যোগ দিবার জন্য আদেশ দেওয়া হইল। রেঙ্গুণের কল-কারখানা ও তৈলাধারগুলি ধ্বংস করিয়া মিত্রপক্ষের প্রধান দলটি উত্তর ব্রহ্মে সরিয়া যাইবার আশায় প্রোমের রাস্তায় অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু ২৫ মাইল অগ্রসর না হইতেই তাহারা দেখে জাপানীরা ইতিমধ্যে প্রোমের রাস্তা অতিক্রম করিয়া আরও পশ্চিমে চলিয়া গিয়াছে। শত্রুর এই লাইনকে ভাঙ্গিয়া অগ্রসর হইবার প্রথম চেষ্টা ব্যর্থ হয়। কিন্তু ইতিমধ্যে পেগুর সৈন্য বাহিনী ও ট্যাঙ্ক বাহিনী এই দলের সহিত যোগ দিতে সক্ষম হওয়ায় দ্বিতীয় আক্রমণ ব্যাপকভাবে করা সম্ভব হইয়াছিল। এই আক্রমণের মুখে জাপানীরা দাঁড়াইতে সক্ষম না হইয়া পথ ছাড়িয়া দেয় এবং মিত্রপক্ষ নির্বিবাদে প্রোমের দিকে পশ্চাদপসরণ করিয়া আসে। এখানেই দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়। জাপানীরা মালয়ের মত এখানেও বর্দ্ধিত ভূমিখণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করিয়া উপদ্বীপ দখল করিতে চাহিয়াছিল এবং এই উপদ্বীপে অবস্থিত

মিত্রপক্ষের সৈন্যবাহিনীকে সিঙ্গাপুরের মত ঘিরিয়া মারিতে চাহিয়াছিল। মিত্রপক্ষের সাহসিকতায় ও তৎপরতায় দ্বিতীয় উদ্দেশ্য সফল না হইলেও এই কৌশলের ফলে ইরাবতীর অববাহিকা অতি সহজে শত্রুর হস্তগত হইয়াছে।

দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধে দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিবার এই যে, জাপানীরা সমতল ভূমির যুদ্ধ অপেক্ষা জঙ্গল-যুদ্ধ বাছিয়া লইয়াছে। জেনারেল ওয়াভেল তাঁহার বিবৃতিতে বলিয়াছেন, মিত্রবাহিনী জঙ্গল-যুদ্ধে অভ্যস্ত না থাকায় মালয়ে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। জঙ্গল যুদ্ধের প্রধান অসুবিধা এই যে, সৈন্য দলগুলির মধ্যে পরস্পরের যোগাযোগ রাখা কষ্টকর হইয়া পড়ে। বিভিন্ন যুদ্ধগুলি দেখিয়া মনে হয় মিত্রবাহিনী এখনও মামুলী ধরণে বিশাল সৈন্যসংখ্যা লইয়া সমতালে চলিতে চাহে। কিন্তু কোন বিশাল বাহিনীর পক্ষে এইরূপ শৃঙ্খলা ও যোগাযোগ রক্ষা করিয়া বনের মধ্যে চলাফেরা করা এক দুরূহ সমস্যা। বনের মধ্যে যুদ্ধরত অবস্থায় যেমন একটি দলের পক্ষে পার্শ্ববর্ত্তী দল কতখানি হটিল বা অগ্রসর হইল তাহা অনুমান করা কষ্ট, তেমনি রাস্তাঘাটের অভাবে আবশ্যক মত হঠাৎ কোন এক স্থানে বিশাল সৈন্যদল সমাবেশ করিয়া শত্রুব্যূহ ভাঙ্গিবার চেষ্টা করাও একান্ত শক্ত। অপর পক্ষে জাপানীরা জার্ম্মাণ রণনীতির অনুসরণ করিয়া ছোট ছোট দলে পিপীলিকার মত বনের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। ইহাদের যেমন পরস্পরের যোগাযোগ রাখিবার দায়িত্ব দেওয়া হয় না, তেমনি ভারী অস্ত্রশস্ত্র দিয়া ইহাদের গতিও মন্থর করার চেষ্টা হয় না। ইহারা খুসীমত কোথাও উলঙ্গ হইয়া নদী পার হইতেও যেমন দ্বিধা করে না, তেমনি বনের মধ্যে হাতীর পিঠে চড়িয়া দুর্গম অরণ্যে পথ করিয়া লইতেও দেরী করে না। এই 'বেতাল যুদ্ধে' মিত্রপক্ষ অভ্যস্ত

নহে। জাপানীরা হয়তো এই সুযোগ গ্রহণের আশায়ই সমতল ভূমি ছাড়িয়া পেগুর পশ্চিমে বনাকীর্ণ স্থান বাছিয়া লইয়াছিল। ইরাবতী অববাহিকার সমতল ভূমিতে পেগু-ইয়োমার জঙ্গলময় উচ্চভূমি দক্ষিণে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। এই অঞ্চলের পূর্ব্বে মার্ত্তাবান উপসাগর ধরিয়া বরাবর পেগু হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত একখণ্ড সমতল ভূমি চলিয়া গিয়াছে। আবার ইহার পশ্চিমে বিরাট সমতল ভূমি ইরাবতী নদী বরাবর সাগর পর্য্যন্ত অবস্থিত। এই অঞ্চলে দাঁড়াইলে বাঙ্গলার কৃষিক্ষেত্রের দৃশ্যই মিলিবে। মিত্রপক্ষ ভাবিয়াছিলেন শক্ররা পেগু-রেঙ্গুণ সমতল ভূমি ধরিয়া দক্ষিণে নামিবে এবং সেই আশায় এখানে ট্যাঙ্কবাহিনীও সমাবেশ করিয়াছিলেন। কিন্তু জাপানীরা তাঁহাদের রণনীতির সুযোগ ও সুবিধা বুঝিয়া জঙ্গলাকীর্ণ স্থানে যুদ্ধের মীমাংসা করিতে চাহিয়াছে। উত্তর ব্রহ্ম অধিকতর জঙ্গলাকীর্ণ; সেইজন্য মিত্রপক্ষকে শক্রর এই কৌশলের কথা মনে রাখিয়া ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে।

কোনও স্থান আক্রমণ করিবার আগে বিপক্ষের সৈন্য সমাবেশ, উহার যুদ্ধ চালনার শক্তি ইত্যাদির যেমন খবর রাখা দরকার, তেমনই অনুমান করিতে হইবে যে, বিপক্ষীয় দল কি ধরণের রণনীতি ও রণকৌশলের জন্য প্রস্তুত। যদি সাধারণ পুঁথিগত ও সাধারণ বুদ্ধিগত রণনীতি অনুসৃত হয়, তবে, স্বভাবতঃই কোন অভিনবত্ব বা অপ্রত্যাশিত কোন বিপর্য্যয়ের সৃষ্টি করা যায় না। যেখানে সমতল ভূমির সুযোগ রহিয়াছে, সেখানে আধুনিক সৈন্যদল সেই ভূমির সুযোগ লইতে যাইবে—ইহা সাধারণ বুদ্ধির কথা এবং এই সাধারণ বুদ্ধির দ্বারা কোন অভিনবত্ব আশা করা যায় না। এ জন্য জাপানীরা চতুরের মত পেগু অঞ্চলের সমতল ভূমিপথে এবং উন্মুক্ত প্রান্তর দিয়া অগ্রসর

হইল না, তাহারা গেল অধিকতর কষ্টকর জঙ্গলাকীর্ণ ভূমি দিয়া। ইহার জন্য আক্রমণকারী বৃটিশবাহিনী তেমন প্রস্তুত ছিল না। তাহারা অপেক্ষাকৃত সহজ ভূমিতে শত্রুর আগমনের অপেক্ষা করিতেছিল। ফলে, বিপরীত ও অপ্রত্যাশিত রণকৌশলের পাল্লায় পড়িয়া বৃটিশবাহিনীকে পথ ছাড়িয়া দিতে হইল এবং অতি দ্রুত দক্ষিণ ব্রহ্ম হাতছাড়া হইয়া গেল। জাপানী রণকৌশলের এই বিশিষ্টতা নিশ্চয়ই স্মরণযোগ্য এবং শিক্ষাপ্রদ।

সপ্তম অধ্যায়

:*:—

(১)

আরাকান ও উত্তর ব্রহ্ম

২৫শে মার্চ্চ, '৪২।

দক্ষিণ ব্রহ্মের যুদ্ধের পর জাপানীরা কয়েক দিন দম ধরে। বোধহয় দিন দশেক ধরিয়া তাহারা পরবর্ত্তী আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হইতে থাকে। ভৌগোলিক দিক হইতে তুলনা দিয়া বলা যায় যে, পূর্ব্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ যেমন গোটা বাঙলা দেশের দুই অংশ, তেমনই উত্তর ব্রহ্ম ও দক্ষিণ ব্রহ্ম সমগ্র ব্রহ্মের প্রধান দুই অংশ। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের জন্য ব্রহ্ম দেশের অধিকাংশ নদী ও রেলপথ, উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি এবং এই দেশও দুই অংশে বিভক্ত। যদিও কলিকাতা সহর সমগ্র বাঙলার রাজধানী, তথাপি পশ্চিম বাঙলা ও পূর্ব্ব বাঙলার কথা উল্লেখ করিয়া যেমন বলা যায় যে, কলিকাতা পশ্চিম বাঙলার এবং ঢাকা

পূর্ব্ব বাঙ্গলার রাজধানী, তেমনই রেঙ্গুন সহর সমগ্র ব্রহ্ম দেশের রাজধানী হইলেও এবং কলিকাতার মত রেঙ্গুণ ব্রহ্মদেশের আসল প্রাণকেন্দ্র হইলেও মান্দালয় উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী—যেমন ঢাকা পূর্ব্ব বঙ্গের।

নিঃসন্দেহে রেঙ্গুণ দখলের দ্বারা জাপানীরা ব্রহ্মের এই প্রাণকেন্দ্র কাড়িয়া লইয়াছে। তথাপি উত্তর ব্রহ্মের গুরুত্ব রহিয়াছে। উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী মান্দালয় দখল না হইলে গোটা ব্রহ্মদেশের উপর আধিপত্য করা যায় না। কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে গোয়ালন্দকে যেমন রেল ও ষ্টীমার পথের একটী গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র বলা যায় এবং ইহা যেমন কলিকাতা ও ঢাকার মধ্যে কতকটা মাঝামাঝি বিন্দুর মত, টাঙ্গু সহরও তেমনই রেঙ্গুণ ও মান্দালয়ের মধ্যে মাঝামাঝি বিন্দুর মত। রেঙ্গুণ-মান্দালয় রোড—যাহা উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মকে সংযুক্ত করিয়া চীন-ব্রহ্ম সড়ক গড়িয়া তুলিয়াছে, টাঙ্গু তাহার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এদিকে রেঙ্গুণ হইতে উত্তর-পশ্চিমে প্রোম এবং পশ্চিমে বেসিন পর্য্যন্ত উৎকৃষ্ট সড়ক গিয়াছে।

রেঙ্গুণের পতনের দ্বারা ব্রহ্ম যুদ্ধের প্রথম অধ্যায় শেষ হইয়াছে, সুতরাং ইহার পর দ্বিতীয় বা শেষ অধ্যায় আরম্ভ হইবে। এই দ্বিতীয় অধ্যায় সুরু করিবার সঙ্গে জলপথ ব্যবহারের প্রশ্ন আছে। যদি জাপানীরা সিটাং ও বিলিন নদীর সেতুগুলি মেরামত করিতে না পারিয়া থাকে, তবে, তাহারা সমুদ্রপথ ব্যবহার করিবে। রেঙ্গুণ পোতাশ্রয় ধ্বংস করা হইলেও বন্দরটি একেবারে অব্যবহার্য্য হয় নাই বলিয়া লণ্ডন হইতে প্রকাশ পাইয়াছে। জাপানীরা রেঙ্গুণে সৈন্য নামাইতে পারিবে, তবে, মালপত্র বেশী নামাইতে পারিবে না। সমুদ্রপথ দিয়া তাহারা আরাকান অঞ্চল এবং আকিয়াব বন্দরের

দিকেও অগ্রসর হইতে পারে। রেঙ্গুণ হইতে ইরাবতীর তীরে প্রোম পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াও জাপানীরা আরাকানে প্রবেশ করিতে পারে। আরাকান ভারতবর্ষ বা বাঙ্গলার সীমানার সহিত যুক্ত। যদিও আরাকান ব্রহ্মের অভ্যন্তরভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন, তথাপি দুইটি পার্ব্বত্যপথ দিয়া আরাকান আক্রমণ করা যায়। স্থলপথে দক্ষিণ হইতে প্রোমের টাউংগাপ গিরিপথ এবং মিনবুর আন গিরিপথ দিয়া আরাকানে তাহারা ঢুকিতে পারে। এই দুই গিরিপথের সহিত আরাকানের উপকূল পথ সংযুক্ত এবং উপকূল পথ আকিয়াব হইয়া কক্সবাজার পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। সুতরাং একদিকে বঙ্গোপসাগর এবং আর একদিকে এই স্থলপথ, উভয় দিক দিয়া জাপানীরা আরাকান দখল করিতে পারে। কিন্তু রেঙ্গুণের পর ব্রহ্মদেশের আসল যুদ্ধ সুরু হইবে দুইটি প্রধান সড়ক ধরিয়া—পূর্ব্ব দিকে টাঙ্গুর মধ্য দিয়া মান্দালয় রোডে এবং পশ্চিমে প্রোম রোডে। জাপানীরা জঙ্গল যুদ্ধে বিশেষ নৈপুণ্য দেখাইয়াছে। তৎসত্ত্বেও এই দুই সড়ক দিয়াই যুদ্ধ চলিবে বলিয়া মনে হয়। কারণ, ট্যাঙ্ক, মোটর যান ও সরবরাহ গাড়ীগুলির পক্ষে সাধারণতঃ রাস্তা ছাড়িয়া যুদ্ধ চালানো সম্ভব নহে। ২০শে মার্চ্চ সংবাদদাতাগণ জানাইতেছেন যে, প্রচণ্ড রৌদ্রতাপ ও পরিষ্কার আবহাওয়ার মধ্যে ব্রহ্মদেশ রক্ষার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে। বৃটিশ সৈন্যগণ তাহাদের নূতন আত্মরক্ষার ঘাঁটিতে অবস্থান করিয়া জাপ আক্রমণের প্রতীক্ষা করিতেছে। মান্দালয়ের দিকে যে রাস্তা গিয়াছে বর্ত্তমানে তাহা ধরিয়াই জাপানীদের প্রধান আক্রমণ চলিতেছে। এই পথে টাঙ্গু দখল করাই জাপানীদের আশু লক্ষ্য। ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর কেবলমাত্র সম্মুখসারির সৈন্যেরা কানউটকিলে জাপানীদের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত আছে। এই স্থানটি টাঙ্গু হইতে

৪০ মাইল দূরে অবস্থিত। ইহাতে বুঝা যায় যে, বৃটিশ পক্ষের প্রধান বাহিনী আরও উত্তর দিকে সরিয়া গিয়াছে।

এদিকে ইরাবতী নদীতেও জাপানীদের কার্য্যকলাপ দেখা যাইতেছে। মনে হয় প্রোম রোডের দিকেও ইহারা আক্রমণ করিবে। ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ নদী ইরাবতী, ইহা উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত গোটা ব্রহ্মদেশকে লম্বালম্বিভাবে অতিক্রম করিয়া মার্ত্তাবান উপসাগরে পড়িয়াছে। ভামো হইতে ইহা যেন ১৪টি বাহু দিয়া সমুদ্রকে আঁকড়াইয়া ধরিয়াছে—এত বাহু-পথে সমুদ্রের সঙ্গে আর কোন নদী মিশে নাই। ইরাবতী ১৩০০ মাইল দীর্ঘ, এই দীর্ঘ পথের ৯০০ মাইল নৌ-চলাচলের যোগ্য। প্রোম হইতে ১২৫ মাইল উত্তরে ইরাবতীর তীরবর্ত্তী অঞ্চলে যথেষ্ট তৈলখনি আছে। সুতরাং জাপানীরা প্রোম হইয়া ইরাবতীর তীর ধরিয়া সমান্তরাল পথে অগ্রসর হইবার জন্য চেষ্টা করিবে। এজন্য প্রোমের রণক্ষেত্রকে ইরাবতীর রণক্ষেত্র বলিয়াও অভিহিত করা যায়। নৌকারোহী জাপ সৈন্যগণ ইতিমধ্যেই থারাবড্ডি হইতে ২০ মাইল উত্তরে পৌঁছিয়াছে। তথায় তাহারা বিশ্বাসঘাতক বর্ম্মীদের সহিত যোগ স্থাপন করিয়াছে। পরস্পর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্নভাবে অগ্রসর হইয়া ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনীর পার্শ্বদেশ আক্রমণ করার জন্যই তাহারা এভাবে অগ্রসর হইতেছে এবং বর্ম্মীদের সাহায্য লইতেছে। তাহাদের মূলবাহিনী এখনও থারাবড্ডির প্রায় ৪৫ মাইল দক্ষিণে রহিয়াছে এবং উত্তর দিকে আরও ৬০ মাইল অগ্রসর না হইলে বৃটিশ মূলবাহিনীর সহিত তাহাদের সাক্ষাৎ ঘটিবে না। স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, জাপানীরা ইরাবতী নদীপথে যত বেশী দূর সম্ভব অগ্রসর হইতে চাহে। এই উদ্দেশ্যে তাহারা অধিকৃত এলাকার নৌকাগুলি হস্তগত করিয়াছে। প্রত্যেকটি

নৌকায় একশত লোক চড়িতে পারে, এরূপ বহু নৌকা আছে। ঐ সকল নৌকাযোগে রাত্রিকালে বহু সৈন্য নামাইয়া দেওয়া হইবে এবং নদীতীর ও রেঙ্গুণ-প্রোম পথের মাঝে থাকিয়া তাহারা ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্য চলাচলে বাধা সৃষ্টি করিবে।*

পরবর্ত্তীকালে যুদ্ধের গতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, উপরে যে সমস্ত আনুমানিক গবেষণা দেওয়া হইল, সেগুলির অধিকাংশই অক্ষরে অক্ষরে ফলিয়া গিয়াছে। প্রোম ও টাঙ্গুর মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত ও অরণ্যবহুল অঞ্চলে প্রবেশ করিয়া জাপানী সৈন্যেরা যেমন পিপীলিকার মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়া বৃটিশ বাহিনীকে ঘিরিয়া ধরিতে চাহিয়াছে, তেমনই বড় বড় বাঁধানো সড়ক দিয়াও তাহারা অগ্রসর হইয়াছে। ইরাবতী বা প্রোম রণক্ষেত্রে তাহারা প্যারাসুট সৈন্যও নামাইয়াছে। এই সমস্ত প্যারাসুট সৈন্য বিশ্বাসঘাতক বর্ম্মীদের সহিত যোগসূত্র স্থাপন করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। প্রোমের সড়ক এবং ইরাবতী নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম তীর—এই তিন দিক দিয়া জাপ সৈন্যেরা প্রোমকে আক্রমণ করিয়াছে। তাহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়াই অগ্রসর হইয়াছে। টাঙ্গু রক্ষাকারী জেনারেল ষ্টিলওয়েলের অধীন চীনাবাহিনী এবং ইরাবতী রণাঙ্গনে জেনারেল আলেকজেণ্ডারের অধীন ইঙ্গ-ভারতীয় বাহিনী—এই উভয় দলের পারস্পরিক যোগাযোগ নষ্ট করিবার জন্যও জাপবাহিনী কৌশলপূর্ণ চেষ্টা করিয়াছে। টাঙ্গু-মান্দালয় পথ এবং টাঙ্গু ও প্রোমের মধ্যবর্ত্তী অঞ্চল দখল করিয়া তাহারা মিত্রবাহিনীর যোগসূত্র ভাঙ্গিয়া দিতে চাহিয়াছিল। ইহা ছাড়া মিত্রপক্ষ কতকগুলি অনিবার্য্য অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন।

* ব্রহ্ম যুদ্ধের পর বাঙ্গলার কোন কোন নদীবহুল অঞ্চল হইতে গবর্ণমেণ্ট এই কারণেই নৌকাগুলি সরাইয়া ফেলিয়াছেন কিম্বা নিজেদের দখলে আনিয়া রাখিয়াছেন।

উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাট তাহাদের হাতছাড়া হওয়ায় যোগাযোগ ও রসদ সরবরাহের ব্যবস্থায় নিদারুণ বিঘ্ন দেখা দেয়। বিশেষভাবে চীনা সৈন্যদের রসদ জোগানো একটা সমস্যা হইয়া দাঁড়ায়। জাপানীরা দেশীয় লোকদের সাহায্যও পাইয়াছে এবং তাহারা দীর্ঘ ইরাবতী ও সিটাং নদীর উপত্যকা ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছে। পক্ষান্তরে মিত্র-বাহিনীকে পর্ব্বতের দিকে পিঠ রাখিয়া অগ্রসর হইতে ও লড়াই করিতে হইয়াছে। তথায় যে রাস্তা ছিল, তাহা পায়ে হাঁটিয়া চলিবার মত উপযোগী, এই ধরণের রাস্তায় যানবাহন চালনা একান্ত কঠিন ছিল। যেখানে রাস্তাঘাট, রসদ ও যোগাযোগ রক্ষা একটা সুকঠিন সমস্যা, সেখানে যুদ্ধ চালনা যে দুঃসাধ্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। এই কারণেই টাঙ্গু এবং প্রোম দ্রুত হাতছাড়া হইয়া গেল—খুব বড় রকমের যুদ্ধ ইহার জন্য প্রয়োজন হয় নাই।

ব্রহ্মদেশে জাপানীরা ঠিক কত সৈন্য সমাবেশ করিয়াছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় নাই। তবে, অনুমান এই যে, তাহারা ব্রহ্ম-শ্যাম সীমান্তে এক ডিভিসন (এই দলে কিছু কিছু শ্যাম দেশীয় সৈন্যও ছিল), সিটাং নদী অঞ্চলে এক ডিভিসন, ইরাবতী অঞ্চলে এক ডিভিসন এবং মৌলমেনে রিজার্ভ বা মজুত এক ডিভিসন সৈন্য নিয়োগ করিয়াছিল। বোধ হয় মোট ১ লক্ষ সৈন্য হইবে। এই সংখ্যাটা নিশ্চয়ই সামান্য নহে।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(১০)

টাঙ্গু-প্রোম, আকিয়াব-আন্দামান

৪ঠা এপ্রিল '৪২।

ফেব্রুয়ারী মাসে মৌলমেন ও মার্ত্তাবান দখলের পর মার্চ্চ মাসে জাপানীরা দক্ষিণ ব্রহ্মের গোটা অংশ দখল করিয়া এক্ষণে এপ্রিল মাসে উত্তর ব্রহ্ম অভিমুখে অভিযান করিতেছে। জাপানীরা সম্ভবতঃ বর্ষা নামিবার আগেই সম্পূর্ণ ব্রহ্মদেশ দখল করিতে চাহে। মালয় অভিযানের সময় তাহারা দক্ষিণ প্রান্তিক ব্রহ্মের শেষাংশে ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট ও টেনাসেরিম বিভাগ দখল করিয়াছিল। তারপর সিঙ্গাপুর অধিকার করিয়া তাহারা একই সঙ্গে রেঙ্গুণ ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের সংগ্রাম শেষ করে। সালুইন ও সিটাং নদীর যুদ্ধশেষে জাপানীরা পেগু ও রেঙ্গুণ কাড়িয়া লইয়াছে। থারাবড্ডি ও বেসিনও তাহাদের

হাতে গিয়াছে। এক্ষণে প্রোম ও টাঙ্গুও তাহারা অধিকার করিল। এক কথায় নিম্ন ও মধ্য ব্রহ্মের প্রায় সমস্ত উল্লেখযোগ্য স্থানই জাপানীরা কাড়িয়া লইয়াছে। ভালো ভালো রাস্তা, রেলপথ, নদীতট ও সমুদ্রতীর জাপানীদের দখলে গিয়াছে। ভবিষ্যতে যুদ্ধ চালাইবার পক্ষে ইহা দ্বারা জাপানীরা যেমন লাভবান হইল, তেমনই চীনা, ভারতীয় ও বৃটিশ সম্মিলিত বাহিনীর বাধাদানের পক্ষে অধিকতর অসুবিধার সৃষ্টি হইল। রণনীতি গায়ের জোরের উপর নির্ভর করে না। সংগ্রাম পরিচালনার পক্ষে রেলপথ, রাস্তাঘাট, নদীতীর ইত্যাদি অবস্থানুসারে প্রচুর সহায়তা কিম্বা প্রচুর বিঘ্নের সৃষ্টি করে। ব্রহ্মদেশের ভৌগোলিক সংস্থান আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট সহায়ক হইবে বলিয়া মনে হইয়াছিল। কিন্তু আধুনিক বোমারু বিমান এমন একটী পদার্থ যে, উহার নিকট প্রকৃতির অনেক বাধাই সহজ হইয়া গিয়াছে। দুর্ভাগ্যক্রমে জাপানীরা বিমানশক্তিতে শ্রেষ্ঠ। মার্কিণ ও বৃটিশ বিমানবহর বহু স্থানে জাপানীদিগকে কৃতিত্বের সহিত বাধা দিলেও জাপানীরা সংখ্যাশক্তির গুণে আকাশের আধিপত্য লাভ করিয়াছে। টাঙ্গুর রণক্ষেত্রে চীনা বাহিনীর পশ্চাদপসরণ বা বৃটিশ বাহিনীর সাফল্যের সহিত প্রোম ত্যাগ মালয়ের যুদ্ধের সেই একই শোচনীয় কাহিনী উদ্ঘাটিত করিতেছে। মালয় ও সিঙ্গাপুরের যুদ্ধ শেষ হইয়া যাওয়ায় এবং অষ্ট্রেলিয়ার দিকে পরিপূর্ণ অভিযান আরম্ভ না হওয়ায় জাপানীরা ব্রহ্মদেশে বেশী পরিমাণ শক্তি কেন্দ্রীভূত করিতে পারিতেছে। তাহারা টাঙ্গু সহরকে কার্য্যতঃ বেষ্টন করিয়া ফেলিয়াছিল এবং নূতন নূতন বিমান আমদানী করিয়া চীনা বাহিনীর প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করিয়া ফেলিয়াছিল। তবে, পরিবেষ্টিত হওয়া সত্ত্বেও টাঙ্গু দুর্গের চীনাবাহিনী পূর্ব্বদিকস্থ জাপানীদের দুর্ব্বল ব্যূহের উপর প্রচণ্ড পাল্টা আক্রমণ

চালাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে এবং ৭ মাইল দূরবর্ত্তী মূল বাহিনীর সহিত সংযোগ স্থাপন করিয়াছে। জাপানীরা দক্ষিণ-উত্তর এবং দক্ষিণ-পশ্চিম দিক ধরিয়া টাঙ্গু সহর ঘিরিয়া ধরে। পূর্ণ এক সপ্তাহকাল এখানে অবরোধ যুদ্ধ চলিয়াছিল এবং শেষ পর্য্যন্ত জল, খাদ্যদ্রব্য ও গোলাগুলী ইত্যাদির অভাবে পড়িয়া চীনাবাহিনী টাঙ্গু ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। টাঙ্গু এবং প্রোম উভয় সহরই রাস্তা ও রেলপথের দিক দিয়া সমৃদ্ধ। সুতরাং এই দুই সহর হারাইবার ফলে মিত্রশক্তির যথেষ্ট ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। এই অঞ্চলের যুদ্ধের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসংবাদ এই যে, কয়েক হাজার বর্ম্মী সৈন্য জাপানীদিগকে সাহায্য করিয়াছে। প্রকাশ যে, এই সমস্ত বর্ম্মী সৈন্য অগ্রসর হইয়া গিয়া মিত্রপক্ষীয় বাহিনীকে ঘিরিবার চেষ্টা করে। ব্রহ্মদেশের বাসিন্দারা ব্রহ্মের রাস্তাঘাটের সহিত স্বভাবতঃই সুপরিচিত। তাহারা জাপানীকে বাধা দেওয়ার বদলে সাহায্য করিতেছে—সমরনীতির দিক দিয়া এই সংবাদ মারাত্মক। এই সমস্ত পঞ্চমবাহিনী যদি আক্রমণকারী জাপানকে পথ দেখাইয়া দেয় এবং সামরিকভাবে পূর্ণ সহযোগিতা করিতে থাকে, তবে, দেশরক্ষার পক্ষে ইহার চেয়ে শোচনীয় ব্যাপার আর কি হইতে পারে ?

জাপানীরা মান্দালয় ও উত্তর ব্রহ্মের দিকে শনৈঃ শনৈঃ অগ্রসর হইতেছে। স্থলপথে সৈন্য সংখ্যায় এবং আকাশপথে বিমান সংখ্যায় তাহাদের শ্রেষ্ঠতা নিঃসন্দেহে দুঃসংবাদ। তাহারা কেবল ব্রহ্মের সীমান্তেই আবদ্ধ থাকিতেছে না। সমুদ্র ডিঙ্গাইয়া তাহারা আরও বহু দূরে—ভারতবর্ষের দিকেও হাত বাড়াইতেছে। জাপানীদের দ্বারা আন্দামান দ্বীপপুঞ্জের অধিকার ভারতবর্ষের পক্ষে অকল্যাণকর। এই দ্বীপটি যেন তাহারা কতকটা নিঃশব্দে ও অতর্কিতে অধিকার করিয়াছে।

আন্দামান দ্বীপে কোন বড় রকমের নৌঘাঁটি নির্ম্মাণ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তবে বিমান ও ক্ষুদ্র নৌবহরের পক্ষে বোধ হয় আশ্রয়স্থল তৈয়ার করা কঠিন নহে। বঙ্গোপসাগরের বুকের উপর এই দ্বীপের ঘাঁটি শত্রু কবলিত হওয়ায় ভারতবর্ষের জলপথ ও আকাশপথ অধিকতর বিপন্ন হইল। কলিকাতা হইতে পোর্ট ব্লেয়ারের দূরত্ব ৬৭৮ মাইল এবং রেঙ্গুণ ৭৮০ মাইল—ইহা জলপথের দৈর্ঘ্য। আকাশপথে এই দৈর্ঘ্য হ্রাস পাইলেও সোজা রেঙ্গুণ ও পোর্ট ব্লেয়ার হইতে কলিকাতায় বিমান হানা দেওয়া আদৌ সহজ নহে। কিন্তু সিঙ্গাপুর, পেনাং মৌলমেন, রেঙ্গুণ, বেসিন ইত্যাদি প্রত্যেকটি সমুদ্রতীরস্থ বন্দর ও সহর জাপানীদের কবলে যাওয়ায় এবং জাপ নৌবহরের শক্তি প্রচুর পরিমাণে অটুট থাকায় জাপানের পক্ষে নৌ-অভিযানের আশঙ্কা আছে। নৌ-অভিযানের চেয়েও বেশী সম্ভাবনা রহিয়াছে নৌবহরের সহযোগী বিমানবহরের আক্রমণের। আন্দামান দ্বীপে জাপ নৌ-বহরের সহিত মার্কিণ বিমানবহরের সাফল্যপূর্ণ সংঘর্ষের সংবাদ সেই বিপদের বার্ত্তাই বহন করিয়া আনিতেছে। চট্টগ্রাম অঞ্চল দিয়াও বিপদের আশঙ্কা করা যাইতেছে। প্রোম জাপানীরা কাড়িয়া লইয়াছে, তাহারা ইরাবতীর তীর ধরিয়া উত্তর দিকস্থ তৈল ও কয়লা খনিসমূহের দিকে নিশ্চয়ই অগ্রসর হইবে। প্রোম ও মিনবু হইতে পশ্চিম ও পশ্চিমোত্তর দিক দিয়া এবং সমুদ্রতীর ধরিয়া রাস্তা চলিয়া গিয়াছে বাঙ্গলার চট্টগ্রাম পর্য্যন্ত। অবশ্য বিখ্যাত আরাকান গিরিমালা উত্তর ও দক্ষিণ পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়া এই দিক আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। পর্ব্বত ও অরণ্যের জন্য এই অঞ্চল দুর্গম এবং যে দুইটি প্রধান সড়ক পথ চলাচলের জন্য রহিয়াছে, তাহা কোন সামরিক অভিযানের পক্ষে যথেষ্ট কিনা আমরা জানি না। তবে, জাপ সৈন্যেরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে

বিভক্ত হইয়া এই রাস্তা ধরিয়া হানা দিতে পারে কি না, তাহা একমাত্র সমর-কর্ত্তৃপক্ষ বলিতে পারেন। প্রোম ও মিনবু হইতে দুর্গম পথে ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হইয়া যদি জাপ সৈন্যেরা অগ্রসর হইতে চায়, তবে, তাহাদিগকে সাহায্য করিবার জন্য জাপানীরা পূর্ব্বাহ্নে জলপথে আকিয়াব দখল করিতে পারে। আকিয়াব সম্পর্কেও চুংকিং হইতে দুঃসংবাদ আসিয়াছে। চুংকিংয়ের মতে আকিয়াব জাপানীদের হাতে গিয়াছে, তাহারা নৌ-বহরের সাহায্যে আক্রমণ করিয়াছিল এবং ক্রুজার ও ডেষ্ট্রয়ারের সাহায্যে অবতরণ করিয়াছে।* যদিও আকিয়াব ব্রহ্মদেশের সীমানার মধ্যে তথাপি উহা বাঙ্গলা বা চট্টগ্রামের সীমান্তবর্ত্তী এবং বাঙ্গলাদেশের এত সন্নিকটে জাপানীদের উপস্থিতি নিশ্চয়ই কাহারও নিকট বাঞ্ছনীয় নহে।

ব্রহ্মদেশের সংগ্রাম শেষ হইবার পূর্ব্বে জাপানীরা ভারতবর্ষের স্থলপথে অভিযান করিবে, একথা বিশ্বাস করা কঠিন। আকাশপথে এবং সম্ভবতঃ জলপথে তাহারা হুমকি দেখাইতে পারে। ভারতবর্ষ সোভিয়েট রাশিয়ার মত বিরাট দেশ। এই দেশে সহসা বহু সহস্র মাইল দূর হইতে প্রচুর সংখ্যক সৈন্য ও সমরোপকরণ জাপানীদের পক্ষে আমদানী করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। তবে, রেঙ্গুণ হইতে বোম্বাই ও করাচী পর্য্যন্ত সমগ্র জলপথের উপর জাপ নৌবহর কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষকে কতকটা অবরোধ বা blockade এর অবস্থায় ফেলিতে পারে। এজন্য অবশ্যই প্রচুর নৌবলের প্রয়োজন, জাপানের পক্ষে এত নৌবহরের সমাবেশ আপাততঃ সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তথাপি সমুদ্রপথে ইতস্ততঃ আক্রমণের উৎপাত বাড়িবার সম্ভাবনা।

---

* প্রথমে নয়াদিল্লী হইতে আকিয়াব দখলের সংবাদ অস্বীকার করা হয়। কিন্তু কয়েক সপ্তাহ পরে সেই সংবাদ সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(১১)

ব্রহ্ম যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য

১০ই এপ্রিল, '৪২।

টাঙ্গু হইতে পশ্চাদপসরণের পর মিত্রশক্তির সৈন্যবাহিনী আরও উত্তর দিকে অপসরণে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা থিয়েমিও হইতে হটিয়া গিয়াছে। মিত্রশক্তির এই ক্রমাগত পশ্চাদপসরণের মূলে রহিয়াছে তাহাদের সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রের অপ্রাচুর্য্য। জাপানীরা মিত্রশক্তির তুলনায় অনেক বেশী সৈন্য, বিমান ও আনুষঙ্গিক সামরিক অস্ত্রের সমাবেশ করিতে পারিয়াছে। ফলে অল্প পরিমাণ শক্তি লইয়া মিত্রশক্তিবাহিনী জাপানীদিগকে সাফল্যের সহিত প্রতিরোধ করিতে পারিতেছে না। রণনীতির সাধারণ ধর্ম্মানুসারে ইহাই স্বাভাবিক যে, যাহারা আক্রমণ করে, তাহারা অনেক বেশী শক্তি লইয়া অগ্রসর হয়। প্রতিপক্ষের

তুলনায় অনেক বেশী সৈন্য ও সমরাস্ত্রের সমাবেশ করিতে না পারিলে অধিকাংশ সেনাপতিই আক্রমণাত্মক অভিযানে বাহির হইতে চাহেন না। কিন্তু ইহার ব্যতিক্রমও অনেক স্থলে ঘটিয়া থাকে। নেপোলিয়ান কোন কোন সময় অপেক্ষাকৃত অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়াও বিস্ময়কর জয়লাভ করিয়াছেন। কিন্তু নেপোলিয়ানের মত প্রতিভা সামরিক ইতিহাসে কয়টি দেখা যায়? যেখানে প্রতিভার বদলে সাধারণ কৃতিত্বের প্রশ্ন সেখানে উভয় পক্ষের শক্তি অন্ততঃ সমান হওয়া প্রয়োজন। যদি এক পক্ষ সৈন্যে ও সমরাস্ত্রে হীন হইয়া থাকে, তাহা হইলে অপর পক্ষের জয়লাভ বিস্ময়কর নহে। কিন্তু ব্রহ্ম যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য কেবল ইহারই মধ্যে নিবদ্ধ নহে। ব্রহ্মদেশের ভৌগোলিক অবস্থা এই যুদ্ধে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনের এতখানি অগ্রগতির পূর্ব্বে সমর-নীতিবিদ্‌গণ যে কোন রণক্ষেত্রের ভৌগোলিক অবস্থা লইয়া যথেষ্ট বিচার বিবেচনা করিতেন। নদী, পাহাড় ও জঙ্গল আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক বলিয়া বিবেচিত হইত। অবশ্য নদী, পাহাড়, জঙ্গল ইত্যাদি বিঘ্নগুলিকে আড়াল হিসাবে ব্যবহার করিতে পারাই আত্মরক্ষার একমাত্র উপায় নহে। ইহার সঙ্গে উপযুক্ত সৈন্য ও সমরাস্ত্রের এবং সমরশক্তির যথোপযুক্ত বণ্টনের প্রয়োজন আছে। যদি সেই বণ্টন ঠিক মত ও উপযুক্ত সংখ্যায় না হয়, তবে, কেবল পাহাড় ও জঙ্গলের বা উচ্চতর নদীতীরের আড়ালে দাঁড়াইলে কি হইবে? একটা কাল্পনিক দৃষ্টান্ত দিয়া বলা যাইতে পারে যে, মিত্রশক্তিবাহিনী সিটাং নদীর তীরে সুবিধাজনক স্থানে দণ্ডায়মান এবং তাহারা বাধাদানের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তাহাদের সংখ্যাও বেশী নহে এবং বিমানশক্তিরও অভাব। অপর পক্ষে জাপানীরা সিটাং নদীর অপর তীরে অধিক সংখ্যক সৈন্য, কামান, বন্দুক ও এরোপ্লেন লইয়া উপস্থিত।

এক্ষণে সিটাং নদী পার হইতে গিয়া জাপানীরা যদি অজস্র এরোপ্লেন হইতে নদীর অপর তীরে অপেক্ষমান মিত্রশক্তির উপর বোমা বর্ষণ করিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে কামানও গর্জ্জন করিতে থাকে, তাহা হইলে আত্মরক্ষাকারিগণ কতক্ষণ নদীতীরে বাধা দিতে পারিবে? সুতরাং কেবল নদী বা পাহাড় থাকিলেই চলিবে না। এই সমস্ত বিঘ্নকে যথোপযুক্ত সামরিক শক্তির দ্বারা কাজে লাগাইবার সুযোগ থাকা চাই।

ব্রহ্ম রণাঙ্গনের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করিলে প্রথমেই চোখে পড়িবে নদীগুলি। সালুইন, বিলিন, সিটাং ও ইরাবতী—প্রধানতঃ এই নদীগুলিই ব্রহ্মযুদ্ধে খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছে। এই নদীগুলির অবশ্য কয়েকটি শাখা আছে। পাঠকবর্গের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, দক্ষিণ ব্রহ্মের সংগ্রামের সময় মিত্রশক্তিবাহিনী পর পর সালুইন, বিলিন ও সিটাং, এই তিনটি নদীতীর ধরিয়া জাপানীদিগকে বাধা দিতে চেষ্টা করিয়াছে। একটি নদীতীর হইতে হটিবার পর তাহারা আর একটি নদীতীরে গিয়া ব্যূহ রচনা করিয়াছে। কিন্তু জাপানীরা শক্তির প্রাচুর্য্যে এবং আধুনিক রণকৌশলের infiltration বা সূচীভেদ নীতির দ্বারা ক্রমাগত নানাস্থানে প্রতিপক্ষের ব্যূহগুলিকে বিদ্ধ করিয়া অগ্রসর হইয়াছে। নদীগুলির মধ্যে ইরাবতী ও সালুইন অত্যন্ত দীর্ঘ এবং অধিকাংশ বড় নদী ব্রহ্মদেশের উত্তর দক্ষিণ ভেদ করিয়া সমুদ্রে আসিয়া মিশিয়াছে। কেবল যে নদীগুলিই উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি চলিয়া গিয়াছে, এমন নহে। যে কয়টি বড় রাস্তা ও রেলপথ রহিয়াছে, সেগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নদীসমূহের সহিত যেন সমান্তরাল রেখায় উত্তর-দক্ষিণ অতিক্রম করিয়াছে। রাস্তা, রেলপথ ও নদী যেমন ব্রহ্মদেশে প্রচুর নহে, তেমনই

এইগুলি পরস্পরকে কাটিয়া যায় নাই। রাশিয়ার মধ্য রণাঙ্গনে যেমন প্রচুর রেলপথ ও রাস্তা পরস্পরকে মাকড়সার জালের মত আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে, ব্রহ্মদেশে তেমন নহে। রাস্তা, রেলপথ ও নদীর এই অভিনব বৈশিষ্ট্য ব্রহ্মদেশে মিত্রশক্তির আত্মরক্ষায় প্রচুর বিঘ্ন সৃষ্টি করিয়াছে। রণাঙ্গনগুলি একটানা দীর্ঘ হইয়াছে এবং সেই তুলনায় প্রস্থ অত্যন্ত সামান্য ছিল। আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রামের আত্মরক্ষার দিক হইতে ইহা একটা গুরুতর বাধা। কারণ, যাহাকে defence in depth বা গভীরতর ব্যূহের আত্মরক্ষা বলে, সেই রণ-কৌশলের সুযোগ পাওয়া যায় নাই। শত্রু যেখানে দ্রুত আক্রমণশীল, সেখানে সম্মুখে, দুই পার্শ্বে ও পশ্চাতে বহুবিস্তৃত ভূমি না থাকিলে ইচ্ছামত সৈন্যদলকে খেলানো যায় না। বরং বাধ্য হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সরু ও দীর্ঘ রেখা ধরিয়া পশ্চাতে হটিতে হয়। মিত্রশক্তি-বাহিনীও ক্রমাগত এইভাবে পশ্চাতে হটিতেছে। আত্মরক্ষাকারিগণ যখন বর্ম্মা রোডের আড়াল ধরিয়া পিছু হটিয়াছে, আক্রমণকারিগণ তখন উহারই সমান্তরালবর্ত্তী রণাঙ্গনে অগ্রসর হইতেছে। রণনীতির পক্ষে ইহা গুরুতর।

এভাবে ব্রহ্ম রণক্ষেত্রে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়াছে। ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল আলেকজেণ্ডার ও মার্কিণ সেনাপতি জেনারেল ষ্টিলওয়েল—দুই রণক্ষেত্রের অধিনায়ক। মার্কিণ সেনাপতির অধীনে রহিয়াছে চীনা সৈন্যদল। সিটাংয়ের পর পেগু ও রেঙ্গুণ ছাড়িয়া জেনারেল আলেকজেণ্ডার শেষ পর্য্যন্ত প্রোম ত্যাগ করিয়া একেবারে ইরাবতীর তীর ধরিয়া উত্তর দিকে চলিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সালুইন ও সিটাংয়ের পর তিনি পশ্চাদপসরণের দিক পরিবর্ত্তন করিয়া সোজা উত্তরাভিমুখে চলিয়া গিয়াছেন। অপর পক্ষে মার্কিণ

সেনাপতি জেনারেল ষ্টিলওয়েল চীনা সৈন্যদলসহ ছিলেন সিটাং নদীর ধারে, তিনি দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতে চাহিয়াছিলেন। রেঙ্গুণ-মান্দালয় রেলপথ ইহারই সমান্তরাল রেখায় চলিয়া গিয়াছে। এখানে চীনা বাহিনী টাঙ্গু সহরে যথেষ্ট বাধা দেওয়া সত্বেও আরও উত্তরে সরিতে বাধ্য হইয়াছে। ইহার ফল দাঁড়াইয়াছে এই যে, আলেকজেণ্ডার ও ষ্টিলওয়েল, এই দুই সেনাপতি মোটামুটি ইরাবতী ও সিটাং—এই দুইদিকে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। ইহারা পরস্পর হইতে ৬০ মাইল ব্যবধানে আছেন এবং এই ৬০ মাইলের মধ্যে পাহাড় ও জঙ্গল রহিয়াছে যথেষ্ট। এখন পর্য্যন্ত তাঁহারা রেলপথ ও রাস্তার এবং পশ্চাদ্ভাগে বিমানঘাটিরও সুযোগ পাইতেছেন। কিন্তু জাপানীরা এই অবস্থায় সিটাং ও ইরাবতীর উপত্যকা ধরিয়া ক্রমশঃ উত্তর দিকে অগ্রসর হইবে এবং এভাবেই মিত্রশক্তির দুই বাহিনীকে নষ্ট করিতে চাহিবে।

সপ্তম অধ্যায়

(১২)

লাসিওর পতন

১লা মে '৪২।

প্রোম ও টাঙ্গু অধিকারের পর জাপানীরা প্রোমের ১২০ মাইল উত্তরে ইনানজিংয়ের তৈলখনির দিকে অভিযান করে। এখানেও কয়েকদিন যুদ্ধের পর বৃটিশ ব্যূহ পার্শ্বদেশ হইতে বিপন্ন হয়। তখন ইনানজিয়াংয়ের সমস্ত কলকারখানা, তৈল-শোধনাগার ইত্যাদি ধ্বংস করিয়া বৃটিশবাহিনী আরও উত্তরে সম্ভবতঃ চিন্দুইন নদীর দিকে সরিয়া যায়। এদিকে যে জাপ সৈন্যেরা শান রাজ্যের মধ্য দিয়া আক্রমণ চালাইতেছিল, তাহারা লাসিও দখল করিয়া লয়।. চীনা সৈন্যেরা লাসিও ত্যাগ করিয়া নূতন ঘাঁটিতে আসিয়া দাঁড়ায়।

এই সংবাদ নিরতিশয় দুঃখজনক। চীন-ব্রহ্ম সড়কের মর্ম্মকেন্দ্র

লাসিও। বহু অর্থব্যয়ে ও বহু পরিশ্রমে এই রাস্তা গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং একমাত্র এই রাস্তা ধরিয়াই চীন ও ব্রহ্মদেশের মধ্যে সামরিক যোগাযোগ রক্ষা করা হইতেছিল। মিত্রশক্তির সহিত চীনা গভর্ণমেণ্টের সাহায্য ও সহযোগিতা লাসিওর পথ ধরিয়া অনুসৃত হইতেছিল। গত তিন চার বৎসরকাল চীন-ব্রহ্ম রাস্তা সম্পর্কে বহু নাটকীয় ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। বৃটেন কর্ত্তৃক চীনকে সাহায্যদান জাপানী কর্ত্তাদের কোনকালেই মনঃপূত ছিল না। তাঁহারা এই রাস্তা বন্ধের জন্য বারম্বার চাপ দিয়াছিলেন এবং একদা চেম্বারলেনের গবর্ণমেণ্ট দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে জাপানী ক্রোধ শান্ত করিবার আশায় কিছুকালের জন্য ইহা বন্ধ করিয়াও দিয়াছিলেন। সুতরাং এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের পতন ব্রহ্ম-সংগ্রামের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর। লাসিওর পতনের দ্বারা মান্দালয়ের আত্মরক্ষার পথেও গুরুতর বিঘ্ন দেখা দিল। মান্দালয় হইতে লাসিওর দূরত্ব ১২০ মাইল এবং ইহা রেলপথের দ্বারা সংযুক্ত। যে চীনাবাহিনী বীরত্বের সহিত উত্তর ব্রহ্মের সংগ্রামে যুঝিতেছিল, লাসিও ও মান্দালয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিবার ফলে সামরিক দিক হইতে তাহারা বেকায়দায় পড়িবে। জাপানীরা তাহাদের নূতন অভিযানে এই কৌশলই খাটাইতে চাহিয়াছিল। ইরাবতী, সিটাং ও সালুইন ইত্যাদি নদী-উপত্যকা ধরিয়া তাহারা যে যুদ্ধ চালাইতেছে উহার লক্ষ্য প্রোম ও মান্দালয় এবং মান্দালয় ও লাসিওর মধ্যে সংযোগ নষ্ট করিয়া দেওয়া। সোজা কথায় প্রোম-মান্দালয় পথে বৃটিশ বাহিনীর এবং মান্দালয়-লাসিওর পথে চীনাবাহিনীর সহিত কিম্বা জেনারেল আলেকজেণ্ডার ও জেনারেল ষ্টিলওয়েলের পারস্পরিক যোগাযোগ বিনষ্ট করা। বিভিন্ন রণক্ষেত্রে সংযোগ রক্ষা করিয়া যাহারা আত্মরক্ষা করিতেছে, যদি তাহাদের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটানো যায়, তবে স্বভাবতঃই

আক্রমণকারীর পক্ষে রণনৈতিক সুবিধা দেখা দিবে। কারণ, আত্মরক্ষাকারিগণ তখন নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত হইয়া পড়িবে এবং যে ঐক্যবদ্ধ-সংহতশক্তি আক্রমণকারীকে বাধা দিতেছিল তাহাও দুর্ব্বল হইয়া পড়িবে। এই কারণেই চুংকিং ও লণ্ডনের কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল ব্রহ্ম-সংগ্রামের সঙ্কটের উপর জোর দিয়াছেন এবং অবস্থা যে নিতান্ত মারাত্মক, তাহা তাঁহারা গোপন করেন নাই।

জাপানীরা শান রাজ্যের ভিতর দিয়া পূর্ব্বদিক হইতে লাসিওর দিকে অগ্রসর হইয়াছে। এই অভিযানে বাধা দেওয়ার জন্য চীনা সৈন্যরা টাউংজি পুনরায় দখল করিয়া দক্ষিণ দিকে অগ্রসর হইতেছিল। টাউংজি দখল চীনাদের পক্ষে কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল। জাপানীরা যখন উত্তরদিকে অগ্রসর হইতেছিল, তখন চীনারা দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া জাপবাহিনীর পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ ও বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। যদি এই কৌশল শেষ পর্য্যন্ত সফল হইত, তাহা হইলে জাপানীরা এত দ্রুত লাসিওতে পৌঁছিতে পারিত না। চীনারা লাসিওর বিপদ বুঝিতে পারিয়া উহার দক্ষিণ দিকস্থ সমস্ত রাস্তা ধ্বংস করিয়া দিয়াছিল। তাহারা টাউংজি পুনরায় দখল করিয়া জাপানীদের পশ্চাদ্ভাগ বিপন্ন করিবার জন্য লয়লেম অভিমুখে অগ্রসর হইতেছিল। জাপানীরা লয়লেম হইতে তিনটি বিভিন্ন বাহিনীর সাহায্যে আক্রমণ চালাইয়াছে। গবেষকদের অভিমত এই যে, যদি এই সময় প্রচুর বৃষ্টি নামিত, তবে রাস্তাঘাটের যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থার দিক হইতে জাপানীরা বেকায়দায় পড়িত। কিন্তু বৃষ্টির অভাবে চীনাগণ কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত রাস্তাঘাটগুলি জাপানীরা বোধ হয় মেরামতের সুযোগ পাইয়াছে। প্রকাশ যে, প্রচুর কামান ও বিমানের গোলা ও বোমা বর্ষণের আড়াল ধরিয়াই জাপবাহিনী লাসিওর দিকে অগ্রসর হইয়াছে এবং

প্রত্যহ নূতন নূতন সৈন্যদল ও অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করিয়াছে। এই যুদ্ধে জাপানীরা প্রচুর সংখ্যক যান্ত্রিকবাহিনীর সাহায্য পাইয়াছে এবং ট্যাঙ্ক ব্যবহার করিয়াছে। ইহাদের তুলনায় মিত্রপক্ষের অস্ত্রশক্তি ও সৈন্যশক্তি যে কম ছিল, তাহা উল্লেখ করা বাহুল্যমাত্র। জাপানীরা যেভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহাতে মান্দালয়ের বিপদ বৃদ্ধি পাইল। কারণ প্রোম-মান্দালয় ও রেঙ্গুণ-মান্দালয় পথ ধরিয়া জাপানীরা যেমন চাপ দিবে, তেমনই লাসিও হইতে মান্দালয়ের উপর পশ্চাদ্ভাগ দিয়াও আক্রমণের চেষ্টা করিবে। এই তিন দিকের চাপ মান্দালয়ের পক্ষে স্বভাবতঃই সঙ্কটজনক হইবে। জাপানীরা সম্ভবতঃ মে মাসের মধ্যেই উত্তর ব্রহ্মের সংগ্রাম শেষ করিতে চাহে। কারণ, ইহার পর বর্ষাকাল সুরু হইবে। মেঘ, বৃষ্টি ও বাতাসের জন্য বিমানবহরের কার্য্যকলাপ যেমন বাধাগ্রস্ত হইবে, তেমনই রাস্তাঘাট ইত্যাদিও পদাতিক বা যান্ত্রিক-বাহিনীর পক্ষে ক্লেশকর হইবে। দক্ষিণ ব্রহ্ম জাপানীদের হাতের মুঠায় যাওয়ায় এবং উত্তর-দক্ষিণ লম্বালম্বি নদীতীর ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে থাকায় আত্মরক্ষার পক্ষে যথেষ্ট অসুবিধা ঘটিয়াছে। ইহা ছাড়া রেঙ্গুণ, প্রোম, বেসিন, মৌলমেন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ নদীতীরস্থ বন্দরগুলির পতন ঘটায় জাপানীদের সরবরাহ ব্যবস্থায় সুবিধা হইয়াছে। ইতিমধ্যে জাপানীরা কিছুকাল নিষ্ক্রিয় ছিল। কিন্তু সেই নিষ্ক্রিয়তা সম্ভবতঃ উত্তর ব্রহ্ম অভিযানের উদ্যোগ-পর্ব্ব ছিল। লাসিওতে তাহাদের অভিযান শেষ হইয়া গেলে মান্দালয় অভিমুখে জাপানীদের চাপ নিশ্চয় প্রবলরূপে বৃদ্ধি পাইবে। এই দুই সহরের উপর জাপানীরা ইতিপূর্ব্বেই নিদারুণ বোমারু আক্রমণ চালাইয়া অগ্নিদগ্ধ করিয়াছে।

যদি মে মাসের মধ্যেই জাপানীদের উত্তর ব্রহ্ম অভিযান শেষ হইয়া

যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষ ও চীন কি অবস্থায় পড়িবে? চীনা সামরিক মুখপাত্রগণ অবশ্যই দৃঢ়তার সহিত বলিতেছেন যে, ব্রহ্মের অদৃষ্টে যাহাই ঘটুক না কেন, তাঁহারা জাপানীদের বিরুদ্ধে শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিবেন। কিন্তু শ্যাম, ইন্দোচীন ও ব্রহ্মদেশে জাপ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইলে পর চীন কি ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে না? ইহার পর ভারতবর্ষ কি স্থলপথে বা জলপথে নিরাপদ? অবশ্য মে মাসের পর মেঘ, বৃষ্টি ও ঝড় দেখা দিবে এবং তারপর তিন মাস প্রাকৃতিক দুর্য্যোগের জন্য দূর দেশের সামরিক অভিযান বিঘ্নসঙ্কুল হইবে। যদি এই তিন মাস সময় পাওয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার আয়োজন নিশ্চয়ই আরও ব্যাপক ও শক্তিশালী হইবে। ব্রহ্মদেশে মিত্রশক্তির দুর্ভাগ্যের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কারণ এই যে, পূর্ব্ব হইতে সামরিক আয়োজন ব্যাপক ও দৃঢ় হয় নাই এবং ব্রহ্মের জনসাধারণের সহিত সরকারী যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। ফলে, ব্রহ্মের জনসাধারণ হইতে যথেষ্ট পরিমাণ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে নাই। রাজনৈতিক অসন্তোষ রণনৈতিক সমস্যাকে জটিল ও কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। ফিলিপাইনের জনগণ জাপ আক্রমণ প্রতিরোধে যতটা সাহায্য করিয়াছে এবং বাতান উপদ্বীপে জাপানীদিগকে তিন মাসকাল যে বীরত্ব ও দৃঢ়তার সহিত বাধা দেওয়া হইয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রহ্মদেশে তেমন হইতে পারে নাই। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষের অবহেলা, শাসন কর্ত্তৃপক্ষের ঔদাসীন্য এবং বৃটেনে চার্চ্চিল মন্ত্রিসভার অদূরদর্শী নীতি ব্রহ্ম রণাঙ্গনে যথেষ্ট ক্ষতি ও দুর্ব্বিপাকের কারণ হইয়াছে। অতএব কেবল সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জার ঘাটতি লইয়া আপশোষ করিয়া লাভ নাই।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(১৩)

মান্দালয় পরিত্যাগ

৫ই মে '৪২

লাসিওর পতনের পর মান্দালয়ের অবস্থা যে কাহিল হইবে, তাহা আর অজ্ঞাত ছিল না। জাপানীরা যেভাবে লাসিও-মান্দালয় রেলপথ বিচ্ছিন্ন করিয়া লাসিও কাড়িয়া লইয়াছে এবং তারপর যেরূপ দ্রুত মান্দালয়ের দিকে গিয়াছে, তাহা তাহাদের রণচাতুর্য্যের পরিচায়ক হইলেও বিস্ময়ের নহে। কারণ, একদিকে লাসিও বিচ্ছিন্ন করিয়া এবং অন্যদিকে ইরাবতী নদীর উপত্যকা ও রেঙ্গুণ-মান্দালয় পথ ধরিয়া জাপানীরা মান্দালয়ের উপর যেভাবে চাপ দেওয়ার সুযোগ পাইয়াছিল তাহাতে তাহাদের লক্ষ্যসিদ্ধি অত্যন্ত সহজ ছিল। আত্মরক্ষার পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও বড় রকমের ভাঙ্গন ধরিলে সেই বৃহৎ ছিদ্র

ধরিয়া আক্রমণকারী অতি দ্রুত অগ্রসর হইয়া বাকি ব্যূহগুলিকে অপেক্ষাকৃত সহজে ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিতে পারে। এজন্যই লাসিওর পতনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে মান্দালয়ও মিত্রশক্তিবাহিনী কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হইয়াছে। রেঙ্গুণের পর মান্দালয়ই ব্রহ্মদেশের শ্রেষ্ঠ নগর এবং ইহা খাস বর্ম্মীদের সহর। রেঙ্গুণে ছত্রিশ জাতির বাস, উহাকে একমাত্র বর্ম্মীদের সহর বলা চলে না। মান্দালয় উত্তর ব্রহ্মের রাজধানী ছিল, ইহা অপেক্ষাকৃত পুরাণো এবং উত্তর ব্রহ্মের নৃপতিগণের ইহা প্রধান নগর ছিল। রাজদরবারের জাঁকজমক ইহার গর্ব্ব ছিল। বর্ম্মীরা সাধারণতঃই বিলাসী, উৎকৃষ্ট রেশমী বস্ত্রের বেশভূষা তাঁহাদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য। এজন্য মান্দালয়ে দেশীয় রেশমের ব্যবসায় এককালে যথেষ্ট সমৃদ্ধিশালী ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে উত্তর ব্রহ্ম ইংরাজের দখলে যায়, আর আজ তাহা জাপানীরা কাড়িয়া লইল! প্রচণ্ড বোমাবর্ষণের দ্বারা মান্দালয় ইতিপূর্ব্বেই ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। মান্দালয়ের পর উত্তর ব্রহ্মের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সহর ভামো বাকি রহিল। ইহা চীন সীমান্ত হইতে মাত্র ২০ মাইল দূরে।

মান্দালয়কে আমরা বর্ত্তমানে উত্তর ব্রহ্মের জাপানী অগ্রগতির প্রধান ভিত্তিভূমি বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি। এই সহর জাপানীদের হাতে যাওয়ায় ইঙ্গ-ভারতীয় ও চীনবাহিনীগণ যথেষ্ট বেকায়দায় পড়িবে। কাহারও কাহারও অনুমান যে, মিত্রপক্ষের সৈন্যরা হয়তো ভারত সীমান্তের দিকে পশ্চাদপসরণ করিবে। আবার 'রয়টারে'র মতে বৃটিশবাহিনীর অবস্থা গুরুতর। কারণ, জাপানীরা মান্দালয় হইতে ভামোর দিকে লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইবে এবং তাহার ফলে বৃটিশবাহিনীর বাম পার্শ্ব বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িতে পারে। অপর পক্ষে তাহারা ইরাবতী নদী পার হইয়া এবং কিঞ্চিৎ ঘুরিয়া গিয়া বৃটিশ

বাহিনীর দক্ষিণ পার্শ্বও বিপন্ন করিতে পারে। মানচিত্রের দিকে তাকাইলে বুঝা যাইবে যে, মান্দালয় হইতে বামে ও দক্ষিণে দুইটি জাপানী বাহু ভামো সহরে চীন-ব্রহ্ম সীমান্তের নিকট মিলিত হইতে চাহিতেছে। যদি বৃটিশবাহিনী মান্দালয়ের অদূরবর্ত্তী ইরাবতীর তীরে দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে জাপানীরা উহার দুইদিকে বাহু বাড়াইয়া এই বাহিনীকে বেষ্টন করিতে চাহিবে। এই অবস্থাটা সামরিক দিক হইতে নিশ্চয়ই গুরুত্বব্যঞ্জক। এই অবস্থায় বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যদল গরিলা যুদ্ধের কৌশল অবলম্বন করিবে কিনা, তাহাও উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ, এই বেষ্টনী ভাঙ্গিতে না পারিলে মিত্রবাহিনীর পক্ষে উদ্বেগজনক সমস্যা দেখা দিবে। মান্দালয় ও লাসিওর পতনের পর রণকৌশলের আর একটি চমৎকার অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছে। জাপানীরা শান রাজ্য ভেদ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। এদিকে চীনা সৈন্যেরা দক্ষিণে অগ্রসর হইয়া জাপানীদের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিতে চাহিয়াছিল। চীনা সৈন্যেরা এখনও দক্ষিণ দিকের সেই টাউংজিতে অবস্থান করিতেছে। লয়লেম ও টাউংজির মধ্যে জাপানীদের সঙ্গে প্রবল সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে এবং চীনারা টাউংজি দখল করিয়া রাখিয়াছে। মান্দালয় হইতে সোজা দক্ষিণে থাজী এবং থাজী হইতে পূর্ব্ব দিকে টাউংজি। যদি চীনারা টাউংজিতে তিষ্ঠিতে পারে এবং যদি প্রভূত শক্তি লইয়া প্রচণ্ডবেগে জাপানীদিগকে আক্রমণ করিতে পারে, তাহা হইলে রণনীতির দিক হইতে অত্যন্ত কৌতূহলজনক অবস্থার সৃষ্টি হইবে। কারণ, চীনারা এখানে সাফল্যের সহিত যুদ্ধ চালাইতে পারিলে উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্মের জাপ সৈন্যদলের মধ্যে যোগাযোগ ছিন্ন হইয়া যাইবে। ভৌগোলিক অবস্থার জন্য এই অঞ্চলে স্বাভাবিক কারণেই যোগাযোগ রক্ষা করা কঠিন
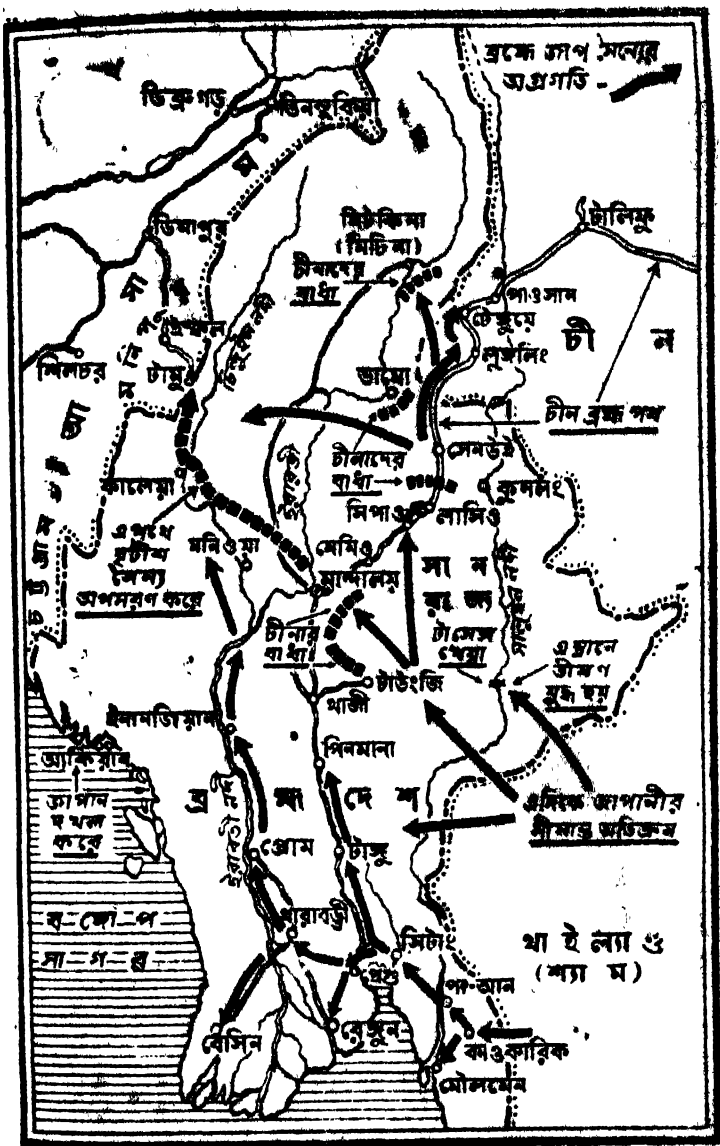
ব্যাপার। পদাতিক ও যান্ত্রিক, উভয় বাহিনীর পক্ষে রসদ ও পেট্রোলের দরকার। চীনারা যদি এখানে কুতিত্বের সহিত যোগসূত্র ছিন্ন করিয়া দিতে এবং এই ঘাঁটি আগলাইয়া রাখিতে পারে, তাহা হইলে জাপানীরা বেকায়দায় পড়িবে। অর্থাৎ মিত্রবাহিনী মান্দালয়ের উত্তরে যে ধরণের সমস্যায় পড়িয়াছে, জাপবাহিনী এই দক্ষিণবর্ত্তী অঞ্চলে তেমন সমস্যায় পড়িতে পারে। অবশ্য শেষ পর্য্যন্ত ইহা উভয় পক্ষের সমরশক্তির উপর নির্ভর করিবে।

উত্তর ব্রহ্মের মান্দালয়কে ভিত্তি করিয়া জাপানী বাহিনী যে কোন তিন দিকে অগ্রসর হইতে পারে। লাসিওর পথ ধরিয়া চীনের দিকে —চীন ও ব্রহ্মের সীমানায় যে সমস্ত সহর আছে, একে একে সেগুলি তাহারা আক্রমণ করিতে পারে। মান্দালয় হইতে মিট্‌কিয়ানা পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে, সেই রেলপথ ও ইরাবতীর ধার ধরিয়া ফোর্ট হ্যারিসন; মিট্‌কিয়ানা ও ভামো পর্য্যন্ত জাপানীরা হয়তো অগ্রসর হইবে। খুব সম্ভবতঃ তাহারা চীনকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য ব্রহ্ম-চীন সীমান্তের এই গোটা অংশটাই দখল করিবে। ইহা ছাড়া তাহারা মিট্‌কিয়ানার পশ্চিমে মগাউং হইতে মেইংকোয়াং হইয়া একেবারে আসামের সীমানা, অর্থাৎ তিনসুকিয়া, ডিগবয় ইত্যাদির দিকে যাইতে পারে কিম্বা তাহারা চিন্দুইন নদীর তীর ধরিয়া মণিপুরের দিকেও যাইতে পারে। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশ হইতে হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী যেপথ ধরিয়া মণিপুরের ইম্ফল পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, জাপানীরা অতঃপর সেদিকেও নজর দিতে পারে। অবশ্য ইহা অনুমানের কথা। তবে, কার্য্যতঃ তাহারা লাসিও অতিক্রম করিয়া চীন-ব্রহ্ম রাস্তার ২৫ মাইল অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহারা যে চীন ও ব্রহ্মদেশকে বিচ্ছিন্ন করিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। তবে, ভারতবর্ষের

দিকে অবিলম্বে অভিযান করিবে কি না—জলপথে চট্টগ্রাম বা স্থলপথে আসামের দিকে যাইবে কি না, তাহা বলা শক্ত। আরাকান হইতে বোমাবর্ষণের সংবাদ আসিয়াছে। সুতরাং চট্টগ্রাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত বোধ করিবার কারণ নাই। কর্তৃপক্ষীয় মহল হইতে ভরসা দেওয়া হইয়াছে যে, জাপানীরা ব্রহ্মের নানাস্থানে অগ্রসর হইলেও তাহারা সামরিক দিক হইতে মূল্যবান কোন সম্পদ পায় নাই। সড়ক ও সেতু ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। পোড়া মাটির নীতি অনুসৃত হইয়াছে এবং মধ্যব্রহ্মের পশ্চিম অঞ্চলের সমস্ত তৈলখনির সাজসরঞ্জাম ও কারখানা নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই পশ্চিম অঞ্চলের খনিগুলি হইতে বার্ষিক ১০ লক্ষ গ্যালন তৈল উৎপন্ন হইত। এগুলি যাহাতে শত্রুর হাতে না পড়ে, তেমন ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তবে একথা সত্য যে, এই সমস্ত খনি নষ্ট হওয়া মিত্রশক্তির পক্ষেও ক্ষতিজনক, যদিও তাহাদের পেট্রোলের কোন অভাব নাই। উত্তর ব্রহ্মের যুদ্ধ ক্রমশঃ শেষ হইয়া আসিতেছে এবং সেই সঙ্গে ভারতবর্ষের ভাগ্যও ক্রমশঃ অন্ধকার হইতেছে।

সপ্তম অধ্যায়

—:*:—

(১৪)

ব্রহ্ম যুদ্ধের অবসান

৩০শে মে, '৪২।

একদিকে সিটাং ও ইরাবতী নদীর যুদ্ধে বিপর্যয় এবং অন্যদিকে লাসিও ও মান্দালয়ের পতনের পর ব্রহ্মদেশে মিত্রবাহিনীর সংগ্রাম চালাইবার আর কোন সুযোগ রহিল না। কোনও দেশের যদি প্রাণকেন্দ্রগুলি দ্রুত হাতছাড়া হইয়া যায়, তাহা হইলে সেই দেশের অভ্যন্তরভাগে দাঁড়াইয়া নিয়মিত যুদ্ধ চালনা আর সম্ভব হয় না। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণতঃ গরিলা যুদ্ধই চলিতে পারে। কিন্তু গরিলা যুদ্ধের কোন ব্যবস্থা ব্রহ্মদেশীয় গবর্ণমেণ্ট বা সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ করেন নাই। সুতরাং উত্তর ব্রহ্মের লাসিও ও মান্দালয়ের পতনের পরেই কার্য্যতঃ ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হয়। মান্দালয় দখলের পর জাপানীরা

জেনারেল আলেকজেণ্ডারের বাহিনীকে ঘিরিয়া ধরিতে চাহিয়াছিল। কিন্তু বৃটিশপক্ষ সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ সম্পর্কে পূর্ব্বাহ্নেই সচেতন থাকায় তাঁহারা জাপ-বেষ্টন-নীতি এড়াইয়া ভারতবর্ষে পৌছিতে পারিয়াছিলেন। জেনারেল আলেকজেণ্ডার এবং জেনারেল ষ্টিল-ওয়েল মে মাসের শেষের দিকে নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। জেনারেল আলেকজেণ্ডারের অধীন ইঙ্গ-ভারতীয় সৈন্যদল চিন্দুইন নদীর উপত্যকা ধরিয়া আসাম-ব্রহ্ম সীমান্তের দিকে হটিতে থাকে। চিন্দুইন ও ব্রহ্ম সীমান্ত হইতে আসামের মণিপুর অভিমুখে যে রাস্তার যোগাযোগ রহিয়াছে, মিত্রপক্ষের সৈন্যদল প্রধানতঃ সেই পথ ধরিয়াই ব্রহ্ম রণাঙ্গন হইতে পশ্চাদপসরণ করে। অপর পক্ষে ব্রহ্মদেশরক্ষী চীনা সৈন্যেরা ক্রমশঃ চীন-ব্রহ্ম রাস্তা হইতে ইউনান প্রদেশের দিকে হটিতে আরম্ভ করে। ব্রহ্মযুদ্ধের পর জাপানীরা ইউনানের দিকে মনোনিবেশ করে।

২৮শে মে তারিখ নয়াদিল্লী হইতে ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল ঘোষণা করেন যে, আপাততঃ ব্রহ্মযুদ্ধের অবসান হইল। কি কারণে ব্রহ্মদেশের যুদ্ধে মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদলকে এই দুর্ভাগ্য বরণ করিতে হইল সে সম্পর্কে জেনারেল ওয়াভেলের ঘোষণা হইতে কিছু কিছু উল্লেখ করা যাইতে পারে। তাঁহার মতে—"ভারত হইতে ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত যদি বর্ত্তমান মূহূর্ত্তে এমন কোন উৎকৃষ্ট রাস্তা থাকিত, যাহা বর্ষার বারিধারা সহ্য করিয়া টিকিয়া থাকিতে পারে, তাহা হইলে শত্রুকে ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরভাগে ঠেকাইয়া না রাখিবার কোনই কারণ ছিল না। সেবোর দক্ষিণে আমাদের অগ্রবর্ত্তী ব্যূহের সেনাদলের যখন বেষ্টিত হইবার আশঙ্কা দেখা দিয়াছিল, তখন তাহারা সেই বিপদ হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারিয়াছিল। ইহা দ্বারাই

বুঝা যায় যে, শত্রুর আক্রমণে বাধ্য হইয়া পশ্চাদপসরণ করিতে হয় নাই। এখন বর্ষা আরম্ভ হইবার বাকী নাই অথচ ভারত হইতে ব্রহ্ম পর্য্যন্ত সরবরাহের পথটিও আমরা যথাসময়ে সম্পূর্ণ করিয়া উঠিতে পারি নাই। এই পথটি উৎকৃষ্ট সামরিক রাস্তার অনুপযোগী,—ইহা গিয়াছে পাহাড় ও জঙ্গলের ভিতর দিয়া। বর্ষার জল ঠেকাইবার উপযোগী করিয়া ইহাকে নির্ম্মাণ করা যায় নাই। সেজন্য ব্রহ্ম রণাঙ্গনের সেনাদলের চাপ হ্রাস করিবার জন্য নূতন নূতন সৈন্যদল প্রেরণ করা সম্ভব ছিল না। এই কারণেই সেনাবাহিনীকে ভারতবর্ষের দিকে দ্রুত পশ্চাদপসরণ করিতে হয়। এই পশ্চাদপসরণ করিতে গিয়া সময়ের সহিত পাল্লা দিতে হইয়াছে। কারণ, বর্ষা যদি একবার নামিয়া যাইত তাহা হইলে ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরভাগের কতকগুলি রাস্তা চলাচলের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর হইয়া উঠিত। ভারতবর্ষ হইতে যেসকল বৃটিশ ও ভারতীয় সৈন্যকে ব্রহ্মদেশে পাঠান হইয়াছিল, তাহাদের পাঁচভাগের চারিভাগই নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে ফিরিয়া আসিতে পারিয়াছে। ব্রহ্মদেশে আমাদের সৈন্যের সংখ্যা কখনও খুব বেশী পরিমাণ ছিল না। জেনারেল আলেকজেণ্ডারের অধীন যুধ্যমান সৈন্যগণ দুইটি ছোট ডিভিসন কিংবা একটি বড় ডিভিসনের অধিক ছিল না। ইহার তুলনায় শত্রু সৈন্য সংখ্যায় অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল।

"মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদিগকে প্রভূত পরিমাণ যান ও ট্যাঙ্ক ফেলিয়া আসিতে হইয়াছে। অবশ্য শত্রুর আক্রমণের ফলেই এরূপ করিতে হইয়াছে, এমন নহে। চিন্দুইন নদীতে হঠাৎ বান ডাকাতেই এরূপ করিতে হইয়াছে। এজন্য কয়েকটি মাত্র ফেরী ষ্টীমার পাওয়া গিয়াছিল। কিন্তু সেগুলির সাহায্যে ভারী ভারী জিনিষ পার করা অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। চিন্দুইনের খরস্রোত ধরিয়া নদী পার হওয়া অত্যন্ত সময়সাপেক্ষ। এদিকে বর্ষা

আসিয়া পড়িল। সেজন্ত স্থির হয় যে, যে সকল ট্যাঙ্ক ও যান পার করা সম্ভব নহে সেগুলি পরিত্যাগ করিয়া আসা হইবে। ব্রহ্মদেশের যুদ্ধ নানাদিক দিয়া নিরুৎসাহ ও নৈরাশ্যব্যঞ্জক হইয়াছে। ইহার একটি বড় কারণ ভৌগোলিক অসুবিধা। ব্রহ্মদেশে প্রবেশের একটিমাত্র পথ ছিল এবং জাপানীরা যখন আমাদের নিকট হইতে সমুদ্রের উপর আধিপত্য কাড়িয়া লয়, তখন হইতেই রেঙ্গুণ রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। নিম্ন-ব্রহ্ম ও রেঙ্গুণ আরও কিছুকাল আমরা হাতে রাখিতে পারিতাম, কিন্তু ফেব্রুয়ারীর শেষভাগে সিটাং নদীর যুদ্ধে আমাদের পরাজয়ের ফলে উহা সম্ভব হয় নাই। ব্রহ্মের সমগ্র সংগ্রামের মধ্যে জাপানীদের হাতে ইহাই আমাদের একমাত্র প্রকৃত পরাজয়। এই যুদ্ধে আমাদের প্রভূত ক্ষতি হয় এবং আমাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। বাকী সমস্ত সামরিক কার্য্যকলাপকে অনেকটা পৃষ্ঠরক্ষার কার্য্য বা rearguard action বলা যাইতে পারে। সিটাংয়ের যুদ্ধে আমাদের দুইটি সেনাদলের অধিকাংশই বিনষ্ট হয় এবং নিম্ন-ব্রহ্মের ভাগ্য চূড়ান্তরূপে নির্ণীত হয়। সমুদ্রে আধিপত্য হারাইয়া আমরা স্থায়ীভাবে রেঙ্গুণ রক্ষা করিতে পারিতাম না। রেঙ্গুণ হাতছাড়া হইবার পর একমাত্র ব্রহ্ম-আসাম পথ ছাড়া ব্রহ্মদেশে কোন সৈন্য আমদানী সম্ভব ছিল না। বিমানযোগে অবশ্য কিছু প্রয়োজন মিটান যাইত, কিন্তু তাহাও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। জাপানীরা খুব উন্নত মানুষ বা অদ্ভুত সৈন্য নহে। তবে, তাহাদের সৈন্যরা নিঃসন্দেহে অধিকতর শিক্ষাপ্রাপ্ত, বিশেষতঃ মালয় ও ব্রহ্মে যে ধরণের যুদ্ধ হইয়াছে, সেই যুদ্ধের তাহারা উপযুক্ত শিক্ষাপ্রাপ্ত। আর মিত্রপক্ষীয়দিগকে ইউরোপে, ইংলণ্ডে ও মধ্য প্রাচ্যের উন্মুক্ত প্রান্তরে এবং ব্রহ্ম ও মালয়ের জঙ্গলে বিভিন্ন ধরণের যুদ্ধে একই সময়ে সৈন্য নিয়োগ করিতে হইয়াছে। কাজেই তাহাদিগকে

সম্পূর্ণরূপে শিক্ষিত করিয়া রণক্ষেত্রে প্রেরণ করা কম সমস্যা ছিল না। তবে, আমরা এক্ষণে সকল রকম অভিজ্ঞতা হইতেই শিক্ষা পাইয়াছি এবং সেই শিক্ষা ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই কাজে লাগিবে।"

ব্রহ্মযুদ্ধ সম্পর্কে জেনারেল ওয়াভেলের এই বিবৃতি ছাড়া আরও বহু পদস্থ সেনানী ও ব্যক্তিগণের বিবৃতি বাহির হইয়াছে। জেনারেল ষ্টীলওয়েল, জেনারেল আলেকজেণ্ডার ও "ডেলী টেলিগ্রাফ" পত্রের বিশেষ সংবাদদাতা প্রভৃতি যে সমস্ত বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে কোন কোন ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী মতামত প্রকাশিত হইয়া থাকিলেও মোটামুটি পরাজয়ের কারণগুলি স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে।

এই কারণগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় যে, (১) জাপানের বিরুদ্ধে এত বড় যুদ্ধের জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট ও মিত্রপক্ষ পূর্ব্বাহ্নে প্রস্তুত ছিলেন না। হংকং হইতে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত এত বড় সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের আয়োজন জাপান বহুদিন হইতে প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছে এবং একদা অতর্কিতে তাহারা এই বিপুল রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িবে এমন নিশ্চিত বিশ্বাস বড়কর্ত্তাদের ছিল না। ফলে, জাপান যতখানি শক্তি ও আয়োজন লইয়া রণাঙ্গনে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিয়াছে মিত্রপক্ষ তাহা পারেন নাই। মোটামুটিভাবে এই অবস্থাটাই সর্ব্বত্র ভাগ্যবিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে। এই অবস্থারই ফলস্বরূপ, (২) ব্রহ্ম বা মালয়ের যুদ্ধে জাপানী বিমানশক্তির সহিত মিত্রপক্ষ পাল্লা দিতে পারেন নাই। আধুনিক যুদ্ধে বিমান ও ট্যাঙ্ক সর্ব্বাগ্রগণ্য। ট্যাঙ্কের ব্যবহার কোন পক্ষেই ব্যাপক আকারে হয় নাই। কিন্তু গোড়া হইতেই জাপানীরা প্রচুর পরিমাণ বিমান ব্যবহার করিয়াছিল, এই বিমান ব্রহ্মদেশের আকাশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। যদি কোন পক্ষের বিমানশক্তি আকাশে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে, তবে

মাটিতে অবস্থানকারী সৈন্যদলের যুদ্ধাভিযান অত্যন্ত বিপজ্জনক হইয়া পড়ে। কারণ, উপর হইতে নিরন্তর বোমাবর্ষণের ফলে সৈন্যদলের পক্ষে লড়াই করা একটা প্রকাণ্ড সমস্যার মত দেখা দেয়। আধুনিক যুদ্ধ বিমানের উপর নির্ভরশীল হওয়ায় মিত্রবাহিনী গোড়া হইতেই অসুবিধায় পড়িয়াছিল। (৩) সংখ্যার দিক দিয়াও মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। মাত্র কয়েক ডিভিসন সৈন্য ব্রহ্ম যুদ্ধে নিয়োজিত হইয়াছিল। কিন্তু জাপানীদের সৈন্যসংখ্যা অনেক বেশী এবং অনেক প্রবল ছিল। সাধারণ রণধর্ম্মানুসারে বলা যায় যে, উভয় পক্ষের সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রসজ্জা সমান না হইলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চালানো কঠিন। সংখ্যাশক্তি সমান হইলে এবং রণপটুতা পরস্পরের নিতান্ত কমবেশী না হইলে যুদ্ধ দীর্ঘকাল চলিতে পারে, যেমন চলিতেছে বর্ত্তমান রাশিয়ায়। কিন্তু আক্রমণকারী যদি সৈন্য ও অস্ত্রের সংখ্যায় দ্বিগুণ তিনগুণ বেশী হইয়া থাকে, তবে, কেবলমাত্র সংখ্যাশক্তির জোরেই অনেক সময় তাহাদের জয় ঘটিয়া থাকে। ব্রহ্ম যুদ্ধে জাপানীদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। (৪) একই সৈন্যদল দিনের পর দিন ও মাসের পর মাস ব্রহ্মদেশে যুদ্ধ চালাইতে বাধ্য হইয়াছে। তাহারা তেমন কোন বিশ্রাম পায় নাই। এই অক্লান্ত একটানা যুদ্ধ যে কোন বাহিনীর স্নায়ু ও শিরার পক্ষে পীড়াদায়ক। তথাপি বিস্ময়ের কথা এই যে, মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা প্রতিদিন অক্লান্ত যুদ্ধ চালাইয়াও সাফল্যের সহিত সুস্থ শরীরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিয়াছে। সাধারণতঃ সৈন্য সংখ্যায় ঘাটতি পড়িলে এবং সৈন্যদল ক্লান্ত হইলে নূতন নূতন সৈন্য আমদানী করিয়া ক্ষয় ও ক্লান্তি পূরণ করা হয়। কিন্তু ব্রহ্মদেশে নূতন নূতন সৈন্যদল পাঠানো সম্ভব হয় নাই। ইহার সর্ব্বপ্রধান কারণ, (৫) ব্রহ্ম ও ভারতবর্ষের মধ্যে উপযুক্ত রাস্তা ও যোগাযোগের অভাব।

ব্রহ্মদেশের সহিত প্রধানতঃ ভারতবর্ষের জলপথের সংযোগ ছিল। কিন্তু সিঙ্গাপুরের পতনের পর এই জলপথ বিপন্ন হইয়া পড়ে। ইহার সঙ্গে মিত্রপক্ষের নৌবহর ও বিমানবহরের ঘাটতি পড়ায় এবং উপযুক্ত ঘাঁটিগুলি হাতছাড়া হওয়ায় জলপথের যোগাযোগ নষ্ট হইয়া যায়। রেঙ্গুণের পতনের পর এই অবস্থা আরও শোচনীয় রূপ ধারণ করে। তখন কার্য্যতঃ ব্রহ্মদেশের সহিত সমুদ্রপথের সংযোগ সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হইয়া যায়। ফলে, জাহাজযোগে কোন নূতন সৈন্য ও অস্ত্র পাঠানো সম্ভব হয় নাই। একমাত্র উপায় ছিল স্থলপথ। কিন্তু স্থলপথেও ব্রহ্মদেশ ও আসামের মধ্যে কোন রেলপথ ছিল না। এই রেলপথ নির্ম্মাণের পরিকল্পনার গুজব মাঝে মাঝে আমরা শুনিয়াছি, কিন্তু কার্য্যতঃ কোন রেলপথই তৈয়ার হয় নাই। রেল বা ষ্টীমার ছাড়া বৃহৎ সৈন্যদল ও ভারী সামরিক দ্রব্য পাঠানো অসুবিধাব্যঞ্জক। যুদ্ধের জরুরী অবস্থার প্রয়োজনে পড়িয়া যে রাস্তা তৈয়ার হইয়াছে, তাহা বৃহৎ অভিযানের উপযোগী নহে। গভীর অরণ্য, দুর্গম পর্ব্বত ও বন্ধুর ভূমি দিয়া যে রাস্তা আসাম হইতে ব্রহ্মদেশের সহিত মিলিয়াছে, তাহা সামরিক প্রয়োজনের দিক হইতে খুব উৎকৃষ্ট নহে। সম্ভবতঃ এই রাস্তা ধরিয়া কোনওক্রমে পালাইয়া আসা যায়, কিন্তু বৃহৎ অভিযান চালানো যায় না। ফলে, ব্রহ্মদেশের সংগ্রামে যখন সৈন্য ও অস্ত্রের জরুরী প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল, তখন যথোপযুক্তভাবে উহা সরবরাহ করা যায় নাই।

(৬) ব্রহ্মের ভৌগোলিক অবস্থাও মিত্রপক্ষের অসুবিধা ঘটাইয়াছে। উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত লম্বালম্বিভাবে প্রবাহিত দীর্ঘ নদী, উঁচু পাহাড় ও দুর্গম অরণ্য আক্রমণকারীর পক্ষে বিঘ্ন ও আত্মরক্ষার দিক হইতে সুবিধাজনক হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিঘ্নগুলি তখনই আত্মরক্ষার পক্ষে সহায়ক হইয়া থাকে, যখন শত্রুকে বাধা দেওয়ার মত উপযুক্ত

সৈন্যবল, অস্ত্রবল ও যন্ত্রবলের এবং রণনীতি ও রণকৌশলের সংযোগ ঘটিয়া থাকে। আসলে ব্রহ্মের যুদ্ধে হীনবল মিত্রশক্তি লড়াইয়ের দিক হইতেই দুর্ব্বল ছিল। সুতরাং উৎকৃষ্ট রাস্তাঘাটের অভাব, দীর্ঘ নদী এবং পাহাড় ও জঙ্গল ইত্যাদি পাল্টা আত্মরক্ষার পক্ষে প্রবলতর বিঘ্নরূপে দেখা দিয়াছিল। প্রাকৃতিক বিঘ্ন সৈন্যেরা তখনই ভালোভাবে কাজে লাগাইতে পারে, যখন সৈন্যদলের সংগ্রামশক্তি আক্রমণকারীর তুলনায় অন্ততঃ সমান থাকে। কিন্তু বিপরীত অবস্থায় এই প্রাকৃতিক বিঘ্নই অধিকতর বিপদ ডাকিয়া আনে। ব্রহ্মের সংগ্রামেও তাহাই ঘটিয়াছে। (৭) জাপানীদের আয়োজন বৃহৎ ও ব্যাপক ছিল এবং মালয় ও ব্রহ্মদেশের ভৌগোলিক অবস্থার উপযোগী অভিজ্ঞতা সৈন্যদলের ছিল। ক্রমাগত বৎসরের পর বৎসর চীনের দুর্গম অঞ্চলে যুদ্ধ চালাইয়া অরণ্য, নদী ও পর্ব্বতবহুল স্থানের রণকৌশলে জাপানীরা দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছে। কুমীর, সাপ, বা হাতী ইত্যাদি জন্তু-জীবগুলিকে জাপানীরা অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছে এবং হাতীগুলিকে তাহারা সময় সময় কাজেও লাগাইতে পারিয়াছে। সামান্য আহার ও সামান্য পোষাকে সর্পসঙ্কুল কণ্টকাকীর্ণ অরণ্যে তাহারা বেপরোয়া যুদ্ধনীতি অনুসরণ করিয়াছে। ইহার অর্থ এই নহে যে, মিত্রপক্ষের সৈন্যেরা কম সাহসী ছিল। বরং মিত্রপক্ষীয় সৈন্যদের বীরত্ব কাহিনী, বিশেষভাবে ঘেরাও হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও তাহারা যেভাবে শত্রুকে ফাঁকি দিয়া সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ করিতে পারিয়াছে, তাহা মিত্রপক্ষের সেনানীমণ্ডলের প্রশংসাই অর্জ্জন করিয়াছে। তথাপি মিত্রবাহিনীর ভাগ্যবিপর্য্যয় ঘটিয়াছে জাপানীদের সংখ্যাশক্তির শ্রেষ্ঠতা এবং সেই সঙ্গে অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্যের জন্য। (৮) রাজনৈতিক কারণও উল্লেখযোগ্য। মালয় ও ব্রহ্মদেশে জনসাধারণের

মধ্যে যুদ্ধযাত্রায় উৎসাহ ছিল না। বৃটিশ সরকারের রাষ্ট্রনীতি ব্রহ্মদেশের বহু লোকের মনে ক্ষোভ ও অসন্তোষ সৃষ্টি করিয়াছিল। এই কারণে জনসাধারণের মধ্যে যুদ্ধজয়ের বাসনা প্রবল ছিল না। জাপানীরা ব্রহ্মদেশের এই রাজনৈতিক অসন্তোষের সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা করিয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের ইহা একটি অপরিহার্য্য অঙ্গ। আধুনিক কালে কেবল সৈন্য ও সেনাপতিগণই যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারে না; সমগ্র দেশবাসীর প্রত্যেকটি লোকের স্বেচ্ছাকৃত আন্তরিক সহযোগিতা যুদ্ধের পিছনে থাকা চাই। ইহার অভাব ঘটিলে সমরায়োজনে বিঘ্ন ঘটিবে। ব্রহ্মযুদ্ধের এই তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে যদি ভারতবর্ষ ও ইংলণ্ডের বড় কর্ত্তাগণ উপযুক্ত শিক্ষালাভ করেন এবং সমরনীতিকে রাজনীতির আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠা দিয়া সমগ্র রাষ্ট্রিক কাঠামোর পরিবর্ত্তন, পরিবর্জ্জন ও সংশোধন করেন, তাহা হইলেই এই ভাগ্যবিপর্য্যয়ের সার্থকতা। ব্যর্থতা হইতেই মানুষ সাফল্যের শিক্ষা পায়, অন্ততঃ বুদ্ধিমান মানুষ সেই শিক্ষাই গ্রহণ করে।

অষ্টম অধ্যায়

—:*:—

ভারতবর্ষ অভিমুখে

(১)

সিংহলে আক্রমণ

৬ই এপ্রিল, '৪২।

[ব্রহ্মদেশে জাপানীদের ক্রমবিস্তার ও অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষের জলপথ ও আকাশপথও যে ক্রমশঃ বিপন্ন হইতেছে, এই তথ্য এপ্রিল মাসে একান্তরূপে স্পষ্ট হইয়া উঠিল। প্রশান্ত মহাসমুদ্র ও ভারত মহাসমুদ্রের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য নৌঘাটি জাপানীদের হাতে যাওয়ায় জাপ নৌবহরের পক্ষে ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হইল। ব্রহ্মদেশের পর জলপথে ও আকাশ পথে যে কোনদিন ভারতবর্ষ আক্রান্ত হইতে পারে, এমন সম্ভাবনার জন্য ভারতবর্ষের কর্তৃপক্ষ এবং জনসাধারণ ক্রমশঃ প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। সিংহলে জাপানীদের বিমান আক্রমণ ভারতবর্ষের জলপথে জাপ অভিযানের প্রথম ইঙ্গিতস্বরূপ।]

সিংহলে কয়েকদিন বিমান আক্রমণের সতর্কতা ধ্বনির পর অবশেষে গত ৫ই এপ্রিল সকাল বেলা সত্য সত্যই জাপানীরা বোমা বর্ষণ করিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে জাপানীদের এই বোমারু অভিযান সাফল্য-মণ্ডিত হয় নাই। সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, মোট ৭৫ খানা জাপ বিমান সিংহলে হানা দিয়াছিল। তাহারা পোতাশ্রয়ে ও রাতমালানায় ছোঁমারা বিমান হইতে বোমা ও রাস্তার উপর মেসিন-গানের গুলী বর্ষণ করিয়াছিল। হতাহত ও ক্ষতির পরিমাণ সামান্য। হাসপাতালের উপর বোমাবর্ষণের ফলে কয়েকজন রোগী মারা গিয়াছে। ইহা যুদ্ধনীতির বিপরীত ধর্ম্ম এবং জাপ ক্রূরতার পরিচায়ক। সিংহলের বিমান আক্রমণে জাপানীদের ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর*—২৫ খানা জাপ বিমান জঙ্গী-বিমানের দ্বারা নিশ্চিতরূপে ধ্বংস হইয়াছে, ২ খানা বিমান-মারা কামানের দ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে। আরও ৫ খানা সম্ভবতঃ মারা পড়িয়াছে এবং আরও ২৫ খানা জখম হইয়াছে। সিংহলের প্রধান সেনাপতি স্যার জিওফ্রে লেটন বলিয়াছেন যে, জাপ বিমানবাহী জাহাজ হইতেই এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং যে ২৫ খানা বিমান জখম হইয়াছে, সেগুলি সম্ভবতঃ তাহাদের নিজস্ব ঘাঁটিতে ফিরিয়া যাইতে পারে নাই। ৭৫ খানার মধ্যে মোট ৫৭ খানা জাপ বিমান ধ্বংস, জখম বা ঘায়েল হইয়াছে। মিত্রপক্ষীয় বিমানবহরের পক্ষে ইহা নিশ্চয়ই যথেষ্ট কৃতিত্ব ও জনসাধারণের পক্ষে আশা ও আনন্দের কথা। জাপানীদিগকে যদি এই হারে মালয়ে ও ব্রহ্মদেশে বাধা দেওয়া যাইত, তবে, এত দ্রুত তাহারা ভারতের পূর্ব্ব বহির্দ্বার অতিক্রম করিয়া দূরবর্ত্তী সিংহলে পৌঁছিতে পারিত না। জাপানীদের এই যুদ্ধে জাহাজ

* কয়েক দিন পরে কমন্স সভায় মিঃ চার্চ্চিলের বিবৃতিতে জানা গিয়াছে যে, মিত্র-পক্ষেরও ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর।

ও বিমানই প্রধান সম্বল এবং দুর্ভাগ্যক্রমে মিত্রশক্তিপুঞ্জ এই দুইদিক দিয়াই বর্ত্তমানে হীনবল। সিংহলে যেভাবে জাপ বিমানবহরকে প্রতিরোধ করা হইয়াছে, আত্মরক্ষার দিক হইতে তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। জঙ্গীবিমান ও বিমানমারা কামানের প্রাচুর্য্য থাকিলে জাপানীরা এত শীঘ্র ব্যাপক জয়লাভ করিতে পারিত না। ৪।৫ দিন আগে আন্দামান দ্বীপের পোর্ট ব্লেয়ারেও মার্কিণ বিমানবহর একটি ক্ষুদ্র জাপ নৌবহরের উপর চমৎকার আক্রমণ চালাইয়া নৌবহরকে ঘায়েল করিয়াছে। এই সমস্তই সুসংবাদ। সোজা কোন স্থলপথের ঘাঁটি হইতে কলিকাতা, কলম্বো, মাদ্রাজ বা বোম্বাইয়ের উপর জাপ বিমানবহর আক্রমণ চালাইবার সুবিধা পাইবে না। তাহাদের পক্ষে বিমানবাহী জাহাজ হইতেই আক্রমণ চালানো সম্ভব—একথা অনেকবার আলোচিত হইয়াছে। সিংহলে জাপানীদের জাহাজ হইতে বিমান আক্রমণ সেই সম্ভাবনাকেই নিকটতর করিয়া আনিতেছে।

অকস্মাৎ সিংহলে জাপানীদের এই উৎপাতের উদ্দেশ্য কি? জাপানীরা নৌবলপ্রধান জাতি এবং ইহার সঙ্গে তাহারা বিমানশক্তি ও আধুনিক যুদ্ধের অন্যান্য উপকরণও প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছে। তাহারা দুইটি নৌবলপ্রধান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতেছে—বৃটেন ও আমেরিকা। বর্ত্তমানে প্রাচ্যখণ্ডে বৃটেনের নৌশক্তি দুর্ব্বল এবং আমেরিকার নৌবল এখনও এদিকের সমুদ্রে সংহত হয় নাই। সুতরাং আঘাত হানিবার ও অগ্রসর হইবার পক্ষে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তই জাপানের স্বর্ণসুযোগ। মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে জাপ রণ-নীতির একটা বৈশিষ্ট্য ধরা পড়িবে। তাহারা চীন, ইন্দোচীন, মালয়, ব্রহ্মদেশ ইত্যাদি বহুদূর বিস্তৃত রাজ্যগুলির সমুদ্রোপকূল প্রথমে দখল করিয়াছে এবং তারপর স্থলভাগের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছে।

সাংহাই, হংকং, সিঙ্গাপুর, পেনাং, রেঙ্গুণ ইত্যাদি প্রত্যেকটি সমুদ্রতীরস্থ বড় বড় নৌঘাঁটি ও বন্দর জাপানীরা কাড়িয়া লইয়াছে। যাহাতে প্রশান্ত মহাসাগর ও ভারত মহাসাগরের দীর্ঘ জলপথ জাপানীদের প্রভুত্বের মধ্যে থাকে, এজন্য নৌঘাঁটিগুলিই জাপানী আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হইতেছে। ইহা দ্বারা একদিকে যেমন মহাসমুদ্রের উপর জাপ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইবে, তেমনি মিত্রপক্ষের সরবরাহ ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত হইবে। পোতাশ্রয় ও নৌঘাঁটি ছাড়া কোন নৌবহরই সংগ্রাম করিতে পারে না। ভবিষ্যতে ইঙ্গ-মার্কিণ নৌবহর যাহাতে জাপানী নৌশক্তিকে সহজে পাল্টা-আক্রমণ করিতে না পারে, এইজন্যই জাপান নৌঘাঁটিগুলি একে একে দখলের চেষ্টা করিতেছে। তবে, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে তাহারা অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে রণকৌশল হিসাবে কেবল বিমান আক্রমণের নীতি গ্রহণ করিয়াছে। তাহারা চাহিতেছে বোমাবর্ষণের দ্বারা নৌঘাঁটিগুলিকে বিধ্বস্ত করিতে। অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দর এবং ভারতবর্ষের সিংহলে এজন্য বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইতেছে। এভাবে নৌঘাঁটিগুলি আক্রমণ করিয়া তাহারা সম্ভবতঃ আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের রণাঙ্গনের সহিত বৃটেনের যোগাযোগ নষ্ট করিতে এবং তাহাদের রণদোসর জার্ম্মাণীকে আসন্ন অভিযানে সাহায্য করিতে চাহে। দূরত্বের ব্যবধান বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, জাপানীদের পক্ষে চট্টগ্রামে বিমান আক্রমণ অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল। কারণ, ব্রহ্মের সীমান্ত হইতে চট্টগ্রাম যত দূরে, আন্দামান হইতে (যদি সিংহল হইতে হাজার মাইল দূরবর্ত্তী আন্দামানকেই বর্ত্তমানে ক্ষুদ্রতর জাপ নৌবহরের আশ্রয় বলিয়া ধরিয়া লই) সিংহল তার চেয়ে অনেক বেশী দূরে। কিন্তু চট্টগ্রাম কোন নৌঘাঁটি নহে। ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত

মহাসাগরের নৌপথের দৃষ্টিতে চট্টগ্রামের কোন গুরুত্ব নাই। অপর-পক্ষে সিংহল ভারতবর্ষের নৌপথের হিসাবে বোধহয় সর্ব্বাধিক গুরুত্ব-সম্পন্ন। পূর্ব্ব গোলার্দ্ধের মানচিত্রের দিকে চাহিলে কলম্বোকে প্রায় কেন্দ্রস্থলে মনে হইবে। ইউরোপ, এশিয়া, আফ্রিকা এবং অষ্ট্রেলিয়া—এই চারিটি মহাদেশের ইহা নৌমিলন কেন্দ্র এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যবর্ত্তী আশ্রয়স্থল বলিয়া ইহাকে গণ্য করা যায়। সিংহলের আর একটি বৈশিষ্ট্যও উল্লেখযোগ্য। সমস্ত জাহাজের পক্ষেই কয়লা অত্যাবশ্যক—জীবনধারণের পক্ষে যেমন জল, জাহাজের পক্ষে তেমনি কয়লা। এই কয়লা লইবার প্রধান কেন্দ্র হইতেছে কলম্বো। এই হিসাবে ইহা সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ বন্দর—বাণিজ্যিক হিসাবে নহে, কয়লার প্রয়োজনে। শান্তির সময়ে ৪টী মহাদেশের অসংখ্য জাহাজ এখানে আসিয়া থামে। সিংহলের পশ্চিম তীরে কলম্বো এবং ইহার পোতাশ্রয়ের গুরুত্বের জন্যই আজ ইহা জাপানী আক্রমণের লক্ষীভূত হইয়াছে।
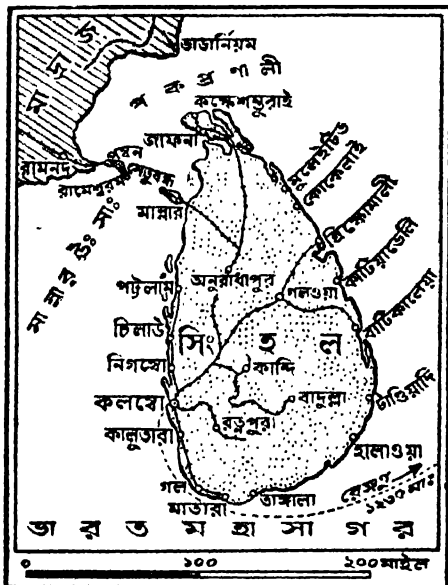
১৫০৬ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগীজেরা (তাহারা দেড় শত বৎসর এই অঞ্চল

দখল করিয়া রাখিয়াছিল) এবং ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে ওলন্দাজেরা সিংহল অধিকার করিয়া দুর্গ, খাল, জলপথ ইত্যাদি তৈয়ার করিয়াছিল। ইহার বহুপরে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে সিংহল ইংরাজদের অধীনে যায় এবং সিংহলের বদলে ওলন্দাজদিগকে জাভাদ্বীপ ছাড়িয়া দিতে হইয়াছিল। পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ইংরাজ পর পর আবির্ভূত হইয়া সিংহল দখল করায় নৌকেন্দ্র হিসাবে ইহার মর্য্যাদা ঐতিহাসিক মূল্য অর্জ্জন করিয়াছে। বাঙ্গলার বিজয়সিংহের নৌ-অভিযানও এই প্রসঙ্গে বাঙ্গালী মাত্রেই গৌরবের সহিত স্মরণ করিতে পারেন। কলম্বো ছাড়া সিংহলে আরও দুইটি পোতাশ্রয় আছে—একটি ত্রিকোমালিতে এবং আর একটি জাফনায়। স্বাভাবিক পোতাশ্রয় হিসাবে ত্রিণকোমালি উৎকৃষ্ট। ইহা পূর্ব্বদিকে এবং জাফনা সিংহলের একেবারে উত্তর প্রান্তে। জাফনায় ক্ষুদ্র জাহাজ ছাড়া বৃহৎ কোন পোত ঢুকিতে পারে না এবং একদা দক্ষিণ ভারত হইতে এই পথ দিয়াই লোকে সিংহলে প্রবেশ করিত।

সমুদ্রপথে নিরঙ্কুশ আধিপত্য বিস্তার এবং মিত্রপক্ষের পাল্টা-আক্রমণ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বন্ধ করিবার জন্যই জাপানীরা সিংহলে বিমান আক্রমণ চালাইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দর সম্পর্কেও তাহারা এই নীতি অবলম্বন করিয়াছে। কলিকাতার ভাগ্য সম্ভবতঃ পরে নির্ণীত হইবে। কারণ, কলিকাতা নদীতীরস্থ বন্দর, সমুদ্র হইতে অনেক দূরে—৮০ মাইল ব্যবধানে। গঙ্গার মোহনা দিয়া শত্রু জাহাজের পক্ষে কলিকাতায় প্রবেশ অপেক্ষাকৃত কষ্টকর। কলিকাতার চেয়ে সিংহল বা মাদ্রাজ জাপ নৌবহর ও বিমানবহরের পক্ষে সহজতর লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু জাপানীদের এত দূরবর্ত্তী সমুদ্রপথের দিকে অভিযান কিঞ্চিৎ বিস্ময়কর। যদি টোকিওকে জাপ সমরাভিযানের কেন্দ্র ধরা

যায়, তবে অঙ্ক কষিলে দেখা যাইবে যে, জাপানীরা হংকং ও সিঙ্গাপুর হইতে একটানা কলম্বো পর্য্যন্ত মোট ৪৬০৫ মাইল সমুদ্রপথে পৌছিয়াছে। কেবল পূর্ব্ব এশিয়া ও ভারতবর্ষই নহে, মার্কিণ নৌ-বহরকে বাধা দেওয়ার জন্য তাহারা আরও পূর্ব্ব দিকে—টোকিও হইতে গুয়াম হইয়া ওয়েক দ্বীপ পর্য্যন্ত ৩ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করিয়াছে। এই দুই দৈর্ঘ্য যোগ দিলে মোট ৭ হাজার মাইলের বেশী হইবে। ইহার সঙ্গে সিঙ্গাপুর হইতে বাটাভিয়া হইয়া থার্সডে দ্বীপ ধরিলে ২৭০০ মাইল এবং সিঙ্গাপুর হইতে মালয় অতিক্রম করিয়া দক্ষিণ ব্রহ্মের রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত হিসাব করিলে ১১০০ মাইলের বেশী হইবে। রণক্ষেত্রের এই বিশালতার মধ্যে দুইটি মহাসমুদ্র রহিয়াছে এবং চারিটি মহাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার বিভ্রাট ঘটাইবার রাক্ষুসে প্ল্যান জাপানীরা অনুসরণ করিতেছে। কিন্তু এই বহুবিস্তৃত এবং অবিশ্বাস্য পরিমাণ দীর্ঘ রণক্ষেত্রের বিস্তার জাপানীদিগকে ভবিষ্যতে বিষম সঙ্কটে ফেলিতে পারে। সমরনীতিতে যোগাযোগ রক্ষা এক অপরিহার্য্য অঙ্গস্বরূপ। সুতরাং আজ সিংহল বা মাদ্রাজের উপকূল বিপন্ন হইলেও জাপ রণনীতি ভবিষ্যতে নিদারুণ বে-কায়দায় পড়িবে না—এমন বিশ্বাসের যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

অষ্টম অধ্যায়

—:*:—

(২)

মাদ্রাজ ও উড়িষ্যার উপকূলে

১২ই এপ্রিল, '৪২।

৫ই এপ্রিল সিংহলে বিমান আক্রমণের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, ভারতবর্ষের দুই সহস্রাধিক মাইল দীর্ঘ উপকূলভাগ আর নিরাপদ নহে। এই উপকূলভাগ সম্পূর্ণরূপে খোলা এবং ইংলণ্ডের মত সুরক্ষিত নহে। সুতরাং জাপানীদের পক্ষে ইহার কোন কোন অংশে আবির্ভূত হওয়া আদৌ অসম্ভব নহে। ৬ই তারিখ মাদ্রাজ সরকার একটি ইস্তাহারে জানান যে, বঙ্গোপসাগরে একটি জাপ নৌবহর ঘুরাফেরা করিতেছে বলিয়া জানিতে পারা গিয়াছে। এজন্য মাদ্রাজ সহরে পূর্ণ নিষ্প্রদীপের বা ব্ল্যাক-আউটের ব্যবস্থা হইয়াছে। বর্ত্তমানে সমুদ্রপথে বা আকাশ-পথে শত্রু কর্ত্তৃক মাদ্রাজ আক্রমণের আশঙ্কা বৃদ্ধি পাইয়াছে। এজন্য জনসাধারণের সতর্ক হওয়া উচিত।

সিংহলের পর ৬ই এপ্রিল মাদ্রাজের উপকূলে ভিজাগাপট্টম ও কোকনদে বোমা বর্ষিত হয়। বঙ্গোপসাগরে যে জাপ নৌবহর হাঙ্গরের মত ঘুরিতেছে, সেই নৌবহরের সঙ্গী বিমানবাহী জাহাজ হইতেই এই আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইতেছে। সকাল বেলা ভিজাগাপট্টম বন্দরে আক্রমণ ঘটে। পোতাশ্রয়ের দিকে যে সমস্ত জাহাজ আসিতেছিল সেগুলির উপরেই আক্রমণ চালানো হয়। তীরবর্ত্তী কোন স্থানে বোমা বর্ষিত হয় নাই। ডক এলাকায় প্রথম আক্রমণ বেলা প্রায় ১-১৫ মিনিটের সময় ও দ্বিতীয় আক্রমণ প্রায় ৫টার সময় চালানো হয়। এই দুইবার আক্রমণে এক একবারে ১০টির বেশী বিমান যোগদান করে নাই। সমস্ত বোমাই (প্রায় ২০টি) ডক এলাকায় পড়িয়াছিল, পোতাশ্রয়ের কয়েকটি ইমারতের সামান্য ক্ষতি হইয়াছে। খুব অল্প লোকই হতাহত হইয়াছে। সহরের উপর কোন বোমা পড়ে নাই। কোকনদে একটি বিমান সকাল প্রায় ৭টার সময় আক্রমণ চালায়। সেই সময় একটি লঞ্চ ও একটি জাহাজ বন্দরের দিকে যাইতেছিল। কিন্তু বিমান হইতে উভয় জাহাজের উপর মেসিনগান চালানো হয় এবং লঞ্চের একজন খালাসী নিহত ও একজন আহত হয়। বেলা প্রায় ১-৪৫ মিনিটের সময় জাপ বোমারু ভূভাগের উপর প্রথম আক্রমণ চালায়। ৫টি জাপ বিমান তেলের গুদামে বোমা বর্ষণ করিয়া সামান্য ক্ষতি সাধন করে। কিন্তু কেহ হতাহত হয় নাই। ভিজাগাপট্টমের ন্যায় কোকনদেও সহরের প্রধান অংশের উপর কোন বোমা পড়ে নাই।

সিংহলের পরে মাদ্রাজ এবং মাদ্রাজের পর উড়িষ্যার উপকূল হইতে দুঃসংবাদ আসিল। মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের পূর্ব্ব বহির্দ্বার অতিক্রম করিয়া আমাদের দক্ষিণ উপকূলে পৌঁছিল। বাঙ্গলার একান্ত সন্নিকটবর্ত্তী উড়িষ্যার উপকূলেও ইহা দেখা দিল।

সরকারীভাবে স্বীকার করা হইয়াছে যে, 'ডরসেটসায়ার' ও 'কর্ণওয়াল' নামক দুইখানা ক্রুজার, বিমানবাহী জাহাজ 'হারমিস্' এবং ৬খানা বাণিজ্য জাহাজ নিমজ্জিত হইয়াছে। এই জাহাজগুলি বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে জাপানী নৌ ও বিমানবহরের আক্রমণে ধ্বংস হইয়াছে। 'রয়টারে'র মতে ক্রুজার দুইটির নিমজ্জন অতি গুরুতর ব্যাপার। ঠিক কোন্‌স্থানে 'ডরসেটসায়ার' ও 'কর্ণওয়াল' ডুবিয়াছে, তাহা বুঝা যাইতেছে না। তবে মোট দেড় হাজার লোকের মধ্যে ১১০০ জন উদ্ধার পাওয়ায় মনে হইতেছে সঙ্গে অন্যান্য জাহাজ ছিল, কিম্বা তীরভূমির অতি নিকটে, এমন কি কোন বন্দরের কাছেও এইগুলি ডুবিয়া থাকিতে পারে। বিমানবাহী জাহাজ 'হারমিস' সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, এই পোতটিও জাপানীদের বিমান আক্রমণে সিংহলের কাছে নিমজ্জিত হইয়াছে। এই জাহাজেরও অনেক লোক উদ্ধার পাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কারণ, সিংহলের তীর হইতে মাত্র ১০ মাইল দূরে 'হারমিসে'র সলিল সমাধি হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত উড়িষ্যার উপকূলে ৬ খানা জাহাজের ধ্বংস সম্পর্কে যে বিস্তৃত সংবাদ আসিয়াছে, তাহাও দুঃখজনক। প্রকাশ যে, কতকগুলি জাহাজ যখন কনভয়যোগে যাইতেছিল, তখন সকাল প্রায় ৮টার সময় শত্রুপক্ষের প্রহরী বিমান সেখানে আসিয়া হাজির হয়। এই বিমানগুলি জাহাজসমূহের উপর উড়িয়া যায় এবং কয়েক মিনিট পরেই জাপানীদের দুইটি বড় ক্রুজার ও একটি ডেষ্ট্রয়ার সেখানে আবির্ভূত হয়। এই পোত তিনটি ত্রিভুজাকৃতি ব্যূহের আকারে দাঁড়াইয়া বৃটিশ বাণিজ্যজাহাজসমূহের উপর প্রচণ্ডভাবে গোলাবর্ষণ করিতে থাকে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সমস্ত ব্যাপার শেষ হইয়া যায়। আক্রান্ত জাহাজগুলি ডুবিবার আগে পাল্টা কামানের গোলাবর্ষণ করিতে পারে নাই। জাহাজগুলিতে

মার্কিণ, ইংরাজ, চীনা ও ভারতীয় ইত্যাদি নানাজাতির লোক ছিল। মোট ৪।৫ শত লোক উদ্ধার পাইয়াছে এবং তাহাদের অধিকাংশই ইংরাজ, মার্কিণ ইত্যাদি। বেলা ১১টার সময় কটকে এই সংবাদ পৌছিলে স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ সমুদ্রতীরে যান এবং উদ্ধারপ্রাপ্ত ব্যক্তিদিগকে যথোচিত সাহায্য ও সেবা করেন। উদ্ধারপ্রাপ্ত লোক-দিগকে কটকে আনা হইয়াছে।

উপরে যে সমস্ত সংবাদের সারমর্ম্ম দেওয়া গেল, তাহা হইতে বুদ্ধিমান পাঠক অনায়াসেই বুঝিতেছেন যে, কটক হইতে কলম্বো পর্য্যন্ত সমগ্র সমুদ্রতীর ও জলপথ কিরূপ বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছে। কোকনদ ও ভিজাগাপট্টমে বোমবর্ষণ এবং সিংহলের ত্রিণকোমালি পোতাশ্রয়ে গত বৃহস্পতিবার পুনরায় বহু সংখ্যক জাপ বিমানের হানা এই শোচনীয় অবস্থাই উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। সিঙ্গাপুরের পতনের পর ভারত মহাসমুদ্রের দ্বার যে খুলিয়া যাইবে, এবিষয়ে কাহারও সংশয় ছিল না এবং গভর্ণমেণ্টও কয়েক মাস আগে স্বীকার করিয়াছিলেন যে, বঙ্গোপসাগরে জাপানী নৌবহর উৎপাত করিতেছে। সিঙ্গাপুর হইতে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত গোটা সমুদ্রতীর ও বন্দর এবং নৌঘাঁটি জাপানীদের দখলে; তাহারা আন্দামানও অধিকার করিয়া লইয়াছে। অনুমান করা যাইতেছে যে, পোর্ট ব্লেয়ারেই জাপানীরা ক্ষুদ্রতর নৌবহর ও বিমান-বহরের ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছে। সম্ভবতঃ সেই ঘাঁটি হইতে জাপানী রণতরীসমূহ ও বিমানবাহী পোতগুলি বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে টহল দিতেছে। পোর্টব্লেয়ার হইতে কলম্বো সম্ভবতঃ এক হাজার মাইল এবং কটক ও ভিজাগাপট্টম ৭শত মাইল। দূরত্ব হিসাবে নিশ্চয়ই ইহা সামান্য নহে। কিন্তু যুদ্ধজাহাজ ও বিমানগুলি যেন কতকটা স্বচ্ছন্দচিত্তে সমুদ্রে বিহার করিতেছে। যদিও মিত্রশক্তির

বোমারু বিমান মাঝে মাঝে জাপ নৌবহর ও বিমানবহরকে বাধা দিতেছে, তথাপি খাস সমুদ্রের উপর আধিপত্য না থাকায় শত্রু-পক্ষকে অচিরে দমন করা যাইতেছে না। দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষের বহুদূর বিস্তৃত সমুদ্রতীর লইয়া সামরিক মহলে আলোচনা হইয়াছে। হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ এই সমুদ্রতীর একেবারে খোলা, প্রবলতর নৌবহর ও বিমানবহরকে দ্রুত প্রতিরোধের ব্যবস্থা আজ জরুরী প্রয়োজনের মত অনুভূত হইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষে স্থলবাহিনী এবং সেই বাহিনীর আনুষঙ্গিক অস্ত্রশস্ত্র যতটা আছে, নৌবহর সেই অনুপাতে সামান্য। নৌবহর ও বিমানবহর ভারতবর্ষে গড়িবার জন্য আন্দোলন হইয়াছে প্রচুর। কিন্তু বৃটেনের সাম্রাজ্যবাদী রাজনৈতিক নেতাগণ ইহাতে রাজী হন নাই। আজ ইহার বিষময় ফল ফলিতেছে। অন্যথা হাজার হাজার মাইল দূর হইতে জাপান কলম্বো বা কটক পর্য্যন্ত নৌ-অভিযানে সাহসী হইত না।

জাপানীগণ কর্ত্তৃক ভারতবর্ষের সমুদ্রতীর আক্রমণের অভিসন্ধি ও চেষ্টা এক্ষণে আর অস্পষ্ট নহে। চক্রশক্তির যে 'গ্রাণ্ড ষ্ট্রাটিজি'র কথা আমরা শুনিতেছি, ইহা বোধহয় সেই বিরাট রণ-পরিকল্পনারই আক্রমণ-পর্ব্ব! ইউরোপে জার্ম্মাণীর রণনৈতিক অভিযান নূতন করিয়া আরম্ভ হয় নাই। এই অবসরে জাপানী উৎপাত হয়তো পূর্ব্ব পরিকল্পনা অনুসারেই অনুষ্ঠিত হইতেছে। লক্ষণ দেখিয়া মনে হইতেছে যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে কিম্বা মধ্যপ্রাচ্যে জার্ম্মাণীর অভিযান আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে জাপান আরব সাগর পর্য্যন্ত অগ্রসর হইবে। সিঙ্গাপুর হইতে করাচী বা এডেন পর্য্যন্ত গোটা সমুদ্রপথের উপর তাহারা যদি প্রভুত্ব স্থাপন করিতে পারে, তবে জলপথে ভারতবর্ষ, বৃটেন, আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়ার যোগাযোগ বিনষ্ট হইবে এবং ভারতবর্ষ কতকটা নৌপথে

অবরুদ্ধ অবস্থায় পড়িবে। ইহা দ্বারা জাপান পরোক্ষে ইউরোপীয় সংগ্রামে জার্ম্মাণীকে যেমন সাহায্য করিতে চাহে, তেমনই মিত্রশক্তির যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থায় বিভ্রাট ঘটাইতে চাহিতেছে। ভারতবর্ষের উপর জলপথে ও বিমানপথে যে আক্রমণ সুরু হইল এবং যাহা এখনও একান্তরূপে সমুদ্র-তটভূমিতেই নিবদ্ধ, তাহা আরও অভ্যন্তরভাগে প্রসারিত হইবে কিনা, বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের ইহাই উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন। সম্ভবতঃ জার্ম্মাণীর নূতন অভিযানের আগে জাপান ভারতবর্ষের অভ্যন্তরভাগে আক্রমণাত্মক অভিযানে বাহির হইবে না। ব্রহ্মদেশে এখনও যুদ্ধ চলিতেছে এবং অষ্ট্রেলিয়া আজও প্রায় অক্ষত আছে। সুতরাং এই দুই দিক দিয়া কিছুটা ভরসা পাওয়া যাইতে পারে। কেহ কেহ অবশ্য মার্কিণ নৌবহরের দোহাই দিতেছেন, কিন্তু এই প্রকার সান্ত্বনা সামরিক দিক দিয়া বিচারসাপেক্ষ। মার্কিণ নৌবহর কত হাজার মাইল দূরে এবং কি অবস্থায় আছে, তাহা কাহারও জানা নাই। যদি এই সময় মার্কিণ নৌবহর অষ্ট্রেলিয়ায়ও উপস্থিত থাকিতে পারিত, তাহা হইলেও জাপান বহুদূর সমুদ্রের এই দুঃসাহসিক অভিযানে ইতস্ততঃ করিত। তবে, সিংহল, মাদ্রাজ এবং উড়িষ্যা বা বাঙ্গলার উপকূলভাগে যাহাই ঘটুক না কেন, পরিণামের আত্মবিশ্বাস ও জয়ের আশা লইয়া ধৈর্য্য ও সাহসের সহিত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নাই।

অষ্টম অধ্যায়

—:*:—

(৩)

বঙ্গোপসাগরে

১৫ই এপ্রিল, '৪২।

বঙ্গোপসাগরে পর পর কতকগুলি জাহাজ ডুবি হওয়ায় বৃটেনে যথেষ্ট উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। এই দুঃসময়ে দুইখানা যুদ্ধ-জাহাজ, একখানা বিমানবাহী জাহাজ ও ছয়খানা বাণিজ্য জাহাজ উড়িষ্যা ও সিংহলের উপকূলে নিমজ্জিত হইয়াছে। মিঃ চার্চ্চিল এই প্রসঙ্গে কৈফিয়ৎ দিতে গিয়া কমন্স সভায় বলিয়াছেন যে, গত ৪ঠা এপ্রিল একটি বড় জাপানী নৌবহরকে ভারত মহাসাগর দিয়া সিংহল অভিমুখে অগ্রসর হইতে দেখা যায়। এই নৌবহরে অন্ততঃ ৩ খানা বৃহৎ যুদ্ধজাহাজ বা ব্যাট্‌লশিপ, ৫ খানা বিমানবাহী জাহাজ এবং কয়েকখানা বড় ও ছোট যুদ্ধজাহাজ ও কতকগুলি ডেষ্ট্রয়ার ছিল।

কলম্বো ও ত্রিঙ্কোমালির পোতাশ্রয়ে জাপানীরা যে বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল, তাহাতে জাপানী বিমানবহরের প্রচুর ক্ষতি হইয়াছে সন্দেহ নাই। কিন্তু বৃটিশ পক্ষেরও অনেকগুলি বিমান নষ্ট হইয়াছে, তীরবর্ত্তী কামানগুলির সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, যে কয়েকখানা জাহাজ পোতাশ্রয়ে ছিল সেগুলিও জখম হইয়াছে। জাপানী বিমানবাহী জাহাজগুলির মধ্যে একখানি যথেষ্ট বড় এবং নূতন। এই পোতখানি ২৮ হাজার টনের কম নহে। মিঃ চর্চ্চিলকে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল যে, জাপানীরা যখন কলম্বো আক্রমণ করিয়াছিল তখন বৃটিশ বিমান-বহর পাল্টা-আক্রমণ চালাইয়াছিল কিনা। মিঃ চার্চ্চিল স্বীকার করেন যে, পাল্টা-আক্রমণ চালানো হইয়াছিল বটে, কিন্তু সবগুলি এরোপ্লেনই হয় নষ্ট, না হয় জখম, কিম্বা ব্যবহারের অযোগ্য হইয়াছে। জাপানীরা যে বিমানবাহী জাহাজ হইতে আক্রমণ করিয়াছিল, সেই জাহাজটির উপর টর্পেডোবাহী বৃটিশ বিমান আক্রমণ চালাইয়াছিল বটে, কিন্তু মেঘ ও বৃষ্টির জন্য উহা ব্যর্থ হইয়াছে। ভারত সহাসাগরে বৃটিশ জাহাজ ডুবির এই সমস্ত বিবরণ পাইয়া লণ্ডনের 'টাইম্‌স' 'নিউজ ক্রনিক্যাল', 'ডেলী মেল', 'ডেলি এক্সপ্রেস' প্রভৃতি বড় বড় পত্রিকাগুলি উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন ব্যাপার কি? বৃটিশ নৌবহরের ক্রমাগত এত ক্ষতির রহস্য কি? পত্রিকাগুলির মতে বৃটিশ নৌ-রণপরিকল্পনার গোড়ায় নিশ্চয়ই কোন বড় রকমের ত্রুটি আছে। নৌ, বিমান ও স্থলবাহিনী—সমর বিভাগের এই তিন শাখার মধ্যে পারস্পরিক সামঞ্জস্য ও সহযোগিতার অভাব আছে বলিয়া যে সন্দেহ হইতেছিল, এই সমস্ত সামরিক দুর্ঘটনায় তাহাই দৃঢ় হইতেছে। নৌ-বহরের সহিত বিমান শক্তির পরিপূর্ণ সহযোগিতার অভাবে এ পর্য্যন্ত বহু দুর্বিপাক ঘটিয়াছে। নৌ-বহরের বণ্টন (naval dispositions) নির্দ্দিষ্ট

নৌ-রণনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চয়ই সন্দেহ আছে এবং ঘন ঘন নৌ-দুর্ঘটনার দ্বারা একথাই প্রমাণিত হইতেছে যে, নৌ-বিভাগীয় কর্তাগণের পক্ষে নৌ-নীতি পরিচালনার সংশোধন ও পরিবর্তন একান্তরূপে জরুরী হইয়া পড়িয়াছে। 'ডেলী মেল' কঠোর ভাষায় বলিতেছেন, 'নৌ-শক্তির এই ক্রমিক ক্ষয় অত্যন্ত সঙ্কটের কথা।' It is one of the grimmest tales in the annals of the Royal Navy and it demands urgent attention. রাজকীয় নৌ-বহরের ইতিহাসে এগুলি সর্বাপেক্ষা মারাত্মক ঘটনার অন্যতম এবং অবিলম্বে এদিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হওয়া উচিত। বিভিন্ন সংবাদপত্রের এই মন্তব্যের সঙ্গে 'রয়টারে'র নৌ-বিশেষজ্ঞ সংবাদদাতার সমালোচনাও চিন্তার যোগ্য। 'হার্মিস', 'কর্ণওয়াল' ও 'ডরসেটশায়ার' ডুবির কথা আলোচনা করিয়া তিনি বলিতেছেন যে, বর্তমান মুহূর্তে প্রত্যেকটি জাহাজই অত্যন্ত মূল্যবান। কারণ, বৃটিশ নৌবহর নানা সমুদ্রে বিক্ষিপ্ত থাকায় নৌ-শক্তির উপর প্রবল চাপ পড়িতেছে। এই অবস্থায় এই জাহাজসমূহের নিমজ্জন বৃটিশ নৌবহরের পক্ষে একটা প্রকাণ্ড আঘাতের মত। জাপানী বোমারু বিমানেরা অত্যন্ত ব্যাপক ও কঠোর আক্রমণ চালাইয়াছিল। ৩।৪ খানা বিমানবাহী জাহাজ হইতেই তাহারা এই অভিযানে বাহির হইয়াছিল। তাঁহার মতে জাপ বিমানবাহী জাহাজগুলিতে গড়পড়তা ৪০ খানা বিমান আছে। এই সমস্ত পোতের মধ্যে সর্ববৃহৎখানা ২৮ হাজার টনের এবং উহাতে ৬০ খানা বিমান ধরে। অপর ৩ খানা জাহাজের প্রত্যেকটি ৪৬ খানা করিয়া এবং ২ খানা জাহাজ যথাক্রমে ৩০ ও ২০ খানা করিয়া বিমান বহন করে। সম্ভবতঃ জাপানীরা অন্যান্য কয়েকখানা ক্ষুদ্র জাহাজকেও বিমানবাহী পোতে রূপান্তরিত করিয়াছে। 'রয়টারে'র এই বিশেষজ্ঞের মতে

জাপানীরা বৃটিশ জাহাজগুলির বিরুদ্ধে টর্পেডো ব্যবহার করে নাই, করিয়াছে ছোঁমারা বিমান (dive bombers)। এই বিমানগুলির কার্য্যকারিতা ও নৈপুণ্য সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দিগ্ধ। তিনি স্পষ্টই বলিতেছেন—

Japanese successes have demonstrated very convincingly the efficacy of the dive-bomber in naval warfare as in land operations. The accuracy with which they reach their targets is remarkable when compared with the effects of ordinary bombing high or even low altitudes. This raises a problem that may have an important bearing on the future of the war.

সহজ কথায় জাপানীরা স্থলযুদ্ধের মত নৌ-সংগ্রামেও ছোঁমারা বিমানের সাফল্য ও নৈপুণ্য সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণিত করিয়াছে। আকাশের খুব উপর বা নীচু হইতে সাধারণ বোমাবর্ষণের দ্বারা যে ফল পাওয়া যায় উহার সহিত তুলনা করিলে দেখা যাইবে যে, জাপানী ছোঁমারা বিমানগুলি তাহাদের লক্ষ্যবস্তুর উপর যেরূপ নির্ভুলভাবে পতিত হয় তাহা খুব অভিনব। ইহা দ্বারা এমন একটা সমস্যার সৃষ্টি হইতেছে যাহা ভবিষ্যৎ সংগ্রামের ধারা যথেষ্ট পরিমাণে প্রভাবান্বিত করিবে।

বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরে জাপানীদের অভিযান সম্পর্কে এই সমস্ত মতামত নৌ-যুদ্ধের উপর যথেষ্ট আলোকপাত করিতেছে। শত্রুপক্ষের কৃতিত্বের প্রশংসা অবশ্যই বাঞ্ছনীয় নহে। কিন্তু শত্রুর প্রকৃত শক্তি কোথায়, তাহার নৈপুণ্যের মূল রহস্য কি, মিত্রপক্ষের কেন

পরাজয় হইতেছে এবং এই পরাজয়ের মধ্যে রণনৈতিক ও রণকৌশলের কি কি দুর্ব্বলতা ও ত্রুটি আছে, তাহা নিশ্চয়ই সম্পূর্ণরূপে জানা ও আলোচনা করা উচিত। কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তিরই শত্রুকে তুচ্ছ করা কিম্বা উহার শক্তি সম্পর্কে ভুল ধারণা রাখা উচিত নহে। জাপানীদের সম্পর্কে বরাবর বহু বিশেষজ্ঞের এই ধারণাই ছিল যে, রণশক্তিতে জাপান প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্র নহে। তাহাদের নৌ-বহরের যোগ্যতা আছে বটে, কিন্তু তাহা যেমন বৃটেনের সমকক্ষ নহে, তেমনই জাপানীরা বিমানবহরের দিক দিয়া একেবারে নগণ্য। এই ভ্রান্ত ধারণা মিত্র-শক্তির রণ-নীতিতে আপাততঃ প্রকাণ্ড বিপর্য্যয় ডাকিয়া আনিয়াছে। বিশেষভাবে জাপানের বিমানবহর সম্পর্কে অত্যন্ত ভুল ধারণা থাকায় প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে এবং বহু দ্বীপে ও উপদ্বীপে একে একে বহু পরাজয় ঘটিয়াছে। এই পরাজয়ের প্রথম সূত্রপাত বিখ্যাত 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌' ও 'রিপাল্‌স্‌' ডুবির মধ্যে। বর্ত্তমানে এই দুইটি ভীমকায় যুদ্ধ-জাহাজের ধ্বংসের যে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া গিয়াছে তাহাতেও দেখা যায় যে, বৃটিশ নৌ-বহরের প্রধান সেনাপতি এড্‌মিরাল স্যার টম ফিলিপ্‌স্‌ও এই ভুল করিয়াছিলেন। উত্তর মালয়ে জাপানী নৌ-বহরকে অতর্কিত আক্রমণের দ্বারা জব্দ করিতে গিয়া তিনি 'রিপাল্‌স্‌' ও 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্‌' সহ খোলা সমুদ্রে বহুদূর অগ্রসর হইয়া যান। তাঁহার অনুমান ছিল এই যে, সেদিন দিনের বেলা জাপানী বিমানেরা তেমন ব্যাপক আক্রমণ করিতে পারিবে না এবং তিনি পর্য্যবেক্ষণকারী জাপ বিমানের চক্ষে ধূলি দিয়া মালয়ের উত্তর-পূর্ব্ব উপকূলে পৌঁছিতে পারিবেন। কিন্তু তাঁহার এই হিসাবে ভুল হইয়াছিল। কারণ ঐদিনই সন্ধ্যা ৫-২০ মিনিটের সময় পর্য্যায়ক্রমে মোট ২৭ খানা টর্পেডোবাহী ও বোমাবাহী জাপবিমান প্রচণ্ড আক্রমণ

চালাইয়াছিল। 'রিপাল্‌স্‌' ও 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌সের' কামানগুলি প্রাণপণে বাধা দেয় বটে, কিন্তু শেষ রক্ষা পাইল না। ভীমকায় জাহাজ দুইটি অতি দ্রুত ডুবিয়া যায়। ইহার প্রথম কারণ জাপ বিমানশক্তি সম্পর্কে হিসাবে ভুল এবং দ্বিতীয় কারণ (মিত্রপক্ষের) বিমান সহযোগিতার একান্ত অভাব। যুদ্ধজাহাজ দুইটি এত দূর-সমুদ্রে আসিয়া পড়িয়াছিল যে, তীর হইতে মিত্রপক্ষীয় বিমানেরা কোন সাহায্য দিতে পারে নাই। আধুনিক সমরনীতি সম্পর্কে যাঁহারা কিছু খোঁজ খবর রাখেন তাঁহারাই জানেন যে, বর্ত্তমান কালের নৌ-বহরগুলি বিমানবহরের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতা ছাড়া চলিতে পারে না। বড় বড় যুদ্ধজাহাজগুলি বোমারু বিমান ও টর্পেডো বিমানের পাল্লায় পড়িয়া প্রায় অকেজো হইয়া পড়িয়াছে। নরওয়ের যুদ্ধে, ক্রীটের যুদ্ধে, ইংলিশ চ্যানেল ও প্রাচ্য-খণ্ডের যুদ্ধে এই তথ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, নৌ-বহর একান্তরূপে বিমানশক্তির উপর নির্ভরশীল। যে তথ্য বহুদিন যাবৎ রণনৈতিক মহলে আলোচিত ও গৃহীত হইয়াছে, বৃটেনের নৌ-বিভাগীয় কর্ত্তাগণ কেন সেই দিকে শৈথিল্য দেখাইতেছেন, ইহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। বিশেষভাবে যে সমস্ত রাষ্ট্রশক্তি দ্বীপ ও সমুদ্রের উপর নির্ভরশীল তাঁহাদের নিকট নৌযুদ্ধের এই বিপুল পরিবর্ত্তন বহুদিন আগেই স্পষ্ট হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৩৯ সাল হইতে সংগ্রাম চালাইয়াও আজিকার বৃটিশ সমরকর্ত্তাগণ এই দিক দিয়া সচেষ্ট ও সক্রিয় হন নাই। আজও এই গভীরতর সঙ্কটের দিনে ইংলণ্ডের সংবাদপত্রগুলি নৌযুদ্ধের ও নৌ-রণপরিকল্পনার তীব্র সমালোচনা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। জাপান যদি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়, তবে তাহার পক্ষে সমুদ্রপথের অভিযানই হইবে বড় কথা। সমুদ্রপথের অভিযানের দ্বারা কোন বিদেশী রাজ্যের আক্রমণ রণনীতির একটা বৃহত্তম

গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব খাটাইয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালে বৃটেনের সর্ব্বপ্রধান নৌবহর বা Grand Fleet উত্তর সাগরের পথ অবরোধ করিয়া রাখিয়াছিল। ইহার ফলে জার্ম্মাণীর সরবরাহ ব্যবস্থা অত্যন্ত বিঘ্নসঙ্কুল হইয়াছিল। এজন্য এবার জার্ম্মাণী গোড়াতেই ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করে এবং তারপর হল্যাণ্ড ও বেলজিয়ম কাড়িয়া লয়। ফ্রান্সের ব্রেষ্ট বন্দর হইতে স্থরু করিয়া নরওয়ের নার্ভিক বন্দর পর্য্যন্ত সমগ্র উপকূল দখলে থাকায়, এবার উত্তর সাগরে জার্ম্মাণী আর আগের মত বিপদে পড়ে নাই। বরং জলপথে ও আকাশপথে বৃটেনের আত্মরক্ষার ব্যবস্থাই বিগতবারের তুলনায় অনেক বেশী বিপন্ন হইয়াছে।

বঙ্গোপসাগরও যেন অনেকটা ইউরোপের উত্তর সাগরের মত। মানচিত্রের দিকে তাকাইলে মনে হইবে যে, মাদ্রাজ হইতে এই সমুদ্রতীর ক্রমে উত্তরে ও উত্তর-পূর্ব্বে ঘুরিয়া বঙ্গদেশ হইয়া তারপর দক্ষিণে ও দক্ষিণ-পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশের শেষ সীমা পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে এবং একটি কঙ্কনবলয়ের মত আকৃতি ধারণ করিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রদেশগুলি অবশ্যই বাহিরের সরবরাহ ব্যবস্থার উপর নির্ভরশীল নহে। যদি নির্ভরশীল হইত, তবে, উত্তর সাগরের তটবর্ত্তী নরওয়ে, ডেনমার্ক, জার্ম্মাণী, হল্যাণ্ড ইত্যাদির মত মাদ্রাজ, উড়িষ্যা, বঙ্গদেশ প্রভৃতিও সমুদ্রপথকে আঁকড়াইয়া ধরিত। কিন্তু খাদ্যদ্রব্যের ব্যাপারে সমুদ্রপথের উপর নির্ভরশীল না হইলেও, আত্মরক্ষা ও বাহিরের পৃথিবীর সহিত যোগাযোগ রক্ষার ব্যাপারে বঙ্গোপসাগর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মাদ্রাজ, সিংহল, অষ্ট্রেলিয়ার সহিত এই যোগাযোগ প্রত্যক্ষ। তারপর দূরবর্ত্তী ইংলণ্ডের সহিতও কলিকাতা বন্দরের যোগাযোগ বঙ্গোপসাগর দিয়াই ঘটিয়া থাকে। স্থতরাং এই সমুদ্রকে জাপানী উৎপাত হইতে উন্মুক্ত রাখা জরুরী প্রয়োজনের মত। প্রশান্ত ও ভারত মহাসাগরে মিত্রপক্ষীয়

নৌবলের আধিপত্য নষ্ট হওয়ায় জাপান এই দূর-সমুদ্রে যথেষ্ট সুবিধা পাইয়াছে। তবে, ভরসার কথা এই যে, যে মাস পর্য্যন্ত জাপানী নৌবহর বঙ্গোপসাগরে যাহা কিছু উৎপাত সৃষ্টির সুযোগ পাইবে। জুন মাস হইতে মেঘ, বৃষ্টি ও বর্ষা ঋতুর আবির্ভাব—এমন কি মে মাসেও প্রচণ্ড ঝড় উঠিয়া জলপথ ও আকাশপথকে বিপর্য্যস্ত করিয়া থাকে। অতএব এপ্রিল মাস অতিক্রান্ত হইলে আগামী সেপ্টেম্বরের আগে জাপ নৌবহরের বঙ্গোপসাগরে আর ততটা উপদ্রব ঘটাইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। মিত্রপক্ষীয় নৌবল ও বিমানবল সেই সময়ের মধ্যে নিশ্চয়ই বঙ্গোপসাগরে এবং উহার তিন দিকবর্ত্তী দীর্ঘ উপকূলে আত্মরক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করিবে।

অষ্টম অধ্যায়

—:*:—

(৪)

চট্টগ্রামে আক্রমণ

১০ই মে '৪২।

মহাযুদ্ধ এতদিন ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্তে ছিল। আমরা দূর হইতে উহার গতি ও প্রকৃতি লক্ষ্য করিতেছিলাম। ভারতবর্ষের সমুদ্রপথে ও উপকূলভাগে জাপ নৌ-বহরের দৌরাত্ম্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, স্থলপথের সংগ্রাম ব্রহ্মদেশের সীমায় আবদ্ধ ছিল। কিন্তু ব্রহ্মদেশে মিত্রপক্ষের বাধাদান আপাততঃ শেষ হইয়া গেল। ব্রহ্ম সংগ্রামের অবসানে জাপান কোন্ দিকে যাইবে, তাহা লইয়া সর্ব্বত্র গবেষণা হইতেছিল। সেই গবেষণাও আজ নিস্তব্ধ হইতে চলিয়াছে। আজ যুদ্ধ আমাদের দেশে, আমাদের বাঙ্গলার বুকে, আমাদের নিজস্ব গৃহ ও সংসার সীমায় তাহার অশুভ মূর্ত্তি লইয়া দেখা দিল।

বাঙ্গলাদেশের ইতিহাসে এক অভাবনীয় সঙ্কট, এক নূতন সন্ধিক্ষণ উপস্থিত। আমরা মহাযুদ্ধের নূতনতর পর্ব্বে উপনীত হইলাম।

গত ২৫শে বৈশাখ, ৮ই মে শুক্রবার অপরাহ্ণে বাঙ্গলাদেশে প্রথম বোমা বর্ষিত হইয়াছে। সরকারীভাবে প্রকাশ করা হইয়াছে যে, চট্টগ্রামে শুক্রবার অপরাহ্ণে ও শনিবার সকালে জাপ বোমারু বিমান ও জঙ্গীবিমান হানা দিয়াছিল। তাহারা কেবল বোমাবর্ষণ করিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, মেসিনগানও চালাইয়াছিল। আকাশের অনেক উঁচু হইতে বোমা বর্ষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু মেসিনগানের গুলীবর্ষণের সংবাদে মনে হইতেছে কোন কোন বিমান হয়তো নীচুতেও নামিয়াছিল। সাধারণতঃ নীচু দিয়া উড়িয়া না গেলে মেসিনগান চালানো হয় না। চট্টগ্রামে যে জাপ আক্রমণ ঘটিতে পারে ইহা লইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ গবেষণা চলিতেছিল। এজন্য পূর্ব্বাহ্ণে সতর্কতাও অবলম্বিত হইয়াছিল। ইউরোপে নেপোলিয়নের যুগ হইতে আধুনিক যুদ্ধের সুরু, তারপর শতাব্দী কালের অধিক সময় চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের কোন ব্যাপক রূপ এই দেশে অনুভূত হয় নাই। সুতরাং বাঙ্গলা ভূমির ইতিহাসে ইহাকে আমরা এক ঐতিহাসিক ঘটনা বলিয়াই ধরিয়া লইব। পূর্ব্ব বাঙ্গলার নদীপথে এবং উপকূলভাগে একদা পর্ত্তুগীজ দস্যুদের উৎপাত ঘটিয়াছিল। কিন্তু আধুনিক যুদ্ধের তুলনায় উহা সত্যই উৎপাতমাত্র। আজ জাপানী বিমানবহর বাঙ্গলার চট্টলভূমিতে হানা দিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গই প্রথম এই দানবীয় যান্ত্রিক সংগ্রামের তীব্র ও তিক্ত স্বাদ অনুভব করিল।

ব্রহ্ম সংগ্রামের পর জাপানের লক্ষ্য ভারতবর্ষ কিম্বা অষ্ট্রেলিয়া, এই প্রশ্ন সর্ব্বত্র জিজ্ঞাসিত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার ডারুইন বন্দরে অনেক আগেই বোমা বর্ষিত হইয়াছে। তারপর এপ্রিল মাসে সিংহলে এবং

উড়িষ্যার উপকূলে জাপ বিমানবহর হানা দিয়াছিল। সমুদ্রপথে বিমানবাহী জাহাজযোগে সেই আক্রমণ ঘটিয়াছিল। কিন্তু চট্টগ্রামে সম্ভবতঃ সমুদ্রপথের দিক হইতে আক্রমণ ঘটে নাই, ঘটিয়াছে আকিয়াব হইতে। ব্রহ্ম সংগ্রামের পর চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ নিতান্ত অপ্রত্যাশিত ছিল না। বিশেষতঃ আকিয়াব হাতছাড়া হওয়ায় সেই সম্ভাবনা আরও নিকটতর বলিয়া অনুভূত হইয়াছিল। আরাকানের উপকূলভাগস্থ আকিয়াবকে বাঙ্গলা ও ব্রহ্মের শেষ সীমা বলা যাইতে পারে। জাপ সৈন্যেরা এখানে জলপথ দিয়া আসে নাই, আসিয়াছে আরাকানের দুর্গম স্থলপথ ধরিয়া।* ব্রহ্মদেশের টেনাসেরিম বিভাগ যেমন দীর্ঘ ও সঙ্কীর্ণ সূতার মত নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়াছে, চট্টগ্রাম বিভাগকেও কতকটা তেমন বলা যায়। উহা নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়িয়া আরাকানের সঙ্গে মিশিয়াছে। আরাকান ও চট্টগ্রাম টেনাসেরিম বিভাগের মতই পাহাড়, নদী, অরণ্য ও বন্ধুর ভূমির বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। আধুনিক যুদ্ধের যন্ত্রবিজ্ঞান প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ও বিঘ্নকে বার বার অস্বীকার করিতেছে এবং রণকৌশলের দুঃসাহসের দ্বারা সেগুলি অতিক্রান্ত হইতেছে।

জাপানী বোমারু বিমানের চট্টগ্রামে হানা দেওয়ার অর্থ কি? এই পর্য্যন্ত একমাত্র অষ্ট্রেলিয়ার বন্দর ছাড়া জাপানীরা অন্য কোথাও বিনা উদ্দেশ্যে বিমান আক্রমণ করে নাই। 'বিনা উদ্দেশ্যে' বলিবার অর্থ এই যে, বোমাবর্ষণের পর স্থলপথে অভিযান ও আক্রমণের মতলব না লইয়া জাপ বোমারুরা হানা দেয় নাই। জাপানী বিমানবাহিনীর

* এই বিষয়ে মতবিরোধ আছে। চুংকিংয়ের চীনা কর্ত্তৃপক্ষীয় মহলের মতানুসারে জাপানীরা ক্ষুদ্র নৌ-বহরযোগে আকিয়াবে অবতরণ করিয়াছে, আর নয়াদিল্লীর কর্ত্তৃপক্ষের মতানুসারে তাহারা আসিয়াছে আরাকান প্রদেশের পার্ব্বত্যপথ ধরিয়া।

একটা বৈশিষ্ট্য স্মরণে রাখা উচিত। উহা বৃটেনের শক্তিশালী আর-এ-এফ বা রাজকীয় বিমান বাহিনীর মত কোন পৃথক ও বিচ্ছিন্ন সামরিক বাহু নহে। বৃটিশ বিমানবহরের সহযোগিতা যেমন নৌ-বাহিনী ও স্থলবাহিনীর সহিত রহিয়াছে, তেমনই কেবলমাত্র বোমা বর্ষণের উদ্দেশ্য লইয়া বিচ্ছিন্নভাবেও সে অভিযান করিয়াছে এবং করিতেছে। বর্তমানে জার্ম্মাণীতে, অধিকৃত ফ্রান্সে ও বেলজিয়ম ইত্যাদিতে বৃটিশ বিমানবহর নৌ ও স্থলবাহিনীর অপেক্ষা না রাখিয়া বোমারু অভিযান চালাইতেছে। কিন্তু জাপানী বিমানবহর সাধারণতঃ স্থল ও নৌবাহিনীর সহযোগিতা ছাড়া চলে না। তাহারা কোন 'স্বাধীন' ও বিচ্ছিন্ন সামরিক বাহু নহে। সুতরাং প্রশ্ন উঠিতে পারে চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণ কি বাঙ্গলাদেশ আক্রমণের উদ্যোগ পর্ব্ব? কিম্বা ইঁহার উদ্দেশ্য কেবল চট্টগ্রামকে নৌ ও বিমানপথে অকেজো করিবার চেষ্টা অথবা জাপানীদের অন্য কোন গুরুতর মতলব আছে? বর্ত্তমানে উত্তর ব্রহ্ম হইতে জাপানীরা লাসিওর চীন-ব্রহ্ম সড়ক ধরিয়া বহুদূর পর্য্যন্ত চীনা রাজ্যে ঢুকিয়া পড়িয়াছে। চীনকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করাই ইহার লক্ষ্য। 'রয়টারের' সমর সমালোচক বলিয়াছিলেন, মিত্রপক্ষীয় বৃটিশ ও ভারতীয় বাহিনী সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের দিকে পিছু হটিতেছে। চিন্দুইন নদীতীর ধরিয়া কি জাপানীরা মণিপুরের সীমানায় পৌছিবে? বৃটিশ সৈন্যরা চিন্দুইন এলাকায় রহিয়াছে বলিয়া প্রকাশিত হইয়াছিল। জাপানীদের কার্য্যকলাপ দেখিয়া এমন সন্দেহ হওয়া অস্বাভাবিক নহে যে, তাহারা মণিপুর সীমা ধরিয়া আসামের উপর চাপ দিবে। হয়তো দুর্গম পথের জন্য এই চাপ যথেষ্ট প্রবল হইবে না। শুধু পশ্চাৎ দিক হইতে বিপন্ন করার ইহা কৌশলমাত্র। অন্যপক্ষে তাহারা আকিয়াব ও চট্টগ্রামের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবে এবং এইভাবে পূর্ব্ব

বাঙ্গলা ও ব্রহ্মের সীমান্ত ধরিয়া আসাম ও বাঙ্গলাদেশকে বিপন্ন করিতে চাহিবে। জাপানীরা আকিয়াবে পৌছায় এবং চট্টগ্রামে হানা দেওয়ায় কলিকাতা, ঢাকা ও নোয়াখালী সম্পর্কে যথেষ্ট উদ্বেগের কারণ ঘটিল। কারণ এগুলি এক্ষণে জাপ বোমারুর পাল্লায় পড়িল। মানচিত্রের উপর সোজা স্কেল ধরিয়া হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, বিমানপথে আকিয়াব হইতে চট্টগ্রাম ১৯০ মাইল, কলিকাতা ৩৪০ মাইল এবং ঢাকাও প্রায় ৩৪০ মাইল। অপর পক্ষে চট্টগ্রাম হইতে কলিকাতা বিমানযোগে বোধ হয় ২২৫ মাইলের বেশী নহে। সুতরাং জাপ বোমারু বিমান সম্পর্কে আর ঔদাসীন্য বা অলস গবেষণার স্থান নাই। তাহারা কেবল চট্টগ্রামে বোমা ফেলিয়াই ক্ষান্ত থাকিবে, এমন মনে করিবার কারণ নাই। কলিকাতা ও মাদ্রাজের উপরও তাহারা যুগপৎ হানা দিতে পারে। যদি এই বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য আক্রমণ না হইয়া থাকে, তবে অন্ততঃ ভারতবর্ষের উপকূলভাগের ঘাঁটি নষ্ট করিয়া বঙ্গোপসাগরে ও ভারত মহাসাগরে জাপ নৌবহরের পূর্ণ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ইহা যে দুঃসাহসিক চেষ্টা, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অষ্টম অধ্যায়

—:*:—

(৫)

আসাম ও পূর্ব্ববঙ্গ

২০শে মে, '৪২।

ব্রহ্মদেশের সংগ্রামের পর জাপানীরা কোন্ দিকে অগ্রসর হইবে, ইহা যেমন গবেষণার বিষয় তেমনি ভারতবর্ষের দিকে অগ্রসর হইলে তাহারা স্থলপথে ও জলপথে আক্রমণ চালাইবে কিম্বা কেবলমাত্র বোমা-বর্ষণের মধ্যেই তাহাদের যুদ্ধ নিবদ্ধ রাখিবে, ইহাও আলোচনার বিষয়। যদি তাহারা স্থলপথে অগ্রসর হয়, তবে তাহারা প্রথমে আসাম আক্রমণ করিবে কিম্বা পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম একযোগে লাঞ্ছিত হইবে? অথবা জাপানীরা কেবলমাত্র ভারতবর্ষের উপকূলবর্ত্তী বন্দরের দিকেই তাহাদের আক্রমণ সীমাবদ্ধ রাখিবে?—এই ধরণের অনেক প্রশ্ন রণনীতির দিক হইতে সংশয় সৃষ্টি করিতেছে। একথা

সত্য যে, ভারতবর্ষ বিশাল দেশ, আসাম হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত সমগ্র ভূভাগে জাপানের পক্ষে আক্রমণ চালান একটা দুঃসাহসিক কল্পনার মত। একদিকে অষ্ট্রেলিয়া, আর একদিকে চীন. এবং তাহার পিছনে সোভিয়েট রাশিয়া, এতগুলি রাষ্ট্রশক্তিকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জাপানের পক্ষে গোটা ভারতবর্ষ গিলিবার চেষ্টা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তথাপি জাপানের নিজস্ব রণনীতির বিচারে কয়েকটি প্রশ্ন ভাবিবার আছে। জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের মনে দীর্ঘকাল যাবৎ ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের জন্য লোভ ছিল। কোন কোন জাপ সেনাপতি হংকং ও সিঙ্গাপুর দখলের পর এক আঘাতে ভারতবর্ষ ছিনাইয়া লইবার দুঃস্বপ্নও রচনা করিয়াছিলেন। সেই সমস্ত প্ল্যানের অধিকাংশ ইতিমধ্যেই কার্য্যক্ষেত্রে পালিত হইয়াছে। এপর্য্যন্ত জাপানীরা যে সমস্ত দেশের স্বাধীনতা হরণ করিয়া নিজেদের সাম্রাজ্য বৃদ্ধি করিয়াছে, তাহার পরিমাণ ও ঐশ্বর্য্য প্রচুর। এমন কি এই হিসাবে জার্ম্মাণীর চেয়ে জাপান বেশী লাভবান। কিন্তু এই দেশগুলি জাপানীরা নিশ্চয়ই সুরক্ষিত করিতে চাহিবে অর্থাৎ জাপানীরা বর্ত্তমানে যে দুর্দ্দান্ত আক্রমণাত্মক নীতি চালাইতেছে, এক সময়ে উহা ক্ষান্ত হইবেই এবং মিত্রশক্তিবর্গ পাল্টা আক্রমণাত্মক অভিযান চালাইবেন। এই পাল্টা আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য জাপান নিশ্চয়ই চিন্তা করিতেছে। ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার পক্ষে ব্রহ্মদেশ যেমন দূরবর্ত্তী ঘাঁটি, তেমনই ভারতবর্ষ হইতে পাল্টা আক্রমণের ক্ষেত্রে আসাম ও পূর্ব্ব বাঙ্গলা ব্রহ্মদেশের পক্ষে একান্ত নিকটবর্ত্তী ঘাঁটি। আসাম ও পূর্ব্ব বাঙ্গলা যদি ঘাঁটি হইয়া থাকে, তবে ইহার সংশ্লিষ্ট জলপথ বা বঙ্গোপসাগরও সেই হিসাবে জরুরী প্রয়োজনের মত। যদি এই অনুমান সত্য হইয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মদেশে শক্ত হইয়া বসিবার জন্য জাপান হয়তো

আসাম ও পূর্ব্ব বাঙ্গলা আক্রমণ করিতে চাহিবে। পূর্ব্ববঙ্গ ও আসামের কোন বৃহৎ নদীর উপত্যকা পর্য্যন্ত জাপানী অগ্রগতির সম্ভাব্যস্থল বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের চট্টগ্রামে এবং আসামের পূর্ব্ব সীমানাবর্ত্তী কোন কোন সহরে ইতিমধ্যেই জাপানী বোমারু হানা দিয়াছে। চট্টগ্রামে বোমাবর্ষণের উদ্দেশ্য এখনও স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে না। তবে যুদ্ধ যখন আসামের প্রান্তলগ্ন পশ্চিম ব্রহ্মের সীমানা পর্য্যন্ত পৌছিয়াছে, তখন আসামের বুকে জাপ বোমারুর আবির্ভাব অসম্ভব বা অপ্রত্যাশিত নহে। চিন্দুইন নদী ব্রহ্মদেশ ও আসামের সীমান্তপথ ধরিয়া প্রবাহিত। জাপানীরা এই নদী অতিক্রম করিয়াছে। সুতরাং শত্রুসৈন্য আসামের অদূরবর্ত্তী সীমানার দ্বার-দেশে দণ্ডায়মান বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। শিলংয়ের একটি সংবাদে প্রকাশ যে, আসাম সামরিক ও বে-সামরিক উভয় দিক দিয়া আক্রমণকারীকে বাধা দেওয়ার জন্য সর্ব্বতোভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। গত কয়েক সপ্তাহের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্যবল ও অস্ত্রবল আসামে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যদি কোন দুঃসাহসী শত্রু স্থলপথে বা আকাশপথে আসাম আক্রমণে উদ্যত হয়, তবে, উহাকে যথোচিত শিক্ষা দেওয়া হইবে এমন ভরসা কর্তৃপক্ষ দিতেছেন। আসামের জনসাধারণ শান্ত ও সংযত আছেন।

আধুনিক রণনীতিতে বোমারু আক্রমণ একটা অপরিহার্য্য অঙ্গ। এই আক্রমণের প্রথম উদ্দেশ্য বিপক্ষের পশ্চাদ্ভাগে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করা। জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস সঞ্চার করিতে পারিলে গবর্ণমেণ্টের পক্ষে দৈনন্দিন শাসনকার্য্য চালাইবার বিভ্রাট হইবে এবং উহার ফলে সামরিক কার্য্যকলাপও বাধাগ্রস্ত হইবে। কোনও দেশ আক্রমণ করিবার পূর্ব্বে উহার জনসাধারণকে ভীতিবিহ্বল করিয়া দেওয়ার অর্থ

সেই দেশের রাষ্ট্রশক্তিকে কাবু করা এবং রাষ্ট্রশক্তি যদি অসামরিক ব্যাপারেই ২৪ ঘণ্টা ব্যতিব্যস্ত থাকে, তবে যুদ্ধ চালাইবে কিরূপে? এই জন্য সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বোমাবর্ষণ উপেক্ষা করিয়া জনসাধারণের ধীরস্থির থাকা, সংযম ও সাহস সহকারে এই দুর্ব্বিপাকের সম্মুখীন হওয়া। ব্যাপক আকারে কলেরা বা বসন্ত দেখা দিলে জনসাধারণের যতটুকু সতর্কতা ও সাহস অবলম্বনের প্রয়োজন, শত্রুর আক্রমণের মুখেও তেমন নীতি অনুসরণযোগ্য। আর যদি জনসাধারণ ঘাবড়াইয়া গিয়া যত্রতত্র ছুটাছুটি করিতে থাকে, তবে উহাদ্বারা ঘোরতর বিশৃঙ্খল অবস্থার সৃষ্টি হইবে। প্রকৃতপক্ষে এমন আচরণের দ্বারা শত্রুকেই সাহায্য করা হইবে। সুতরাং আসামের জনসাধারণের প্রয়োজন ধৈর্য্য ও সাহসের। খাদ্য, পানীয়, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, লোকজন অপসারণ, শরণাগতকে আশ্রয় দান, চিকিৎসা, শুশ্রূষা, শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা, পরস্পরকে সাহায্যদান ও সহযোগিতা করা ইত্যাদি অসংখ্য প্রশ্ন আসামের (এবং বাঙ্গলার) সম্মুখে রহিয়াছে। আসামে যে সমস্ত পাহাড়িয়া জাতি আছে তাহারা যাহাতে কোন সঙ্কটের সুযোগ লইতে না পারে, তেমন সতর্কতা অবলম্বন করা আসামের গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের কর্ত্তব্য। আসাম সরকার নিশ্চয়ই এই দিক দিয়া সচেতন।

আসামে খুব ব্যাপক বোমাবর্ষণ হইবে বলিয়া মনে হয় না। ওখানে কোন বন্দর ও নৌঘাঁটি নাই এবং কলিকাতা বা লণ্ডনের মত কোন বড় সহরও নাই। শ্রমশিল্পের সহর হিসাবেও আসাম লোভনীয় নহে। আসামের এই অবস্থাটা স্থলপথে অভিযানের উপর কিছু প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। অনেক সময় বড় বড় নগর, বন্দর ও দুর্গ ইত্যাদিকে কেন্দ্র করিয়া প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতে থাকে। প্রচুর কামানের গোলা ও বোমাবর্ষণের দ্বারা বৃহৎ নগরীকে

যেভাবে ধ্বংস করার প্রয়োজন হইয়া থাকে, আসামের পক্ষে তেমন সমস্যা দেখা দিবে না। ভৌগোলিক কারণে যে কোন শত্রুর পক্ষেই আসাম আক্রমণ দুরূহ ব্যাপার। দুর্গম অরণ্য ও পাহাড় আসামের বৈশিষ্ট্য। জাপানীরা হয়তো ছোট ছোট দলে বিভক্ত হইয়া বিভিন্ন স্থানে প্রবেশ করিতে চাহিবে। এই সমস্ত ক্ষুদ্র দলবিভক্ত শত্রু-সৈন্যকে প্রতিরোধ বা ঘায়েল করা আদৌ কঠিন নহে। গরিলা যুদ্ধের পক্ষে আসাম অত্যন্ত উপযোগী, যেমন উপযোগী পূর্ব্ব বাঙ্গলা। নগর ও বন্দর-প্রধান দেশে যে ধরণের ব্যাপক অভিযান ঘটিয়া থাকে, আসামের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের জন্য তাহা সম্ভব হইবে না। সুতরাং আসামের জনসাধারণের ভীত হইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। বরং তাহাদের ইতিহাসে নূতন কিছু ঘটিবে। এই পর্য্যন্ত ভারতবর্ষে বহিঃশত্রুর যত আক্রমণ হইয়াছে, সমস্তই ঘটিয়াছে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়া। খাইবার ও বোলান গিরিবর্ত্ম এ কারণে ইতিহাস-প্রসিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব্ব সীমানা কোন বহিঃ-শত্রুর আক্রমণে এই পর্য্যন্ত রক্তলাঞ্ছিত হয় নাই। প্রাচীন বা মধ্য যুগে যাহা ঘটে নাই, হয়তো আধুনিক যন্ত্রযুগে তাহাই ঘটিতে পারে। পূর্ব্ববঙ্গের নদীপথ ও নরম মাটী এবং আসামের অরণ্যপথ ও পার্ব্বত্য মাটী এজন্য প্রস্তুত।

অষ্টম অধ্যায়

—:*:—

(৬)

কলিকাতায় বিমান আক্রমণ

২১শে ডিসেম্বর, '৪২।

মে মাসের প্রথম ভাগে চট্টগ্রামে দুইবার বিমান হানার পর জাপানীরা সম্পূর্ণ নিঃশব্দ থাকে। একাদিক্রমে প্রায় ৬ মাস কাটিয়া গেল। ব্রহ্মদেশের পর কলিকাতায় বিমান আক্রমণ অনুষ্ঠিত হইবে আশঙ্কা করিয়া কলিকাতা হইতে গত শীতকালেই লক্ষ লক্ষ লোক চলিয়া গিয়াছিল। তারপর মে মাসে চট্টগ্রামে বোমা বর্ষিত হইল। জাপানীরা স্থলপথে না হইলেও আকাশপথে ও জলপথে যে ভারতবর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী চট্টগ্রামে হানা দিবে, এমন ধারণা দৃঢ়তর হইল। কিন্তু চট্টগ্রামে বিমান আক্রমণের পর ৬ মাস অতিক্রান্ত হইল। ৬ মাসের মধ্যে জাপান ভারতবর্ষের দিকে অভিযান না করায় জনসাধারণের মধ্যে

পুনরায় আত্মবিশ্বাস ফিরিয়া আসিল। এই দীর্ঘকাল ধরিয়া জাপান চীনে এবং দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরে ব্যতিব্যস্ত ছিল। ব্রহ্ম-দেশ দখলের পর সেই দেশে শক্ত হইয়া বসিবার জন্য এই দীর্ঘকাল তাহারা উদ্যোগ আয়োজনও করিতেছিল। অপর পক্ষে ভারতবর্ষ হইতে ইঙ্গ-ভারতীয় সমর-কর্ত্তৃপক্ষ ব্রহ্মদেশে পশ্চাৎ আক্রমণের ভূমিকাস্বরূপ চট্টগ্রামের দক্ষিণস্থ আরাকানে প্রবেশ করিল। চারিদিকে এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইতে লাগিল যে, গত ৬ মাসের জাপ নিষ্ক্রিয়তা যে কোনভাবে আবার ক্রূরতার আকারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে, এমন সম্ভাবনা দেখা দিল। জাপান কর্ত্তৃক যুদ্ধ ঘোষণার পর হইতে গত এক বৎসরের মধ্যে কলিকাতা সহরে বোমা বর্ষিত হয় নাই। অবশেষে ২১শে ডিসেম্বর সত্যসত্যই কলিকাতা অঞ্চলে জাপানী বিমানের আক্রমণ ঘটিল। কিন্তু সেই আক্রমণ ব্যাপক নহে এবং প্রাণ ও সম্পত্তির অতি সামান্য ক্ষতিই হইয়াছে।

কলিকাতা অঞ্চলে বোমাবর্ষণের বৈশিষ্ট্য এই যে, প্রথম আক্রমণ (first raid) রাত্রিবেলায় অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জাপানীরা আর কোথাও প্রথম আক্রমণ রাত্রিবেলা করে নাই, দিনের বেলাই করিয়াছে। রেঙ্গুণে প্রথম আক্রমণ দিনের বেলা হইয়াছিল এবং তারপর ক্রমাগত আক্রমণের পথে জ্যোৎস্না পুলকিত রাত্রে এবং ভোর রাত্রেও তাহারা আক্রমণ চালাইয়াছে। রেঙ্গুণে জাপানীরা যে কারণে ব্যাপক বিমান-হানার দ্বারা গুরুতর প্রাণহানি ও সম্পত্তিহানি ঘটাইতে পারিয়াছিল, কলিকাতায় তাহা সম্ভব নহে। শ্যাম দেশের সীমান্তবর্ত্তী বিমান ঘাঁটি হইতে রেঙ্গুণের দূরত্ব দেড়শত হইতে দুইশত মাইলের মধ্যে ছিল। রেঙ্গুণ সহর অট্টালিকা-প্রধান নহে, কাষ্ঠনির্ম্মিত গৃহই সেখানে বেশী এবং সব চেয়ে বড় কথা রেঙ্গুণবাসীরা অত্যন্ত অসাবধান ও

অসতর্ক ছিল। বিমান আক্রমণের সময় তাহারা আড়াল বা আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। কিন্তু রেঙ্গুণের তিক্ত অভিজ্ঞতা হইতে কলিকাতা-বাসীরা সাবধান হইতে শিখিয়াছেন। তাঁহারা প্রয়োজন মত গৃহ, গর্ত্ত এবং অন্যান্য আশ্রয়স্থলে প্রবেশ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া এ-আর-পি'র শিক্ষা, প্রচারকার্য্য ও সাবধান বাণীতে কলিকাতাবাসীরা বোমা বর্ষণের সময় তাঁহাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে সজাগ হইয়াছেন।

জাপানী বিমানবহরের সংগঠন ও বিধিব্যবস্থা যে ধরণের তাহাতে উহা প্রধানতঃ সৈন্যবাহিনীর সহযোগীরূপেই ছিল। অর্থাৎ জার্ম্মানী বা বৃটেনের বিমানবহরের যেমন একটি পৃথক সত্তা ও সংগঠন আছে জাপানীদের তেমন নহে। অন্ততঃ যে ৬ মাসকাল জাপান 'ব্লিজক্রিগ' চালাইয়াছে, উহার অধিকাংশ সময়েই জাপ বোমারুর একদল সৈন্যবাহিনীর কিম্বা নৌবহরের সহযোগীরূপে কার্য্য করিয়াছে। ১৯১৪-১৮ সালের যুদ্ধে কামানের গোলাবর্ষণই ছিল পদাতিক দলের অভিযানের সঙ্কেত। বড় বড় কামানের অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণের আড়াল ধরিয়া পদাতিক সৈন্যেরা অগ্রসর হইয়াছে। এবার যান্ত্রিক সংগ্রামের রণনীতি এই রণকৌশলের পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছে। এবার বোমারুর বোমাবর্ষণই যান্ত্রিক দলের অভিযানের ইঙ্গিত করিতেছিল। ইতস্ততঃ দুই চারিটি দৃষ্টান্তের (যেমন অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট ডারুইন) ব্যতিক্রম ছাড়া ব্রহ্মযুদ্ধ পর্য্যন্ত জাপানী বোমারুর আমরা এই রণ-নীতিই প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কিন্তু আসাম, চট্টগ্রাম, ফেণী ও কলিকাতায় এখন পর্য্যন্ত সেই রণকৌশলের ব্যতিক্রম দেখিতেছি। অবশ্য এমন কথা নিশ্চিতরূপে কেহই বলিতে পারে না যে, জাপানীরা কিছুতেই ভারতবর্ষে অভিযান বা invasion করিবে না, কেবল বোমাবর্ষণের মধ্যেই তাহাদের সমস্ত কার্য্যকলাপ সীমাবদ্ধ থাকিবে।

যুদ্ধ যখন চলিতে থাকে, তখন এক একটি দেশ যবনিকা অন্তরালে এক এক রকমের পন্থা ও কৌশলের আয়োজন করিতে থাকে। দূর হইতে কেবল পুঁথিগত বিদ্যার দ্বারা উহার সম্যক বিচার সম্ভব নহে। তবে প্রকাশিত তথ্য ও সাধারণ রণনীতির বিচারে মনে হয় যে, স্থলপথে বর্ত্তমান মুহূর্ত্তে জাপানী অভিযানের সম্ভাবনা অত্যন্ত কম এবং আকাশপথে দৌরাত্ম্য বৃদ্ধিরই একান্ত সম্ভাবনা। সৌভাগ্যের বিষয় মিত্রপক্ষ ভারতবর্ষে সমরায়োজনের যথেষ্ট সময় পাইয়াছেন। মালয় বা ব্রহ্মদেশের অবস্থা ভারতবর্ষে ঘটিবে না। কারণ, মালয় বা ব্রহ্মদেশ হইতে ক্রমাগত পিছু হটিবার সুযোগ থাকিলেও ভারতবর্ষ হইতে আর পশ্চাদপসরণের সুযোগ নাই। ঐরূপ অবস্থায় মিত্রপক্ষ কোথায় দাঁড়াইয়া জাপানকে পাল্টা আক্রমণ করিবেন? সুতরাং ব্রহ্মদেশ বা মালয়ের মত অবস্থার পুনরাবৃত্তির প্রশ্ন ভারতবর্ষের পক্ষে অবান্তর। মিত্রপক্ষ এখানে এমনভাবে প্রস্তুত হইয়াছেন যে, জাপানীদের পক্ষে অভিযান যেমন কষ্টকর, বিমান হানা দেওয়াও তেমনি শক্ত। এজন্যই সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে ইঙ্গিত করা হইয়াছে যে, জাপানী বোমারু রাত্রিবেলায় কলিকাতা আসিয়াছে, দিনের বেলা নহে। অর্থাৎ সহর রক্ষার আয়োজন এত ব্যাপক ও পাকা রকমের যে, দিনের বেলায় এখানে বিমানহানা দেওয়া শক্ত—সরকারী বিজ্ঞপ্তির ইহাই অর্থ।

২৬. ১২. '৪২.

গত বৃহস্পতিবার রাত্রিতে পুনরায় জাপানী বোমারু বিমান কলিকাতা অঞ্চলে হানা দিয়াছিল। এই পর্য্যন্ত চারবার জাপ বিমান

উৎপাত সৃষ্টি করিল। সরকারী মতে বৃহস্পতিবার রাত্রের বিমান হানায় কিছু লোক হতাহত ও কিছু ক্ষতি সাধিত হইয়াছে। কতকগুলি বোমা যত্রতত্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। ইহার আগে তিন রাত্রি যে সমস্ত জাপ বোমারু আসিয়াছিল, সেগুলি মাত্র একসঙ্গে একবারই হানা দিয়াছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার রাত্রে তাহারা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া আসিয়াছিল। দ্বিতীয় দল প্রথম দলের প্রায় এক ঘণ্টা পরে আসিয়াছিল। কিন্তু সংখ্যায় সেগুলি বেশী ছিল না। বিমান-মারা কামান ও জঙ্গী বিমানগুলি রাত্রির ঊর্দ্ধ আকাশে উহাদিগকে বাধা দিয়াছিল। উভয় পক্ষে কিছু সংঘর্ষও হইয়া গিয়াছে। একখানা জাপ বোমারু ভাঙ্গিয়া নীচে পড়িয়া গিয়াছে। বোধহয় কলিকাতা অঞ্চলে ইহাই প্রথম শত্রু বিমানের পতন। এই কয়দিনে নগরবাসীরা বিমান হানার যথেষ্ট স্বাদ পাইয়াছেন এবং ক্রমেই তাঁহারা অভ্যস্ত হইয়া উঠিতেছেন। এতদিন পর্য্যন্ত আমরা কেবল বিদেশের রোমাঞ্চকর ও উত্তেজনাপ্রদ গল্প ও সংবাদ শুনিয়াছি। যে সমস্ত সহরের উপর বোমারু বিমান ধ্বংসলীলা বিস্তার করিয়াছে, সে সমস্ত বাসিন্দাদের প্রতি আমরা গভীর সহানুভূতি অনুভব করিয়াছি এবং তাঁহাদের সাহস ও ধৈর্য্যের অকৃত্রিম প্রশংসা করিয়াছি। এই বিষয়ে লণ্ডন মহানগরীর দৃষ্টান্তই সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। ক্রমাগত ৯ মাসকাল ইংলণ্ডে বোমা বর্ষিত হইয়াছে এবং যে ধরণের ব্যাপক বিমানহানা বা mass air raid লণ্ডনে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব। তথাপি লণ্ডন নগরীর জীবন-যাত্রা অচল হয় নাই। সামরিক কর্ত্তৃপক্ষ, গভর্ণমেণ্ট এবং জনসাধারণ একযোগে একটি মেসিনের মত কার্য্য করিয়াছেন। কলিকাতার সম্মুখে সেই অগ্নিপরীক্ষা। এখন পর্য্যন্ত খুব সামান্য সংখ্যক বিমান (বোধ হয় ৫।৭ খানার বেশী নহে) কলিকাতা অঞ্চলে হানা দিয়াছে,

কিন্তু ইহার চেয়েও বেশী সংখ্যায় যে আসিতে পারে, সেই অনুমান করিয়া রাখাই বুদ্ধিসম্মত। বিমান আক্রমণের একটা উল্লেখযোগ্য প্রশ্ন এই যে, এই আক্রমণকে সম্পূর্ণরূপে প্রতিরোধ করা যায় না। বিমান-মারা কামান, জঙ্গী-বিমানের লড়াই এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা যত নিখুঁত এবং যত ব্যাপকই হউক না কেন, দ্রুতগতিশীল বোমারুগুলিকে একেবারে অকেজো করা যায় না। বোমারুগুলি কত উর্দ্ধে আসিতেছে এবং কি পরিমাণ বেগে আসিতেছে, অর্থাৎ altitude and speed, এই দুইটি প্রশ্ন আক্রমণের সময় সঠিকরূপে বুঝা যায় না। ফলে বিমান-মারা কামানের গোলা দাগিয়া পাখীর মত দ্রুত উড্ডীয়মান ও গতিশীল বিমানগুলিকে বিদ্ধ করা আদৌ সহজ নহে। এ কারণেই লণ্ডনের মত সুরক্ষিত নগরীতেও বোমারু বিমানের ব্যাপক উপদ্রব রোধ করা যায় নাই। আবার জঙ্গী-বিমানের পাহারায় বিমানগুলি আসিলে (সাধারণতঃ সেভাবেই তাহারা আসিয়া থাকে), অপরপক্ষের জঙ্গী-বিমানগুলি উহাদিগকে রোধ করিতে নিযুক্ত থাকে এবং সেই ফাঁকে বোমারুগুলি ছোঁ মারিতে কিম্বা বোমাবর্ষণ করিতে থাকে। জন্তু জগতের সহিত তুলনা দিয়া বলা যাইতে পারে যে, এ যেন শিয়ালের কুকুরছানা চুরির মত। একটি শিয়ালকে যখন কুকুর তাড়া করিয়া দূরে ধাওয়া করিল, সেই ফাঁকে আর একটি শিয়াল আসিয়া ছানাগুলিকে ঘাড় মট্‌কাইয়া লইয়া গেল। জঙ্গী-বিমান ও বোমারু বিমান একত্রে আসিলে প্রায় এই ধরণের রণ-কৌশলই অনুসৃত হইয়া থাকে। এজন্যই দেখা যায় যে, সর্ব্বোৎকৃষ্ট সামরিক ব্যবস্থা থাকিলেও বিমান আক্রমণ ও বোমাবর্ষণ সম্পূর্ণরূপে ঠেকানো যায় না।

কিন্তু বোমাবর্ষণ সর্ব্বাংশে প্রতিরোধ করিতে না পারা গেলেও শত্রু-

পক্ষেরও সমস্ত উদ্দেশ্য সফল হইতে পারে না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, বিমান হইতে বোমাগুলি প্রায়শঃই লক্ষ্যবস্তুর উপর পড়ে না। বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া এবং প্রাণ হাতে করিয়া তাহাদেরও আসিতে হয়। বিমানগুলি হয়তো ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে ছুটিতেছে। বহু ঊর্দ্ধ হইতে অপরিচিত দেশে অজ্ঞাত লক্ষ্য-বস্তুর উপর তাহাদিগকে বোমা ফেলিতে হইবে। যেখানে এক সেকেণ্ডের হিসাবও নির্ভুল হওয়া দরকার, সেখানে ৫ হাজার ১০ হাজার বা ১৫ হাজার ফুট ঊর্দ্ধ হইতে ঘণ্টায় ২৫০ মাইল বেগে ধাবমান বোমারুর পক্ষে লক্ষ্য স্থির করা কত কঠিন, তাহা সহজেই অনুমেয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধের ইতিহাসে দেখা গিয়াছে যে, একটি সেতুর উপর ১০।১২ বার বোমারু বিমান হানা দেওয়া সত্বেও সেতু অক্ষত রহিয়াছে। বিমান আক্রমণে লক্ষ্যভেদের এই ব্যর্থতার জন্যই শেষ পর্য্যন্ত ব্যাপক বিমানহানার দিকে আক্রমণকারীকে ঝুঁকিতে হয়। বিশল্যকরণি চিনিতে না পারিয়া গোটা গন্ধমাদন পর্ব্বত বীর হনুমান যেমন উপড়াইয়াছিলেন, বৈমানিক বীরগণও মাঝে মাঝে তেমন বেপরোয়া পন্থা অনুসরণ করেন। তথাপি কেবল বিমানহানার দ্বারাই কোন দেশ ও নগরী জয় করা যায় না, কিম্বা গভর্ণমেণ্টকে ছত্রভঙ্গ করা যায় না। ষ্ট্যালিনগ্রাদ সহরের উপর হাজার বিমান একযোগে আক্রমণ করিয়াছিল, তথাপি সেই সহরের পতন হয় নাই। পশ্চিম জার্ম্মাণীতে হাজার বৃটিশ বিমান এক রাত্রে হানা দিয়াছিল, তবু হিটলার দন্তে তৃণ ধারণ করেন নাই এবং ইংলণ্ডের উপর অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষণ করিয়াও ইংরাজ জাতিকে নত করা যায় নাই। এগুলি ঐতিহাসিক সত্য, কোন গল্প নহে। সুতরাং কেবল বিমানহানার দ্বারাই একটা সহর বা একটা দেশকে কাবু করা যায় না। কিন্তু ইহার জন্য চাই

গভর্ণমেণ্টের সংগঠন ক্ষমতার নৈপুণ্য, সামরিক কর্তৃপক্ষের বাধাদান শক্তির প্রচণ্ডতা এবং সরকারী ও বে-সরকারী চেষ্টার পরিপূর্ণ সহযোগিতা।

কলিকাতায় কি ধরণের বোমা পড়িয়াছে, সেই সম্পর্কে জনসাধারণের কৌতূহল স্বাভাবিক। এই বিষয়ে একটা আধা সরকারী ইস্তাহারে বলা হইয়াছে :—

"গত রাত্রে শত্রু-হানাদার বিমান দুই দলে হানা দিতে আসে। পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বহু দূরবর্ত্তী অঞ্চলে বোমা পড়ে। হানাদাররা বিশেষ করিয়া 'এ্যাণ্টি-পারসোন্যাল' বোমাই ফেলে। এই বোমা খোলা জায়গায় অবস্থিত লোকদের বিরুদ্ধেই বিশেষ করিয়া কার্য্যকরী। অসামরিক লোকদের মধ্যে অনেককে হতাহত করিয়া তাহাদের মধ্যে ত্রাসের সঞ্চারই আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কয়েকটি বোমা বসতিপূর্ণ অঞ্চলে পড়ে। ইহার ফলে জানালার কাঁচ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বোমার টুকরায় কয়েকটি বাড়ীর দেওয়াল ও কতিপয় 'বিফল প্রাচীরে' ছোট ছোট গর্ত্ত হইয়া যায়। ইহার দ্বারাই 'বিফল প্রাচীরের' কার্য্যকারিতা প্রতিপন্ন হইতেছে। টুকরাগুলি কোন ক্ষেত্রেই দেওয়াল ভেদ করিতে পারে নাই। যাঁহারা এই সমস্ত প্রাচীরের পিছনে অবস্থান করিতেছিলেন, তাঁহারা সকলেই সম্পূর্ণরূপে নিরাপদ ছিলেন। খুব কম লোকই হতাহত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই আশ্রয় লয় নাই। দালান কোঠার ক্ষতির পরিমাণ নগণ্য। হানাদাররা যেরূপ এলোপাথারিভাবে কলিকাতার উপর আসে এবং দূরে দূরে বোমা ফেলে, তাহা হইতে মনে হয় যে,

আমাদের প্রতিরোধক ব্যবস্থায় তাহাদিগকে বিশেষভাবে বিব্রত হইতে হয়।"

যে সমস্ত দালান কোঠা, বাজার বা বস্তীতে বোমা পড়িয়াছে, সেগুলি লক্ষ্য করিলেও দেখা যাইবে যে, বোমাগুলি খুব সাংঘাতিক ধরণের নহে। সাধারণতঃ হাই-এক্সপ্লোসিভ বোমা পড়িলে যেরূপ ব্যাপক ধ্বংসলীলা সাধিত হয়, এখন পর্য্যন্ত তেমন মারাত্মক কিছু হয় নাই। ক্ষতি যদি কোথাও হইয়া থাকে, তবে উহা সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ রহিয়াছে। সাধারণতঃ ছবিতে লণ্ডনের গৃহাদি ধ্বংসের যে হৃদয়বিদারক দৃশ্য আমরা দেখিয়াছি এবং অট্টালিকাশ্রেণীর বিচূর্ণ ও বিধ্বস্ত অবস্থা জনসাধারণের মধ্যে যে ত্রাস সঞ্চার করে, কলিকাতা অঞ্চলে তেমন ভয়াবহ কিছু ঘটে নাই। ইহার কারণস্বরূপ আধা-সরকারী ইস্তাহারে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাই যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। বোধহয় প্রধানতঃ anti-personnel বা 'লোক ভাগানো' বোমাই বর্ষিত হইয়াছে এবং জনসাধারণের মধ্যে ত্রাস সৃষ্টিই ইহার উদ্দেশ্য। এই 'লোক ভাগানো' বোমার জন্য সহরে কিছু প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইয়াছে এবং অজ্ঞ ও ভীত জনগণের একাংশ সহর ছাড়িয়াছে।

একথা নিঃসন্দেহ যে, সামরিক আত্মরক্ষার ব্যবস্থাও বে-সামরিক জনগণের সঙ্ঘবদ্ধতা ও নৈতিক দৃঢ়তার উপর নির্ভর করে। এই হিসাবে কলিকাতার জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা প্রণালী বজায় রাখাও আত্মরক্ষার অন্যতম মূলনীতিরূপে স্বীকৃত হওয়া উচিত। আমাদের দেশ যুদ্ধবিগ্রহের সহিত অপরিচিত—বিশেষতঃ আধুনিক সংগ্রামের সহিত। ইহার সর্ব্বব্যাপকতা ইউরোপে যে ধ্বংসলীলার বিস্তার করিয়াছে, যথেষ্ট শক্তিশালী গভর্ণমেণ্ট এবং অত্যন্ত বীরের জাতি বলিয়া পরিচিত ইউরোপীয়ানগণও তাহা প্রতিরোধ করিতে

পারেন নাই। ফ্রান্সের মত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বীরপ্রসবিনী ভূমির জনগণও ছত্রভঙ্গ হইয়াছিল এবং পলায়নপর বেলজিয়ান ও ফরাসী নর-নারীদের ভীড়ে সৈন্যদলের মহড়ায় পর্য্যন্ত বিঘ্ন ঘটিয়াছিল। ব্রহ্মদেশের অতি তিক্ত অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখনও জনগণের মনে টাট্‌কা আছে। সুতরাং এই দেশের জনগণকেও অতিরিক্ত 'নার্ভাস' কিম্বা অতিরিক্ত বীরপুরুষ বলিয়া ধরিয়া লইবার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই। যুদ্ধক্ষেত্রে আক্রমণকারী সৈন্যদেরও প্রথম সমস্যা আত্মরক্ষা বা নিজেকে বাঁচানো। নিজে না বাঁচিলে অপরকে আক্রমণ করা যায় না, মনোবিজ্ঞানের দিক হইতে এই সমস্যাটি সমরবিজ্ঞানীদের নিকটও উদ্বেগের বিষয় হইয়া রহিয়াছে। যেখানে সৈন্যদের সম্পর্কে এই সমস্যা, সেখানে বে-সামরিক জনসাধারণের পক্ষে আরও উদ্বেগের কারণ আছে। কিন্তু কেবল বিপন্ন অঞ্চল ত্যাগ করিলেই এই সমস্যার মীমাংসা হইতে পারে না।

শিক্ষিত জনগণ এই সমস্ত প্রশ্ন নিশ্চয়ই জানেন এবং তেমন বিচার বিবেচনা করিয়াই তাঁহারা চলিতেছেন। কিন্তু মুস্কিল হইয়াছে সমাজের নিম্নবর্ত্তী জনগণকে লইয়া—যাহারা দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অজ্ঞ। অথচ নাগরিক সভ্যতা ও আধুনিক সমাজ এই নিম্নতম শ্রেণীর লোকদের উপরেই দণ্ডায়মান। এই সমস্ত লোকের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য যেমন আশ্বাস ও ব্যবস্থার দরকার, তেমনই ইহাদের দারিদ্র্য সমস্যারও প্রতিকার হওয়া দরকার। যে মতবাদ হইতে জনগণের যুদ্ধ বা People's Warএর উৎপত্তি, সেই মতবাদ শ্রেণীহীন সমাজের ন্যায়বিচার ও সমব্যবহার মানিয়া লইয়াছে। জনগণের অধিকারের ভিত্তির উপর সেই কল্যাণকর আদর্শ গড়িয়া উঠিয়াছে। সর্ব্বগ্রাসী যুদ্ধের ব্যাপক সর্ব্বনাশ রোধ করিতে হইলে জনসাধারণের দাবী ও অধিকারকে স্বীকার করিতে

হইবে। জাপানী বোমার মুখে দাঁড়াইয়া এই তথ্যকে আজ অস্বীকার করা কঠিন। লণ্ডনের গভর্ণমেণ্ট অন্ততঃ তাঁহাদের স্বদেশের বেলা গণতান্ত্রিক স্বাধীন গভর্ণমেণ্ট, জাতির জন্য তাঁহারা যথাসর্ব্বস্ব পণ করিয়া যথাসাধ্য করিতেছেন। মস্কো বা ষ্টালিনগ্রাদের গভর্ণমেণ্টতো সমাজতান্ত্রিক মতবাদের উপরেই দাঁড়াইয়াছে এবং সেখানে গৃহ হইতে গৃহাভ্যন্তরে জনযুদ্ধের নীতি প্রসারিত হইয়াছে। আমাদের দেশেও এই রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্ম্মপন্থা গ্রহণ করা উচিত এবং দেশের জনগণের বিশ্বাসভাজন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়া তাঁহাদের হাতে জাতীয় গভর্ণমেণ্টের ভার দেওয়া উচিত। তাহা হইলেই কলিকাতা বা ভারতবর্ষে জাপ বোমারুর আক্রমণ সাফল্যের সহিত প্রতিহত হইতে পারে এবং জনসাধারণও নিঃশঙ্ক হইতে পারে।

অষ্টম অধ্যায়

—:*:—

(৭)

আক্রমণ ও আত্মরক্ষায় ভারতবর্ষ

৩১শে ডিসেম্বর '৪২।

প্রায় ৮ মাস নিঃশব্দ থাকিবার পর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে জাপানী বোমারু বিমান কলিকাতা, চট্টগ্রাম ও ফেণী অঞ্চলে বার বার হানা দিয়াছে। নানাস্থানে বোমা বর্ষণ করিয়া তাহারা উৎপাত সৃষ্টির চেষ্টা করিয়াছে। এই প্রকার বোমার উৎপাত দেখিয়া লোকের মনে স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগিয়াছে জাপান কি ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে? স্থলপথে জাপানী আক্রমণ বা অভিযান সম্ভব কি না, ইহা লইয়া দীর্ঘকাল আলোচনা চলিতেছে। কেবল ভারতবর্ষ নহে, অষ্ট্রেলিয়ার প্রশ্নও এই সম্পর্কে অবিরত আলোচিত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ার প্রধান মন্ত্রী মিঃ কার্টিনের ধারণা জাপানের

পরবর্ত্তী লক্ষ্য অষ্ট্রেলিয়া। দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের সলোমন ও নিউগিনি দ্বীপ অঞ্চলে জাপানের অগ্রগতি সেই আশঙ্কা প্রবলতর করিয়া তুলিয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া উপনিবেশ এবং শ্বেতকায় জাতির উপনিবেশ—সুতরাং জাতিগত বিদ্বেষের দিক হইতে জাপানের উহার প্রতি রোষ থাকা অস্বাভাবিক নহে। তারপর মার্কিণ নৌবহরের পক্ষে অষ্ট্রেলিয়ায় ঘাঁটি হইতে পাল্টা আক্রমণ এবং অষ্ট্রেলিয়ার সহিতও তাঁহার পূর্ণ সহযোগিতা সহজতর। জাপান অষ্ট্রেলিয়ার দিকে অগ্রসর হইতে পারে অনুমান করিয়াই দক্ষিণ-পশ্চিম প্রশান্ত মহাসাগরের অভিযানে জেনারেল ম্যাক-আর্থারকে প্রধান সেনাপতি করা হইয়াছে। তাহার অধীনে অষ্ট্রেলিয়ার সৈন্যদল রহিয়াছে। এখান হইতে জাপানকে প্রতিরোধের সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা চলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে সলোমন দ্বীপ ও নিউগিনিতে উভয় পক্ষের প্রচণ্ড যুদ্ধ চলিতেছে।

তথাপি অষ্ট্রেলিয়া কিম্বা ভারতবর্ষ জাপান আগাইয়া আসিয়া আক্রমণ করিবে, চারিদিকের অবস্থা দেখিয়া ইহা বিশ্বাস হয় না। কিন্তু একথা সত্য যে, আধুনিক জাপানকে যে সমস্ত সমরনেতা 'দিগ্বিজয়ে' উত্তেজনা দিয়া উহার সাম্রাজ্যলিপ্সা বাড়াইয়া দিয়াছেন, তাঁহারা অষ্ট্রেলিয়া ও ভারতবর্ষকেও তাঁহাদের প্ল্যানের অন্তর্ভূক্ত করিয়াছিলেন। জেনারেল ট্যানাকার বিখ্যাত 'মেমোরেণ্ডাম' ও লেঃ কমাণ্ডার ইসিমারুর লিখিত এক সামরিক পুস্তকে এই দুই মহাদেশের দিকে অঙ্গুলিসঙ্কেত করা হইয়াছিল। কিন্তু সেই সমস্ত বিবৃতি ও পুস্তক প্রায় ১০ বৎসর আগেকার। সেই মনোবৃত্তির সহিত বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার খাপ খাইবে কিনা, তাহা ভাবিবার বিষয়। আপাততঃ অষ্ট্রেলিয়া লইয়া আমাদের মাথা ঘামাইবার

অবশ্যকতা নাই, কিন্তু ভারতবর্ষ আমাদের নিজস্ব দেশ, ইহার আক্রমণ বা অনাক্রমণ আমাদের নিকট জীবন-মৃত্যুর প্রশ্নের তুল্য।

কোনও দেশ আক্রমণ করিবার আগে গোটাকয়েক প্রশ্ন চিন্তা করা দরকার। যথা—(১) ভৌগোলিক অবস্থা, (২) রাজনৈতিক অবস্থা, এবং (৩) আক্রমণের সর্বোৎকৃষ্ট সময়। প্রথম প্রশ্নের বিচারে ভারতবর্ষ অতি প্রকাণ্ড দেশ, রাশিয়া ও চীনের মতই ইহা একটা মহাদেশ। অরণ্য, পাহাড়, নদী এবং খোলা প্রান্তর এই দেশের বৈশিষ্ট্য। প্রাকৃতিক বিঘ্ন যাহা আছে, তাহার উপর গুরুত্ব দিয়া লাভ নাই। কারণ, আধুনিক বিমান ও ট্যাঙ্ক প্রকৃতির বিঘ্নকে প্রায় সম্পূর্ণরূপে জয় করিয়াছে। মালয়ের জঙ্গল, ব্রহ্মদেশের নদী ও পাহাড়, উক্রাইনের খোলা প্রান্তর, লিবিয়ার মরুভূমি, বলকান অঞ্চলের পর্বত এবং নরওয়ের রুক্ষ, দীর্ঘ, সঙ্কীর্ণ সমুদ্রতীর কোনটাই আধুনিক যান্ত্রিক সংগ্রামের পক্ষে দুর্লংঘ্য বাধা সৃষ্টি করে নাই। তবে, জার্ম্মাণী যেমন রাশিয়ায়, জাপান যেমন চীনে, তেমনই ভারতবর্ষেও জাপানীরা ভূমিখণ্ডের বিশালতা লইয়া বিব্রত হইবে। কেবল আসাম বা বাঙ্গলা বা বিহার দখল করিলেই ভারতবর্ষের যুদ্ধ শেষ হয় না। লাসিও হইতে পেশোয়ার পর্য্যন্ত কিম্বা টৌকিও হইতে বোম্বাই পর্য্যন্ত দূরত্বটা চিন্তা করিবার মত। জাপান ইতিমধ্যেই মাঞ্চুরিয়া হইতে ব্রহ্মদেশ এবং মালয় হইতে সারা ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দেশগুলি দখল করিয়া হজম করিতে হইবে। হাজার হাজার মাইল সমুদ্রপথ ও হাজার হাজার মাইল স্থলপথের প্রশ্ন আছে। এজন্য যে পরিমাণ বিমানবহর ও নৌ-বহর—বিশেষভাবে বিমানবহরের প্রয়োজন, জাপান তাহা সমাবেশ করিতে পারিবে কিনা সন্দেহজনক। ইহা ছাড়া

কয়েক লক্ষ স্থলসৈন্য এবং সেই সৈন্যদলের আনুষঙ্গিক সর্ব্বপ্রকার অস্ত্র ও যন্ত্র এবং সরবরাহ ব্যবস্থার প্রয়োজন। যে সমস্ত কলকারখানা ও শ্রমশিল্প আধুনিক ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন, সাঁজোয়া গাড়ী ইত্যাদি নির্ম্মাণের সর্ব্বাধিক উপযোগী, জাপানের তাহা যথেষ্ট পরিমাণে নাই। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও জাপান যে চমকপ্রদ জয় এবং বিশাল সাম্রাজ্য দখল করিয়াছে, ইহার অন্যতম কারণ মিত্রশক্তিবর্গের আয়োজনহীনতা এবং অসতর্কতা। অর্থাৎ জাপান যদি এই শক্তি লইয়া সোভিয়েট রাশিয়ার বিরুদ্ধে অবতীর্ণ হইত, তাহা হইলে এই প্রকার জয়লাভ তাহার পক্ষে সম্ভব হইত না। মাঞ্চুকু-সোভিয়েট সীমান্তে ইহার বার বার পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। আরও সংক্ষেপে বলা যাইতে পারে যে, জাপান জার্ম্মাণীর মত শক্তিশালী নহে, যদিও নিঃসন্দেহে এশিয়ার মধ্যে জাপান সর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান সামরিক রাষ্ট্র।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা রাজনৈতিক প্রশ্ন জাপানের অনুকূল। মালয় ও ব্রহ্মদেশে বৃটেন যে ভ্রান্তনীতি অনুসরণ করিয়া রাষ্ট্রশক্তিকে জনসাধারণের সহযোগিতা হইতে দূরে রাখিয়াছিল, ভারতবর্ষেও বৃটেন সেই মারাত্মক ভুল করিতেছে। জনসাধারণ বৃটিশ নীতির উপর বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। আক্রমণকারীর পক্ষে অসন্তুষ্ট দেশ সহায়ক, রণপণ্ডিতদের ইহাই অভিমত। ব্রহ্মদেশ ও মালয় ইহার বড় দৃষ্টান্ত। কিন্তু কেবলমাত্র এই একটি প্রশ্নে জাপানী সমরনেতারা উৎসাহ বোধ করিলেও অন্যান্য প্রশ্নগুলির বিচারে জাপান এত বড় দুঃসাহসিক অভিযানে বাহির হইবে কিনা সন্দেহজনক। তৃতীয় প্রশ্ন অর্থাৎ আক্রমণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়। আমাদের মতে সেই সন্ধিক্ষণ পার হইয়া গিয়াছে। সিঙ্গাপুর, রেঙ্গুণ, আকিয়াব, আন্দামান ইত্যাদি ঘাটি দখল করার পর জাপানী নৌশক্তি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপ-

সাগরে যে সুবিধা পাইয়াছিল, সেই সমস্ত সুবিধা আজ আর নাই। কেন না, মিত্রশক্তির নৌবল ইতিমধ্যে কিছু সামলাইয়া উঠিয়াছে এবং নৌবলের মত বিমানবলও বড় কথা। আজ মার্কিণ বিমানবহর বৃটিশ বিমানবহরের সহযোগিতায় পূর্ব্বাপেক্ষা যথেষ্ট শক্তিশালী এবং মিত্রশক্তির প্রচুর সৈন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলিতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন বিপক্ষ দল যখন ক্রমাগত হারিতে ও পশ্চাদপসরণ করিতে থাকে, তখন তাহাকে ক্রমাগত আরও আঘাত দেওয়া এবং ধাওয়া করা রণনীতির ধর্ম্ম। সেই নীতি অনুসারে মালয় ও ব্রহ্মদেশ ত্যক্ত হওয়ার পর জাপান আসামের ভিতর দিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারিত। কিন্তু জাপান তাহা করে নাই। দীর্ঘ ৮ মাস কাল জাপান আর এদিকে অগ্রসর হয় নাই। যখন মিত্রশক্তির অবস্থা অত্যন্ত দুর্ব্বল এবং যুদ্ধায়োজন অত্যন্ত কম ছিল জাপান তখন ভারতবর্ষ আক্রমণ করিল না কেন? সে কি স্বেচ্ছায় ক্রমাগত ৮ মাস ধরিয়া মিত্রশক্তিকে ভারতবর্ষে শক্তি সঞ্চয় করিতে দিয়াছে? কোন বুদ্ধিমান সমরনীতিবিদ্ প্রতিপক্ষকে এতটা সময় দিবেন কেন? বর্ষাঋতুতে অভিযানের যথেষ্ট অসুবিধা ছিল সত্য, কিন্তু সেই অসুবিধা একমাত্র আক্রমণকারী জাপানেরই ঘটিত না। মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, বারিধারাসিক্ত মাটি এবং বন্যাপ্লাবিত নদী ও প্রান্তর শত্রুমিত্র উভয়ের পক্ষে সমান অসুবিধা-ব্যঞ্জক। উভয়ের ট্যাঙ্ক ও বিমানবহরই মেঘে ও কাদায় বাধা পাইত। আজিকার যুদ্ধে প্রকৃতি বা আবহাওয়ার বিঘ্নই একমাত্র বিবেচনার বিষয় নহে। যখন প্রতিপক্ষের সামরিক আয়োজন সামান্য এবং রণক্ষেত্রের বিপর্য্যয়ের মাত্রা বেশী ঘটিয়া থাকে, তখনই উহাকে আরও আঘাত দেওয়া নির্ম্মম সমরনীতির লক্ষ্য। গত গ্রীষ্মকালে ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ একই প্রধান সেনাপতির অধিনায়কত্বে একটিমাত্র রণক্ষেত্রের মত ছিল।

অবশ্য এই বৃহৎ রণাঙ্গন দুই অংশে বিভক্ত ছিল—ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষ। কিন্তু ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ পরস্পরের সহিত বাঙ্গলা ও আসামের সীমান্ত দিয়া সংযুক্ত ও অবিচ্ছিন্ন ছিল। রণনীতির ভাষায় ইহাকে joint বা গ্রন্থি বলা যাইতে পারে। কিন্তু গত গ্রীষ্মকালে এই গ্রন্থি কি দুর্ব্বল ও শিথিল ছিল না? রণনীতির নির্দ্দেশ এই যে, প্রতিপক্ষের রণাঙ্গনের যে অংশ বা গ্রন্থি দুর্ব্বল ও শিথিল, সেই অংশে আঘাত হানিতে হইবে—এই আঘাতের দ্বারা গোটা রণক্ষেত্রের সমুদয় অংশই ভাঙ্গিয়া পড়িতে পারে। ব্রহ্মদেশে অতি দ্রুত ভাগ্যবিপর্য্যয়ের পর মিত্রপক্ষ ভারতবর্ষে সরিয়া আসিয়াছিলেন। সেই সময় ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশের পারস্পরিক গ্রন্থি অত্যন্ত দুর্ব্বল ছিল। জাপানের পক্ষে সেই সময় ভারতবর্ষে আঘাত হানা অত্যন্ত সহজ ছিল। এমন কি ডানকার্কে বৃটিশবাহিনীর ইতিহাসখ্যাত পশ্চাদপসরণের পর ইংলণ্ড আক্রমণ জার্ম্মাণীর পক্ষে যত সহজ ছিল, জাপানের পক্ষে ব্রহ্মদেশের পর ভারতবর্ষ আক্রমণ তার চেয়েও বেশী সহজ ছিল। কিন্তু সেই সন্ধিক্ষণ কি পার হইয়া যায় নাই? আজিকার মিত্রশক্তি কি ভারতবর্ষে গত এপ্রিল মাসের তুলনায় ঢের বেশী শক্তিশালী নহেন? জাপান ভারতবর্ষকে এই শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সময় দিল কেন? এদিকে লিবিয়া ও মিশরের যুদ্ধে জার্ম্মাণীর পরাজয় এবং ককেশাসে ও ষ্ট্যালিনগ্রাদে রুশ পাল্টা-আক্রমণের অগ্রগতি জার্ম্মাণীকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মধ্যে ফেলিয়াছে। সুতরাং এই শীতকালে জাপান পূর্ব্বপ্রান্ত হইতে অগ্রসর হইয়া গিয়া লোহিত সাগরে বা আরবের মরুভূমিতে কিম্বা পারস্য উপসাগরে জার্ম্মাণীর সহিত হাত মিলাইবে, সামরিক দিক হইতে ইহা কষ্টকল্পনা মাত্র।

প্রকৃতপক্ষে জাপানের আক্রমণের পালা ফুরাইয়াছে। যে পরিমাণ

জমিদারী ও কাঁচামালের ঐশ্বর্য্য জাপান সংগ্রহ করিয়াছে, তাহা জার্ম্মাণীর তুলনায় অনেক বেশী লাভজনক। সুতরাং এই বিশাল জমিদারী রক্ষাই হইবে জাপানের উদ্দেশ্য। ব্রহ্মদেশ, মালয় ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ভারতবর্ষের মত রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, সংস্কৃতি এবং সভ্যতায় উন্নত নহে। অর্থাৎ ব্রহ্মদেশে, মালয়ে এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জে কলোনি বা উপনিবেশ সৃষ্টি সম্ভব হইলেও আগামী দিনের ভারতবর্ষে তাহা সম্ভব হইবে না। প্রায় দুই শত বৎসরের বৃটিশ শাসনে ভারতবর্ষের ঔপনিবেশিক জীবন নিঃশেষিত আয়ু হইয়াছে। আগামী দিনে ভারতবর্ষ কেবল উপনিবেশ হিসাবে ব্যবহৃত হইবে, এতখানি দুরাশা বোধহয় আধুনিক কোন রাষ্ট্রশক্তির নাই। এই মহাযুদ্ধই ভারতবর্ষের পরাধীনতার শেষ সীমারেখা। সুতরাং ভারতবর্ষ জাপানী অভিযানের পক্ষে প্রয়োজনীয় কিনা, তাহা চিন্তা করা উচিত। অর্থনৈতিক বিচার ছাড়া সমরনৈতিক অভিযান চলে না, আবার সমরনীতিও অর্থনীতিকে অস্বীকার করিতে পারে না।

তবে, জাপানের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা বড় প্রশ্ন ভারতবর্ষের ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক ঘাঁটি। বৃটেন ও আমেরিকা জাপানের সামরিক প্রতিদ্বন্দ্বী এবং ভারতবর্ষ ইহার প্রধান ঘাঁটি—মধ্যপ্রাচ্য ও ব্রহ্মদেশ, এই দুইয়ের বিচারেই। এই ঘাঁটি হইতে জাপানের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান আরম্ভ হইবে, জাপান ইহা জানে এবং ইতিমধ্যে তেমন আয়োজন ও ব্যবস্থা হইতেছে। সেই অভিযানের বিরুদ্ধে প্রস্তুত হইবার জন্য জাপান হয়তো নিঃশব্দ আয়োজন করিতেছে। যদি মিত্রপক্ষ পাল্টা আক্রমণ করেন, তবে, উহার সংঘাতে ও সংঘর্ষে ভারতবর্ষ রণক্ষেত্রে পরিণত হইতে পারে। কিম্বা জাপান যদি মনে করে যে, ভারতবর্ষের সামরিক ঘাঁটি পূর্ব্বাহ্ণে চূর্ণ করিয়া ইঙ্গ-মার্কিণ সামরিক শক্তিকে কাবু

করা দরকার, তাহা হইলে জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে পারে। রণনীতির বিচারে ইহা সম্ভাব্য, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই প্রকার ব্যাপক অভিযানের বিরুদ্ধে যে সমস্ত তথ্য ও যুক্তি আছে, তাহাও উপেক্ষা করিবার নহে। সংক্ষেপে সেগুলি এই :—

(১) ভারতবর্ষ একটা মহাদেশের মত বিশাল। এত বড় দেশ বর্ত্তমান যুগে সম্পূর্ণরূপে জয় ও বশীভূত করা সম্ভব নহে। পর্ব্বত, অরণ্য, সমুদ্র, নদী, মরুভূমি ইত্যাদি ইহার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য—এই বৈশিষ্ট্য অজেয় না হইলেও দ্রুত জয়ের পক্ষে সুবিধাজনক নহে।

(২) ব্রহ্মদেশ, মালয়, ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ ইত্যাদির পর এত বড় দেশে পুনরায় যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা বজায় রাখিয়া অগ্রসর হওয়া একান্ত দুঃসাধ্য। যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা ছাড়া কোন সৈন্যদলই যুদ্ধ করিতে পারে না।

(৩) ভারতবর্ষ দীর্ঘ সমুদ্রতটবর্ত্তী দেশ—ইহার তিনদিকেই সমুদ্র এবং একদিকে পর্ব্বত। যে পরিমাণ নৌবহর ভারতবর্ষ দখল ও অবরোধ করার এবং সরবরাহ রক্ষার জন্য দরকার জাপানের পক্ষে তাহা বর্ত্তমানে সমাবেশ করা সম্ভব নহে। সমুদ্রপথে জাপানের আর অবাধ কর্ত্তৃত্ব নাই এবং সমুদ্রে অবাধ কর্ত্তৃত্ব ছাড়া ভারত অভিযান দুরাশা মাত্র।

(৪) আধুনিক যান্ত্রিকযুদ্ধ ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন এবং সমুদ্রপারের যুদ্ধ বিশেষভাবে জাহাজের উপর নির্ভরশীল্। জাপান ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেন সংক্রান্ত ইণ্ডাষ্ট্রি বা শ্রমশিল্পে দুর্ব্বল। আমেরিকা, রাশিয়া, জার্ম্মাণী বা বৃটেনের মত জাপান এই দিক দিয়া ততটা শক্তিশালী নহে। বিশেষভাবে জাপানের ইস্পাত শিল্প অত্যন্ত দুর্ব্বল।

(৫) জাপান ইতিমধ্যেই ভারতবর্ষের মত বিশাল ভূখণ্ড—

মাঞ্চুরিয়া, উত্তর চীন, দক্ষিণ-পূর্ব্ব চীন, মালয়, ব্রহ্মদেশ ও ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জ দখল করিয়াছে। এইগুলি রক্ষা ও হজম করার জন্য প্রচুর সমরশক্তি এবং রাষ্ট্রের অন্যান্য শক্তি ও যথেষ্ট সময়েরও দরকার। ভারতবর্ষে ইংরাজ শক্তির কায়েম হইয়া বসিতে ১০০ বৎসর লাগিয়াছে —১৭৫৭ হইতে ১৮৫৭ সাল। আগেকার তুলনায় বর্ত্তমানে অনেক কম সময় লাগিবে বটে, কিন্তু কত কম?

(৬) আক্রমণের সন্ধিক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়াছে। ব্রহ্মযুদ্ধের পর ভারতবর্ষ অনেকখানি অসহায় অবস্থায় ছিল। এক্ষণে আর সে অবস্থা নাই। মিত্রশক্তির আয়োজন সম্পূর্ণ হইয়াছে। অপর দিকে জাপানের ইউরোপীয় সঙ্গী ইতালী সম্পূর্ণ পরাজিত এবং জার্ম্মাণী রুশ-রণক্ষেত্রে অত্যন্ত বিব্রত, এমন কি জার্ম্মাণীর ভবিষ্যৎ অন্ধকারময়। সুতরাং একা জাপান কি ভারতবর্ষ অভিযানে সাহসী হইবে?

(৭) ভারতবর্ষ স্বাধীনতা চাহে। এদেশে বৃটিশ নীতি ভ্রান্ত ও ত্রুটিপূর্ণ হইয়া থাকিলেও এবং দেশের বৃহৎ অংশে বৃটিশ প্রভুত্বের বিরুদ্ধে অসন্তোষ থাকিলেও জাপানকে কেহই নূতন প্রভু হিসাবে চাহে না। অর্থাৎ জাপানী আক্রমণের পক্ষে কোন সামাজিক ভিত্তি এই দেশে গড়িয়া উঠে নাই এবং এই সামাজিক ভিত্তি ছাড়া পরের দেশ আজিকার দিনে দখল ও গ্রাস করা যায় না। ইহার বড় দৃষ্টান্ত আধুনিক চীন।

(৮) মিত্রপক্ষ অনতিদূর ভবিষ্যতে জাপানের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করিবে। প্রশান্ত মহাসাগর আমেরিকার পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয়। আমেরিকার অর্থনৈতিক জীবনের একটা প্রকাণ্ড ধারা প্রশান্ত মহাসমুদ্র দিয়া প্রবাহিত। ইহা ছাড়া অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড এবং ভারতবর্ষ বা বৃটিশ সাম্রাজ্যের প্রশ্ন আছে। অর্থাৎ বৃটেনেরও একান্ত স্বার্থ রহিয়াছে জাপানকে ভারত মহাসাগর

ও প্রশান্ত মহাসাগর হইতে বিতাড়িত করিবার। ইহার সঙ্গে চীনের প্রশ্নও চিন্তা করিবার মত। আমেরিকা, বৃটিশ সাম্রাজ্য ও চীন— এই তিন রাষ্ট্রশক্তি সম্মিলিতভাবে জাপানের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযান করিবে। এই অভিযান রোধ করাই জাপানের আশু কর্ত্তব্য, অন্যথা তাহার বিপদ ঘটিবে।

এই সমস্ত প্রশ্ন বিচার করিলে জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবে বলিয়া বিশ্বাস হয় না। মোট কথা, আক্রমণ ও আত্মরক্ষার সুবিধা এবং অসুবিধাগুলির তুলনামূলক বিচার করিয়া জাপানের পক্ষে যাহা লাভজনক মনে হইবে, জাপান তেমন নীতির দিকেই ঝুঁকিবে। কিন্তু এই সম্পর্কে সুনির্দ্দিষ্ট ও সুনিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী করা সম্ভব নহে। কারণ, প্রত্যেকটি যুদ্ধরত রাষ্ট্রেরই এমন কতকগুলি আভ্যন্তরীণ সামরিক এবং বে-সামরিক প্রশ্ন আছে, যাহা দূর হইতে জানা বা সম্যক বিচার করা সম্ভব হয় না।

এমন নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী বা স্থির সিদ্ধান্ত সম্ভব নহে বলিয়াই ভারতবর্ষের সমর কর্ত্তৃপক্ষও অলস থাকিতে পারেন নাই। তাঁহারা আত্মরক্ষা ও আক্রমণের আয়োজন ব্যাপক আকারে সম্পূর্ণ করিতেছেন। কয়েক মাস আগে জেনারেল ওয়াভেলও ঘোষণা করিয়াছিলেন যে, ভারতবর্ষের উপর আপাততঃ জাপানী আক্রমণের সম্ভাবনা নাই। তথাপি জাপানের মত ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে বিশ্বাস নাই। তাহারা চতুর, দক্ষ এবং বিশ্বাসঘাতক। সুতরাং জাপানী আক্রমণের জন্য সর্ব্বপ্রকার সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক। সামরিক ব্যাপার সর্ব্বদাই গোপন রাখা বাঞ্ছনীয়। এজন্য ইহার কোন বিস্তৃত আলোচনা সম্ভব নহে। তবে কর্ত্তৃপক্ষীয় মহল হইতে যতটুকু প্রকাশ করা হইয়াছে তাহারই আলোচনা করা যাইতে পারে।

জাপ আক্রমণের সম্ভাবনার উপর নজর রাখিয়াই একদিকে যেমন প্রদেশে প্রদেশে 'ন্যাশন্যাল ওয়ার ফ্রন্ট' গঠিত হইয়াছে, বে-সামরিক আত্মরক্ষা ও 'এ-আর-পি' ব্যবস্থা পাকা হইয়াছে, তেমনই অন্যদিকে ভারতবর্ষ রক্ষার সামরিক বিলিব্যবস্থা নূতন পরিকল্পনায় গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি জেনারেল ওয়াভেল গত মে মাসে যে বেতার বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, শান্তির সময়ে ভারতবর্ষ তিনটি সামরিক মণ্ডলে বিভক্ত ছিল—উত্তর, পূর্ব্ব ও দক্ষিণ। এই তিন অংশে সৈন্য সংগ্রহ, শিক্ষাদান ও বিভিন্ন শাখা উপশাখার শাসনকার্য্য অব্যাহত রাখাই ইহার উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে স্বাভাবিক অবস্থা আর বজায় নাই। কেবল শাসনকার্য্যের ধারা বহিয়া এই তিন অংশ চলিতে পারে না। এজন্য নূতন পরিকল্পনা অনুসারে এই তিন অংশকে ভাঙ্গিয়া তিনটি পৃথক বাহিনী বা Armyতে পরিণত করা হইয়াছে। অর্থাৎ উত্তর অংশের বদলে উত্তর-পশ্চিম সেনাবিভাগ, পূর্ব্বাংশের বদলে পূর্ব্ব সেনাবিভাগ ও দক্ষিণাংশের পরিবর্ত্তে দক্ষিণ সেনাবিভাগ সৃষ্টি করা হইয়াছে। সোজা কথায় বলা যায় যে, ভারতবর্ষকে তিনটি পৃথক রণাঙ্গনে ভাগ করা হইয়াছে—পূর্ব্ব, দক্ষিণ ও উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গন। যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত হইয়া আক্রমণ চালাইবার জন্য যাহা কিছু করা দরকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ বাহিনীকে সেভাবেই গড়িয়া তোলা হইয়াছে। সৈন্যবাহিনী এক্ষণে এমনভাবে প্রস্তুত হইয়া আছে যে, যে কোন মুহূর্ত্তে যে কোন স্থানে তাহারা শত্রুর বিরুদ্ধে অভিযান ও আক্রমণ চালাইতে পারিবে। যে ব্যবস্থা আগে ছিল বাঁধাধরা শাসনকার্য্য চালাইবার জন্য, তাহাই এক্ষণে সক্রিয় ও গতিশীল অভিযানের পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হইয়াছে। দক্ষিণ বাহিনী ভারতবর্ষের দক্ষিণ ভাগ এবং পূর্ব্ব বাহিনী ভারতবর্ষের উত্তর-

পূর্ব্ব সীমা, বিশেষভাবে বাঙ্গলা ও আসাম রক্ষা করিবে। উত্তর-পশ্চিম বাহিনীর উপর ভার পড়িয়াছে ভারতবর্ষের পশ্চিম ও উত্তর সীমানা পাহারা দেওয়ার। ভারতবর্ষকে কার্য্যতঃ এই তিনটি প্রধান রণাঙ্গনে বিভক্ত করিয়া স্থল ও জলপথে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধের ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু এই তিন রণাঙ্গনের পরেও ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় স্থানগুলি বাদ পড়িয়া যাইতেছে। এজন্য জেনারেল ওয়াভেল এগুলিকে একত্র করিয়া আর একটি পৃথক সামরিক নেতৃত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাকে কেন্দ্রীয় বা মধ্য রণাঙ্গনের সঙ্গে তুলনা দেওয়া যাইতে পারে—এই মধ্য রণাঙ্গনের আওতায় পড়িয়াছে দিল্লী। এতকাল এই স্থানগুলি অপর তিনটি অংশের মধ্যে বিজড়িত ছিল এবং তাহার ফলে সমরবিভাগীয় শাসনকার্য্যের ঝঞ্ঝাট ছিল প্রচুর। নূতনতর ব্যবস্থায় এই অসুবিধা দূর হইয়া যাইবে এবং ভারতবর্ষের তিনটি পৃথক সামরিক ও ভৌগোলিক অংশ রণক্ষেত্র হিসাবে আপন আপন যুদ্ধাভিযানের কার্য্য চালাইয়া যাইতে পারিবে।

ভারতবর্ষকে তিনটি সামরিক মণ্ডলে ভাগ করিয়া ইহার আত্মরক্ষার ব্যবস্থা আধুনিক কায়দায় গড়িয়া তোলা হইয়াছে। আগেকার মত ভারতীয় সৈন্যেরা কেবল সাধারণ পদাতিক নহে। রাইফেলধারী সাধারণ সৈন্য ও সেকেলে গোলন্দাজের মত নহে। ট্যাঙ্ক ও যন্ত্রসজ্জায় এবং এরোপ্লেন ও আধুনিক বিধিব্যবস্থায় নূতন নূতন সৈন্যদল গড়িয়া উঠিয়াছে। ভারতের অধিকাংশ প্রদেশ হইতেই এই নূতন সৈন্যবাহিনী সংগৃহীত হইয়াছে এবং ইহাদের সংখ্যা অন্যূন ১৫ লক্ষ। ভারতবর্ষ এক প্রকাণ্ড সামরিক শিবিরে পরিণত হইয়াছে। কেবল স্থলভাগ ও আকাশ পথের যুদ্ধের উপযোগীই নহে, জলপথের দিকেও নজর দেওয়া হইয়াছে। বঙ্গোপসাগরের পথে এক্ষণে আর জাপ

নৌবহরের সহজ আবির্ভাব এবং নিশ্চিন্ত দৌরাত্ম্য সম্ভব নহে। সেখানে নৌবহর ও বিমানবহরের সতর্ক পাহারা রহিয়াছে। তীরগুলি আগের চেয়ে অনেক বেশী সুরক্ষিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের সমুদ্রতীর অত্যন্ত দীর্ঘ—দুই হাজার মাইলেরও অধিক। এজন্য ইহার প্রতি ইঞ্চি স্থানে আত্মরক্ষার পাকা ঘাঁটি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা কার্য্যতঃ অত্যন্ত কঠিন। এজন্য স্থির হইয়াছে, যে যে স্থানে জাপ আক্রমণ সম্ভব, সেই সেই স্থানে অতিদ্রুত সৈন্য সমাবেশের ও আঘাত হানিবার ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। অর্থাৎ আত্মরক্ষার মূলনীতি আক্রমণের উপর নজর রাখিয়াই অনুসৃত হইবে। আরও সহজ ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, কেবল ভৌগোলিক বিলিব্যবস্থার মত বিভিন্ন অংশের দায়িত্ব বণ্টন করিয়া দিলেই যুদ্ধাভিযান সাফল্যমণ্ডিত হইতে পারে না। ইহার জন্য চাই যুদ্ধের কতকগুলি মূলনীতিকে কার্য্যতঃ সফল করার চেষ্টা। জেনারেল ওয়াভেলও বলিয়াছেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র আত্মরক্ষার ব্যূহ রচনা নহে, সেই ব্যূহগুলি আঁকড়াইয়া পড়িয়া থাকাও নহে। আমাদের উদ্দেশ্য শত্রুর অভিযানকে ক্ষিপ্রতার দ্বারা এবং আক্রমণের দ্বারা প্রতিরোধ করা। যে সমস্ত স্থানে শত্রুর আবির্ভাবের সম্ভাবনা, সেই স্থানগুলিতে যাহাতে সাফল্যের সহিত আঘাত হানা যাইতে পারে এবং এই আঘাত হানিবার জন্য যাহাতে ক্ষিপ্র ও দ্রুতগামী সৈন্যদল শত্রুর উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আক্রমণ করিতে পারে—ভারতবর্ষের আত্মরক্ষার মূলনীতি তাহাই। এই কথাগুলি বুদ্ধিসম্মত এবং রণবিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক কালের যুদ্ধ 'অচল অবস্থার' যুগ পার হইয়া গিয়াছে। কোন নির্দ্দিষ্ট ঘাঁটিতে বসিয়া থাকিয়া কিম্বা কেবল দুর্গপ্রাকারের আড়ালে অবস্থান করিয়া বর্ত্তমান কালের সংগ্রাম চালানো যায় না। যুদ্ধ যান্ত্রিকবাহিনীর ক্ষিপ্র আক্রমণের

মধ্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ও মোটরযন্ত্র ইহাকে সম্পূর্ণরূপে গতিশীল করিয়াছে। জাপানীরা যদি ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, তবে, আধুনিক রণবিজ্ঞানের এই নীতিই তাহারা অনুসরণ করিবে এবং এই নীতি প্রতিরোধ করিতে হইলে দ্রুত, ক্ষিপ্র ও সক্রিয় পাণ্টা আক্রমণের পন্থা অবলম্বন করিতে হইবে। আক্রমণই আত্মরক্ষার সর্ব্বোৎকৃষ্ট নীতি—সমরবিজ্ঞানের এই মূলনীতি ভারতবর্ষের কর্ত্তৃপক্ষ বিস্মৃত হন নাই। জেনারেল ওয়াভেলের স্কন্ধে নিঃসন্দেহে ভারতবর্ষ রক্ষার প্রকাণ্ড দায়িত্ব পড়িয়াছে। সেই দায়িত্ব তিনি সাফল্যের সহিত বহন করিতে পারিবেন, এমন আশাই করা উচিত।

উপসংহার

জাপানী যুদ্ধের আক্রমণের পালা শেষ হইয়া গেল। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাস হইতে ১৯৪২ সালের মে মাস পর্য্যন্ত দক্ষিণ এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরে জাপানী আক্রমণ ব্যাপক, দুর্দ্ধর্ষ ও নিয়মিত আকারে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ইহা নিঃসন্দেহ যে, একমাত্র নৌবহরের ক্ষতি ছাড়া জাপানের এই যুদ্ধযাত্রায় সৈন্যবল ও সমরাস্ত্রের দিক হইতে তেমন কোন গুরুতর ক্ষতি হয় নাই। সামরিক দিক হইতে যে রণনীতি সারবান, অর্থাৎ ন্যূনতম (minimum) ক্ষতি স্বীকার করিয়া বৃহত্তম (maximum) লাভ, চতুর জাপানীরা তাহাই অর্জ্জন করিয়াছে। ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ এবং ওলন্দাজ দ্বীপপুঞ্জের কাঁচামালের ঐশ্বর্য্য বিবেচনা করিলে মনে হইবে জাপানীরা জার্ম্মাণদের তুলনায় অধিক লাভবান। জার্ম্মাণী ইউরোপীয় ভূখণ্ডের কলকারখানা ও শ্রমশিল্পে সমৃদ্ধ যে সমস্ত দেশ দখল করিয়াছে, উহার

জন্য তাহাদের ক্ষয় ও ক্ষতি হইয়াছে প্রচুর। একমাত্র রাশিয়ার যুদ্ধেই জার্ম্মাণীর ক্ষতির পরিমাণ ভয়াবহ এবং সেই ক্ষতি সামলাইয়া জার্ম্মাণীর পক্ষে ভবিষ্যতে মাথা তুলিয়া দাঁড়ানো কার্য্যতঃ প্রায় অসম্ভব। কিন্তু জাপানের এখন পর্য্যন্ত তেমন প্রচণ্ড ক্ষতি হয় নাই। যুদ্ধ চালাইবার ক্ষমতা তাহাদের এখনও প্রচুর। প্রকৃত পক্ষে ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ছাড়া আর কোথাও জাপানের বিরুদ্ধে সত্যকার যুদ্ধ হয় নাই। অন্যান্য স্থানে জাপানীরা আক্রমণ করিবা মাত্র আত্মরক্ষাকারী সৈন্যেরা কেবল পিছু হটিয়াছে। এই একঘেয়ে পিছু হটিবার কাহিনী প্রকৃত যুদ্ধ নহে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিদ্বয় আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না; অধিকন্তু তাঁহারা ইউরোপীয় সংগ্রাম লইয়া ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। অপর পক্ষে জাপান দীর্ঘকাল ধরিয়া দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতেছিল। এশিয়ার মধ্যে জাপান সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সামরিক রাষ্ট্র। উগ্র জাতীয়তাবাদ, তথা সাম্রাজ্যবাদের উপর এই শক্তি প্রতিষ্ঠিত। রণনীতিবিদ্‌গণই জাপানের আসল নেতা, তাঁহারা জাপানের সর্ব্বপ্রকার শক্তি রণক্ষেত্রের উপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। এদিকে মিত্রপক্ষের কোন আয়োজন ছিল না। ফলে জাপান যেন একটি আঘাতে গোটা দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া দখল করিয়া ফেলিল। আপাতঃ দৃষ্টিতে ইহা বিস্ময়কর মনে হইলেও ইহার মূলে বড় রকমের কোন রহস্য নাই। একটি বৃহৎ রাষ্ট্রের সঙ্ঘবদ্ধ সামরিক শক্তি যদি একটি অসতর্ক ও বিব্রত রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়, তাহা হইলে আক্রমণকারীর দ্রুত জয়লাভ কোন অসম্ভব ঘটনা নহে। তথাপি প্রবাল সাগর, জাভা সাগর, ম্যাকাসার প্রণালী, মিডওয়ে দ্বীপ এবং নিউগিনি দ্বীপের সমুদ্রপথে জাপানী নৌবহর মিত্রশক্তির হাতে প্রচণ্ড মার খাইয়াছে। জাপানের প্রচুর পরিমাণ জাহাজ ধ্বংস

হইয়াছে। বর্ত্তমান বর্ষের (১৯৪৩ খৃঃ) ফেব্রুয়ারী মাসে আমেরিকার নৌদপ্তর হইতে সরকারী ভাবে জাপানী নৌবহরের ক্ষতির যে তালিকা বাহির হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, জাপানী সামরিক জাহাজ নিশ্চিতরূপে ডুবিয়াছে ১০৩ খানা, ডুবিয়াছে বলিয়া অনুমান ২৬ খানা, ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে ১৪২ খানা। অসামরিক জাপানী জাহাজ নিশ্চিত ডুবিয়াছে ১৫৯ খানা, ডুবিয়াছে বলিয়া অনুমান ১৮ খানা, জখম হইয়াছে ৮১ খানা। সুতরাং মোট নিমজ্জিত জাহাজের সংখ্যা ২৬৬, নিমজ্জিত বলিয়া অনুমান ৪৪ এবং ক্ষতিগ্রস্ত ২২৩—সর্ব্বশুদ্ধ ৫৩৩ খানা জাহাজ। ইহা ছাড়া নিউগিনি দ্বীপের সমুদ্রপথে মোট ২২ খানা জাহাজ নষ্ট হইয়াছে। জাপানী যুদ্ধের বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহা দ্বীপ, উপদ্বীপ, সমুদ্র, প্রণালী এবং জলপথের উপর নির্ভরশীল। সুতরাং নৌবহর ও জাহাজ তাহাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। ইহা ছাড়া তাহারা টোকিও হইতে রেঙ্গুন এবং উত্তর চীন হইতে নিউগিনি পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই বিস্তীর্ণ স্থলপথে ও জলপথে ক্রমাগত যোগাযোগ রক্ষা, সরবরাহ রক্ষা এবং অধিকৃত দেশগুলি রক্ষা করিয়া চলা এক নিদারুণ সমস্যার মত দেখা দিবে। প্রচুর এরোপ্লেন ও জাহাজ জাপানের প্রয়োজন। যদিও জাপান অপরিমিত কাঁচামালের ঐশ্বর্য্যে শক্তিশালী হইয়াছে, তথাপি মিত্রশক্তি বা আমেরিকার উৎপাদন শক্তির সহিত পাল্লা দেওয়া জাপানের পক্ষে সহজ নহে। ট্যাঙ্ক ও এরোপ্লেনের 'ইণ্ডাষ্ট্রি' বা কলকারখানা রাতারাতি গড়িয়া তোলা যায় না। ইহার জন্য দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক। অধিকন্তু ইদানীং কালের বিমান ও নৌযুদ্ধে জাপান তেমন কোন বিস্ময় দেখাইতে পারে নাই, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাপানকে হার মানিতে হইয়াছে। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, সমান অস্ত্র ও সমান শক্তি লইয়া যুঝিতে পারিলে জাপান এত শীঘ্র

দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া জয় করিতে পারিত না। রণকৌশল ও রণনীতির চমৎকারিত্বের প্রমাণ জাপান দিয়াছে বটে, কিন্তু সেই কৃতিত্ব এক তরফা। অর্থাৎ যুদ্ধটা সমানে সমানে হয় নাই। কিন্তু ভবিষ্যতে ইঙ্গ-মার্কিণ সম্মিলিত শক্তি জাপানকে ছাড়াইয়া যাইবে। তবে, ১৯৪৩ সালে নয়। ইউরোপে জার্ম্মাণ যুদ্ধের অবসান না হইলে মিত্রপক্ষ জাপানের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিতে পারিবেন না। বোধহয় এজন্য ১৯৪৫ সাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু কেবলমাত্র সৈন্যবল ও অস্ত্রবল দিয়াই আধুনিক যুদ্ধে চূড়ান্ত জয় আনা যাইবে না। জাপান যে নিকৃষ্ট সাম্রাজ্যবাদ ও পররাজ্য হরণের নীতি অনুসরণ করিতেছে, ইহার চেয়ে উৎকৃষ্টতর নীতি গ্রহণ করিতে হইবে। ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ ও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে হইবে। পূর্ণ স্বাধীনতার ভিত্তি ছাড়া আত্মরক্ষার চরমশক্তি পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। জনসাধারণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার স্বীকার করিতে হইবে। এই নৈতিক ভিত্তিই আধুনিক যুদ্ধের আসল প্রাণ। যদি মিত্রশক্তিকে চরম জয়লাভ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে হয়, তবে এই প্রাণমন্ত্রে দীক্ষা লওয়া প্রয়োজন। কেবল বৃহত্তর সমরশক্তি নহে, মহত্তর নৈতিক শক্তির দ্বারা জাপানকে জয় করিতে হইবে। এই বৈপ্লবিক মতবাদের অনুসরণ ছাড়া আধুনিক যুদ্ধের অবসান একান্ত কঠিন। কারণ, ইহার সহিত রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি একান্তরূপে বিজড়িত।

১০ই মার্চ্চ, ১৯৪৩